চীনযাত্রী

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

STATE CENTRAL LIBRARY W.B.
V.I.P. Road. Calcutta

প্রকাশক

বিহার সাহিত্য ভবন

কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ,
১লা আশ্বিন, ১৩৫৪

প্রকাশক :
শক্তিকুমার ভাদুড়ী
৫, ডাফ লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর :
কালীপদ চৌধুরী
গণশক্তি প্রেস
৮-ই, ডেকার্স লেন, কলিকাতা

প্রচ্ছদপট ও বর্ণলিপি
জগন্নাথ মৌলিক

ব্লক নির্ম্মাণ ও কভার প্রিণ্টিং
রিপ্রোডাক্‌শন সিণ্ডিকেট
৭।১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা

বাঁধাই
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৫০ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট
কলিকাতা

মূল্য তিন টাকা

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিক

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সুহৃদ্বর-করকমলে—

ভূমিকা

যে-যাত্রাটা ভূমি-সম্পর্ক-শূন্য বলিলেই হয়, তাহার আবার ভূমিকা কি! এটা কেবল প্রচলিত প্রথারক্ষার্থে একটা সূচনা মাত্র।

চাকুরী বজায় রাখিতে চীনে যাই,—একথা বলিলেও সত্য বলা হয় না। আমরা বাঙ্গালী,—গ্রহ, অদৃষ্ট আর কর্ম্মফল, এই তিন লইয়া ঘর করি ও আমাদের সোনার সংসারে লোনা ধরিতে দিইনা। বড় বড় আকস্মিক দুর্ঘটনাগুলি উঁহাদেরই উপর চাপাইয়া হাল্‌কা হইতে পারি। উঁহারাই আমাদের—"মুস্কিল আসান।"

কিন্তু চাকুরে, তথা—কেরাণী নাকি দেশের একটি অপরাধি-সম্প্রদায়, অতএব অসাধারণ পাংক্তেয়, তাই তাহাদের ভাগ্যে উক্ত তিনটি ছাড়া চতুর্থ একটিও থাকেন—যিনি শরীরী, যিনি না ডাকিতে দেখা দেন, কারণে-অকারণে কথা কন, না চাহিতে উপস্থিত হন, সাতমহল তফাতে পর্দ্দাফেলা কক্ষে থাকিলেও চক্ষের সম্মুখেই থাকেন,—কেরাণীরা যাঁহাকে জীবন্ত X' Ray ভাবে। মর্ত্ত্যে তাঁহার নাম—সরকার মাস্টার, অফিসার্, সার্—ইস্তক বেকার্, কুকার্ ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক। তাঁহার ইচ্ছায় কেরাণী যমের বাড়ীও যায়,—হুকুমে সে কি না করিতে পারে তাহা খুঁজিয়া পাই না।

তাঁহারি হুকুমে চীনে যাইতে হয়,—এইটিই সত্য কথা।

চীন হইতে ফিরিবার কিছুকাল পরে, পরিচিত প্রীতিভাজনদের একখানি মাসিক-পত্রিকা প্রকাশ করিবার দুর্দ্দমণীয় চাঞ্চল্য দেখা দেয়। তাহাতে আমার উপর চীন সম্বন্ধে লিখিবার অনুরোধ থাকে।

যাহা হউক, ঐ অবস্থায় ও ঐ সূত্রে পশ্চিমাঞ্চল হইতে নব-প্রকাশিত "প্রবাস-জ্যোতিঃ" নামক মাসিক-পত্রিকায় লিখিতে বাধ্য হই। পরে উক্ত পত্রিকার রূপান্তর ঘটায়, "অলকা" নামক দ্বিতীয় পত্রিকাখানিতে তাহার জের্ টানিয়া শেষ করিতে হয়।

লেখাটি উক্ত মাসিক-পত্রিকাদ্বয়ে "আমার চীন-যাত্রা" নামে প্রকাশ পায়। এক্ষণে পুস্তকাকারে তাহাকে "চীনযাত্রী" নাম দিলাম, কারণ, "আমার" শব্দটি সম্পূর্ণই নিরর্থক।

চীনে না পৌছিয়াই, সরাসরি চীনের কথা সুরু করিয়া দেওয়ার মত দুঃসাহস আমার ছিলনা,—তাই, শ্রীদুর্গা হইতেই সুরু করিয়া "যাত্রা" শেষ করিয়াছি।

রচনাটি যাহাতে শুষ্ক একটা "বিবরণ" বা "কাজের কথা" না দাঁড়ায়, তাই, আনন্দের আবরণে জ্ঞাতব্য কথাগুলি বলিবার প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র।

৺কাশীধাম
জন্মাষ্টমী
১৩৩২

—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

চীনযাত্রীর প্রথম সংস্করণ এলাহাবাদের সুবিদিত ইণ্ডিয়ান প্রেসেই ছাপা হয়। সম্মানিত স্বত্বাধিকারীরাই মুদ্রণ ও পুস্তক বিক্রয়াদির ভার নেন। আমি তখন কাশীতে থাকি। ওই ব্যবস্থাই আমার পক্ষে সুবিধার ছিল। পরে সাংসারিক কারণে আমাকে স্থানান্তরিত হতে হয়, প্রথম সংস্করণও শেষ হয়ে যায়—সেই সঙ্গে ইণ্ডিয়ান প্রেসের সহিত প্রথম সংস্করণের বাধ্য-বাধকতা ও ব্যবস্থাদিও।

দ্বিতীয় সংস্করণ যাঁরা প্রকাশ করছেন তাঁদের সঙ্গে আমার কনিষ্ঠ দৌহিত্র ও এখন কাজকর্ম্মে আমার প্রধান সহায় শ্রীমান ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায় সংশ্লিষ্ট থাকায় কলকাতাতেই নিজেদের ব্যবস্থায় কাজকর্ম্ম।

চীনযাত্রীর প্রথম সংস্করণ শেষ হওয়ায় সে সম্বন্ধে যিনি যা দয়া করে লিখেছিলেন তারও কিছু কিছু নাকি বলতে হয়। সুখের বা দুঃখের বিষয়, সে সব কথা কাগজের স্তূপ থেকে খুঁজে বার করবার সামর্থ্য বা অবস্থা আমার নয়। বইখানি তাঁদের সুঅভিমতই পেয়েছিল বলে মনে আছে।

পূর্ণিয়া —শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১লা আশ্বিন, ১৩৫৪

চীনযাত্রী

—১—

আমরা যত বড় দাসত্ব করি না কেন, হনুমানকে হারাইতে পারিব না। দাসত্ব করিয়া তিনি চির-অমর হইলেন, এবং ত্রিভুবন-জোড়া যশের অধিকারী হইয়া রহিলেন; ঋষি বাল্মীকি তাঁহার গুণ-গানে সহস্র-মুখ। উদার লোকই আলাদা; হনুমানকে তিনি দেবতা বানিয়ে গেলেন। কিন্তু আমাদের দগ্ধভাগ্যে ডি-এল রায় মহাশয়-বর্ণিত ঋষিরাই জুটিলেন। জন্মেছিলাম মানুষ, বানিয়ে দিলেন জানোয়ার; কারণ—দাসত্ব করি। কেন, আর কি সুখে যে করি, তাহা ঋষিরা যোগের সাহায্যে না খুঁজিয়া, গোলযোগের দ্বারাই বুঝিয়া রাখিলেন। যাক্, হনুমান মরিয়া হইয়া, স্বইচ্ছায় ও স্ববলে, সাগরপারে পাড়ি দিয়াছিলেন। তাঁহার সংসার ছিল কি না জানি না; অন্ততঃ থাকার প্রমাণাভাব। আমাকে অনিচ্ছায় ও অগত্যা, পরের বলে পা বাড়াইতে হইয়াছিল। তাহা হইলেও, আমার যে নিজের বলের কোন আবশ্যকই হয় নাই, এমন নহে। তবে তাহার প্রকাশ্য নজির হাজির করা কঠিন; তাহা মনস্তত্ত্বজ্ঞের মার্ফৎই প্রাপ্তব্য। কতকটা রবিবাবুর "যেতে নাহি দিব" কবিতায় লিপিবদ্ধ আছে। বাঙ্গালীর হাতে কাঁদুনীর ভূমিকা শেষ হইতে জানে না; অতএব সরাসরি সুরু করাই ভাল।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই চীনে "বক্সার ট্রবল্" বা "বক্সার হাঙ্গামা" বলিয়া একটা গোলমাল উপস্থিত হয়। 'বক্সার' নামে চীনে একটা উগ্রদল দেখা দেয়। "ফরেনার্" বা বিদেশীয়দের সহযোগিতা বর্জ্জনই বোধ হয় তাহাদের মূল নীতি ছিল। যে সব চীনেরা, বিদেশীয়দের চাকুরী করিত, তাহাদের সাহায্য করিত বা সংস্রবে থাকিত, আর যাহারা বিদেশী পাদ্রিদের উপদেশে খৃস্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল, বা করিয়াছিল, বক্সারদের বিষ-দৃষ্টিটা সেই সব চীনেদের উপরই বিশেষ করিয়া পড়ে। নিষেধ ও ভয়-প্রদর্শন দ্বারা মনোমত ফল লাভ না হওয়ায়, ক্রমে তাহারা সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করে ও সেই সব চীনেদের ঝাড়ে-মূলে ধ্বংসকার্য্যে ব্রতী হয়। ন্যায়-ধর্ম্ম-পরায়ণ পাদ্রিরা, ও অন্যান্য বিদেশীয়েরা, সেই সব আশ্রিত ও বিপন্ন চীনেদের রক্ষার্থে প্রয়াস পান। উন্মত্ত বক্সারেরা তখন ক্রোধান্ধ হইয়া, তাঁদেরও আক্রমণ করে ও খুন্ জখম আরম্ভ করিয়া দেয়। ক্ষিপ্তেরা তখন ভাবে নাই যে—"এ বারতা যবে পাইবেন রঙ্গোনাথ," তখন ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়াইবে ও কতদূর গড়াইবে। ফলে তাহাই হইল। একটা হাসির গান আছে

"কানিখ্যেতে কাক্ মরেছে, বৃন্দাবনে হাহাকার।"

এ-ক্ষেত্রে সেটা কান্নার গান হইয়া, এক মুহূর্ত্তে সমগ্র সভ্য জগতের সহানুভূতি ও সহৃদয়তা জাগাইয়া দিল। শক্তিশালীদের মধ্যে সাজ-সাজ সাড়া পড়িয়া গেল। তারির ঝাপ্টায়, সমুদ্র-যাত্রার পাপটা, আমাদেরও জড়াইয়া ধরিল। সেই অভিযানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের মরা মজ্লিসে, অন্যান্যদের সঙ্গে আমারও ডাক্ পড়িয়াছিল।

বিদায়ের বিবরণটা কেবল ব্যথায় ভরা, সেটা বাদ দেওয়াই ভাল। সেদিনও প্রাতে পাখী আনন্দে গাইয়া থাকিবে, ফুল সহাস্যে ফুটিয়া থাকিবে, বায়ু সুমন্দ বহিয়া থাকিবে, শিশু সুমধুর হাসিয়া থাকিবে, কবি

কবিতা লিখিয়া থাকিবেন ; কিন্তু আমার প্রাণে, মনে বা নয়নে, তাহার কোন সাড়াই পৌঁছে নাই। তখন আমি কেবল উদাস-প্রাণে একান্ত অনুভব করিতেছিলাম,—আমার ক্ষুদ্র গ্রামের ও আমার দেশের, অতি তুচ্ছ তৃণটিও আমার কতটা আপনার। আর এতটা দীর্ঘদিনের তাচ্ছিল্যের জন্য, মনে মনে তাহাদের নিকট অবনত হইয়া ক্ষমা চাহিতেছিলাম। এতটা চেতন অচেতন, ক্ষুদ্র বৃহৎ, আদৃত অনাদৃত ও অবজ্ঞাত যে এক মুহূর্তে আমারি অংশরূপে আমার মধ্যে অভিন্ন হইয়া দেখা দিতে পারে, তাহা কখনও এবং তখনও ভাবিতে পারি নাই।

আমার সুদূর যাত্রার সম্বলের সহিত একটু দেশের মাটি (গঙ্গা-মৃত্তিকা) আর একখানি গীতা, প্রিয় ও পরম সুহৃদের স্থান অধিকার করিল।

১৯০২ খৃস্টাব্দের ৩রা জুলাই বেলা আটটার সময়, আমাদের লইয়া "ক্লাইভ" নামক সরকারী জাহাজ খিদিরপুর ডক্ ছাড়িল। বারকয়েক দুর্গানাম স্মরণ করিলাম ও বঙ্গভূমিকে প্রণাম করিয়া বলিলাম—"মা, আবার যেন তোমার কোলে ফিরে আসতে পারি।" চক্ষে জল ভরিয়া আসিল। কিছুক্ষণ কোনদিকেই দৃষ্টি ছিল না। পরে দেখি—কি নিকটের কি দূরের, সবটাই নূতন। জাহাজের সহস্র সরঞ্জাম, কাপ্তেন সারেং মাল্লা মাস্তল, অচেনা যাত্রিসঙ্ঘ, হরেক রকম পোষাক-পরিচ্ছদ, জাহাজের গতিবিধি ;—সহসা সকলকে আকৃষ্ট করিয়া, বিদায়-বেদনা হইতে মুক্তি দিয়াছে। সকলেই অন্যমস্ক হইয়া পড়িয়াছে। জাহাজ মন্থরগমনে চলিয়াছে।

মানুষের বেশীক্ষণ কিছুই ভাল লাগে না বা সয় না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ক্লান্ত হইয়া সকলেই দ্রব্যান্তর খুঁজিতে লাগিলাম। সকলেই নিজের জাত খোঁজে,—দল বাঁধিতে চায়,—এক হইতে চায়। জগতের

অণু পরমাণুও দানা বাঁধিবার জন্য অনুক্ষণ চঞ্চল। দেখিতে দেখিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যাত্রীগুলি পাঁচ সাত, কোথাও-বা দশ বারটি করিয়া জমাট্ বাঁধিতে লাগিল। তখন পরস্পরের নাম-ধাম পরিচয় ও আলাপের মধ্য দিয়া প্রত্যেক থাকে ধীরে ধীরে আনন্দ-উৎসাহ দেখা দিল। সকলেই তখন বুঝিবার অবকাশ পাইল,—এ পথে আমিই মাত্র একা নহি; সঙ্গে সঙ্গে একটু সাহসও অনুভব করিল। পশ্চাতের চিন্তাটা অনেকখানি পাতলা হইয়া গেল।

দেখি, নানা পক্ষী এক বৃক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের লোকই হাজির। বিভিন্ন সহর হইতে আমরা পাঁচটি বাঙ্গালীও আসিয়া উপস্থিত। তন্মধ্যে চারিটি, পরস্পরের কাছে পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত। অপরিচিতটি রেঙ্গুন হইতে রওনা হইয়া হাজির হইয়াছেন। এই পাঁচজনই পাকা কুলীন, (পার্মানেণ্ট্ চাকুরে); তদতিরিক্ত দুইটি উমেদার যুবকও চলিয়াছিলেন। হায় রে নোক্‌রির নেশা,—যার সন্ধানে সাত-সমুদ্র-পারেও ভদ্রসন্তানেরা ছোটে! অতএব সর্ব্বসমেত আমরা হলাম সাতটি।

এটা ওটা দেখায়, ও এ-কথা ও-কথায় দিনটা শেষ হইয়া আসিল। ইতিমধ্যে পূর্ব্ব কূলের বনরাজি দেখিয়া কাহারও-বা,—'নবকুমার' কোনখানটায় আসিয়া পড়িয়াছিল এবং 'কপালকুণ্ডলা'ই বা এই ভীষণ অরণ্যানী মধ্যে কি ভাবে বিচরণ করিত, এ কথাও উদয় হইল; কেহ-বা—"দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য—"ইত্যাদি আওড়াইতে ভুলিলেন না। কিন্তু আলো ত কেবল নিজে নেবে না, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটা জিনিষ দেখিয়া ভুলিয়া থাকিবার উপায়টাও নিবাইয়া দিয়া যায়। তখন যেটা প্রবল বৈচিত্র্যের মধ্যে চাপা পড়িয়া থাকে, সেইটা মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে তাহাই ঘটিল। একটু এদিক ওদিক করিয়া সকলেই

নীরব ও বিষণ্ণমুখে, শ্রান্ত শরীরে—নিজ নিজ ভাবনা বেদনা লইয়া শয্যা লইলাম। সারাদিনের সঞ্চিত অবসন্নতা এখন নিবিড় হইয়া, নিদ্রার সহায় হইল ও সত্বরই চক্ষের যবনিকা টানিয়া দিয়া, সেদিনকার পালা শেষ করিয়া দিল।

—২—

প্রাতে যেন অন্য জগতে জাগিলাম। সে জল নাই, সে জনপদ নাই, সে গাছ-পালা পল্লী-পুলিন নাই; সে মাটির-জগৎ সুদূর হইয়া গিয়াছে। আছে কেবল দূরবিস্তৃত নীলাম্বুরাশি—আর আমরা একখানি লোহা-বাঁধান কাঠের কেল্লায় ভাসিয়া চলিয়াছি। তাড়াতাড়ি স্নান আর চা-পান সারিয়া, উপরের ডেকে গিয়া দেখি, সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করিতেছে। নাবিকেরা এইমাত্র সব মাজিয়া-ঘসিয়া ধুইয়া-মুছিয়া গিয়াছে; যেন কোন দেবতার আবাহন উৎসব আছে। তাহার উপর প্রাতঃ-সূর্য্যের কিরণপাতে সবটাই সমুজ্জ্বল ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীর দল 'অপার (উপরের) ডেকে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র থাক্ বাঁধিয়া বেড়াইতে বা এক এক স্থানে জমায়েত হইতে আরম্ভ করিলেন। কাল যে-যার দল খুঁজিয়া ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছিল, আজ ক্রমে এ-দলে ও-দলে আলাপ-পরিচয় হইতে লাগিল। কেবল একটি দল সদর্পে ও সশব্দে, ডেকের এ-মুড়ো ও-মুড়ো পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকলের হাতেই এক একখানি নভেল্

—কাহারও নূতন কাহারও পুরাতন—কখনও খোলেন্ কখনও মোড়েন —ইঁহারা কয়জনই ইউরেশিয়ান এবং প্রায় সকলেই ডাক্ বিভাগের লোক।

সমুদ্র-যাত্রী ভদ্রলোকদের অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের সহিত একখানি করিয়া "ডেক্-চেয়ার্" বা হাল্কা আরাম-চেয়ার্ লইয়া যাওয়া উচিত। তাহাতে বিশেষ সুবিধা ও আরাম পাওয়া যায়। নচেৎ সরকারী বেঞ্চ (যদি খালি পাওয়া যায়) না হয় হরদম্ বেড়ানো, এই দুইটির উপরই নির্ভর করিতে হয়। আমাদের "নেটিভ্ মেজারিটির" জাহাজে, পাটি বা সতরঞ্চ বিছাইবার বারণ ছিল না, তাই রক্ষা। যাহা হউক, অভিজ্ঞেরা ডেক্-চেয়ার্ লইয়া যাইতে ভুলেন নাই। তাহাতে বসিয়া সমুদ্র-দর্শন, গল্প-গুজব, লিখন-পঠন, নাগাইত নিদ্রা পর্য্যন্ত চলে। যার যা, এ পথের ইহা একটি অত্যাবশ্যক আসবাব।

আমরা বাঙ্গালী কয়টি যেন ছুটির দিনে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি; সকলেরই বরযাত্রীর বেশ। সিহি আসবাবে দেহ ও ট্রঙ্ক্ বোঝাই; কাহারও দু একটা পুরাতন প্যাণ্ট্ থাকিতে পারে। দেখিলে বোধ হয় যেন, গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার পূর্ব্বে, মজলিস্-মুগ্ধকর কাপড়-কোঁচানর ধুম্ পড়িয়া যাইবে এবং খাম্বাজের মহলা চলিবে। সঙ্গে এক জোড়া করিয়া তাস থাকিলেই যাত্রাটা সর্ব্ব-সৌষ্ঠব-সম্পন্ন হইত। সৌষ্ঠব রক্ষা হউক্ বা না হউক, সেটা যে বিশেষ কাজে লাগিত, তাহা দু-চার দিন মধ্যেই বেশ বোঝা গেল। হাজারখানেক যাত্রীর মধ্যে, শিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত ভদ্রের সংখ্যা শতাধিক ছিল না; ফলোয়ার্দের অর্থাৎ সাহায্যকারী শ্রমিকদের সংখ্যাই অধিক ছিল। দেখি, তাহারাই বেশ তাস-তামাক গান-গল্পে স্ফূর্ত্তিতে চলিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম, পাঞ্জাব, মান্দ্রাজ, মধ্য-ভারত ও বোম্বায়ের বাবুরাও তাস পাড়িয়াছেন; নচেৎ

বিনা-কাজে বাস্তবিকই দীর্ঘদিন কাটান কঠিন। বিধাতার কৃপায় বাক্যই আমাদের প্রধান সম্বল। এখন তাহা কাজে লাগিতে লাগিল। বাক্যের ব্যবহারেই, অর্থাৎ বাজে কথায়, দিন কাটিতে লাগিল।

ক্রমে পুস্তকের খোঁজ পড়িল,—কাহারও কাছে কিছু আছে কি না। আমার গীতাখানি, এ পঞ্চভূতের দরবারে পেশ করিতে সাহস হইল না; কারণ, সে-সময়ে ও সে-সভায় তাহা স্বাদু ও গ্রাহ্য ত হইতই না, বরং তাহার সমুদ্র-সমাধিরই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। আমাদের মধ্যে একজন "দত্ত" ছিলেন, তিনি লোক-সঙ্গ বড় একটা ভালবাসিতেন না; আহারের আসর ভিন্ন তাঁহাকে একটু তফাতে তফাতেই থাকিতে দেখিতাম। তাঁহার হাতে একখানি বই দেখিয়া, সাগ্রহে উঁকি মারিয়া দেখি—"ট্রিগ্নোমেট্রি"! কি পাপ! হতাশ ত হইলামই, তদতিরিক্ত অবাক্ হইয়া গেলাম। ভাবিলাম—এমন বেসুরো লোকও দুনিয়ায় আছে। "সিজার" যুদ্ধক্ষেত্রেই, অবকাশ সময়ে "গ্রামার" লিখিয়াছিলেন, ইনিও দেখিতেছি সেইরূপ একটা অদ্ভুত কিছু করিতে চলিয়াছেন।

আমাদের রেঙ্গুন-সমাগত বাঙ্গালী বাবুটি ছিলেন "চট্টোপাধ্যায়"। তাঁহাকে সকলে "চাটুয্যে" বলিয়াই ডাকিতাম। তাঁহার একটু পরিচয় আবশ্যক হইবে; কারণ তিনিই আমাদের এই বিপদ্-সঙ্কুল পথে, ভাবনা-চিন্তার দিনে, দুর্ভর সময় কাটাইবার পরম সহায়স্বরূপ হইয়াছিলেন,—বা 'মুস্কিল আসান' ছিলেন। বয়স ত্রিশ বত্রিশ, দেহ হৃষ্টপুষ্ট, বর্ণ এমনই 'কষ্টি-কাল' যে নয়নসুকের ধুতিতে তাহা ঢাকিত না; চক্ষু দুইটি স্বভাবতই ঈষৎ লোহিতাভ, সহজ বিশ্বাসী, খুব সপ্রতিভ, বেশ খোলসা লোক, এবং বাঙ্গালীর বদনামের উপযুক্ত ভীতু। আমাদের পুস্তকের প্রয়োজনটা, "কেন,—কি হবে?" প্রভৃতি প্রশ্নের পর বুঝিয়া

"আমি দিচ্চি" বলিয়াই, একখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণের কিয়দংশ, অর্থাৎ অরণ্যকাণ্ডের মাঝামাঝি হইতে লঙ্কাকাণ্ডের কতকটা এবং ঐ কালেরই, আধাআধি তৈলসিক্ত একখানি দাশরথি রায়ের পাঁচালী আনিয়া দিলেন। দেখিয়া, কেহ হাসিলেন, কেহ বাহবা দিলেন; আমি কিন্তু ভাবিলাম—"একজন খাঁটি বাঙ্গালী পাইয়াছি, এখনও ভেজাল ঢোকে নাই।" পরে,—মেরি করেলির একখানি "টেম্পোর্যাল পাওয়ার"ও হস্তগত হয়; কি সূত্রে তাহা ঠিক স্মরণ নাই। যাহা হউক, এই খোরাকেই আমাদের সমুদ্র-সফর শেষ করিতে হয়।

—৩—

বঙ্গোপসাগরের বুকে ঝাঁপ দিয়া পর্য্যন্ত ভয়, বিস্ময় ও আগ্রহ, এই ত্র্যহস্পর্শ লইয়াই অগ্রসর হইতেছিলাম। যাঁহার যিনি উপাস্য, এতদিন পরে সকলের নিকটই তাঁহাদের জোর ডাক্ পড়িয়াছিল। বিপদই মানুষের একমাত্র চাবুক; সেটা না থাকিলে বিশ্বটা যে কি এক অদ্ভুত মাংসপিণ্ড বহন করিত তাহা বলা যায় না। সেদিন সকলের সকল কাজের মধ্যে একটা সত্যের সুর সর্ব্বক্ষণই সজাগ ছিল। আমার তখন মনে কি সুখে ঠিক্ স্মরণ নাই, অতি দ্রুত দুর্গা নামের তরঙ্গ চলিতেছিল। প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, (লোকা ধোপা), শ্রীমন্তের সিংহল-যাত্রার পালা শুনাইয়া, আমার হৃদয়ে দুর্গানামের বীজ বপন করিয়া দিয়াছিল। জগতে কে যে কোন্ সূত্রে কাহার গুরু, তাহা বলা কঠিন।

এখন আমরা বাস্তবিকই—'জল, মেঘ ও বায়ু রাজ্যে' প্রবেশ করিয়াছি। সে অসীম বিশালত্বের যে দিকেই চাই, সবটাই—ভয় বিস্ময়ের

দৃশ্য। সে উত্তাল তরঙ্গ দেখিলে, প্রলয়ের প্রারম্ভ বলিয়া মনে হয়। ভীষণ বাত্যাতাড়িত বিজন অরণ্য-শৃঙ্গ, সে অরণ্য-শৃঙ্গ দেশে সর্ব্বদাই চলিয়াছে।

পরদিনের প্রভাত হৃদয়ে যেন চিরদিনের অন্ধকার ঘোষণা করিয়া দেখা দিল। চক্ষু চাহিয়াই শিহরিয়া উঠিলাম। হঠাৎ সম্মুখে যেন কালের ভীষণ ছায়া দেখিলাম। দেখিতে দেখিতে সেই ঘন কৃষ্ণ-ছায়ার কবলে আসিয়া পড়িলাম। ইনিই সেই স্বনাম-ধন্য "কালাপাণি"। রূপ দেখিয়া ভাবিলাম,—নামটি সার্থক বটে! যেমনি কাল, তেমনি গাঢ় ও দুর্গন্ধময়; আবার গর্জ্জন, আস্ফালন ও আলোড়ন ততোধিক; নির্ব্বাসনের নিখুঁত স্থান বটে! সে রংয়ের সামনে আমাদের চাটুয্যে ফিকে হইয়া গেল। সে সময়ে অতি-বড় নির্ভীকের মুখেও হাসি-তামাসার অবকাশ ছিল না। তুষারাবৃত পর্ব্বতসদৃশ ফেন-মুখী ঊর্ম্মির তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া যুগপৎ মনে হইল যেন, শক্তিসঙ্গিনী ডাকিনীর দল অট্টহাস্যে দানব-দলনে ছুটিয়াছে। রায়-গুণাকরের—

"ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে—আঁচল ধুলায় পড়ে,
আলু থালু কবরী বন্ধন।"—

যেন মূর্ত্তি ধরিয়াছে।

জাহাজ ভয়ঙ্কর দুলিতে লাগিল; সকলকেই চঞ্চল ও শশব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিছু না ধরিয়া, বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এমন সময় চাটুয্যে, নিতান্ত ভয়াকুলভাবে ও কাতরকণ্ঠে "প্রেস্‌ক্রাইব" করিলেন—"সকলে হনুমানকে স্মরণ করুন।" প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ শুনিয়া, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য ভয় ত ভাগিলই, একজন হাসির হিড়িকে পড়িয়াই গেল।

*　　*　　*　　*

জাহাজে পদার্পণ করিয়া পর্য্যন্ত দেখিতেছিলাম, ফিরিঙ্গী কয়জন ফুরসং মত, ডেকের উপর পাইচারি করেন। তাঁদের মধ্যে একটির ফুরসং অফুরসং ছিল না, অপেক্ষাকৃত সশব্দে ও দ্রুত তিনি সর্ব্বক্ষণই ঘুরিতেন। সঙ্গে সঙ্গে নভেল পড়া ও মাঝে মাঝে টক্কর খাওয়াও চলিত। আমার হাতে "টেম্পোর‍্যাল্ পাওয়ার্" দেখিয়া, হঠাৎ একদিন তাঁর গতিরোধ হয় ও দুচার বাৎচিৎ করিয়া ফেলেন। সেই সময়, উপদেশচ্ছলে "সি-সিক্নেস্" এড়াইবার একটা টোট্কাও বলিয়া দেন, যথা—"জাহাজের উপর সর্ব্বদা বেড়াবে, কদাচ বসে থাকবেনা।" অর্থাৎ Nothing like leather!

চতুর্থ দিনে মিস্টার্টিকে নিত্যকর্ম্মে গরহাজির দেখিয়া, অনুসন্ধানে জানিলাম, তিনি Sea-sicknessএ শয্যা লইয়াছেন; রোজাকে ভূতে পাইয়াছে, কালাপাণির দোলায়, ঝোলায় (হ্যামকে) শুইয়াছেন!

পরদিনও সেই এক ভাবই চলিতেছিল। ক্রমে, অনেকেরই সি-সিক্নেস্ দেখা দিল। রোগটার দৃশ্যও যেমন কদর্য্য, ভোগটাও তেমনি কষ্টকর,—আগাগোড়াই গুক্কারজনক। ভালর মধ্যে বাঙ্গালীদের কাছে তখনও সে ঘেসে নাই। সহসা দেখি আমার আলাপী মিস্টার্টি, খোলা বাতাসে বেঞ্চের উপর বসিয়া, বিকৃত বদনে—জ্যাম্-মাখানো বিস্কুট চর্ব্বণ করিতেছেন, আর ওয়াক্ ওয়াক্ করিতেছেন। তাহারাও গলার নীচে নামিবে না, তিনিও তাহাদের কবল-মুক্ত করিবেন না। কষ্টে দু-একটি কথা কহিলেন মাত্র; তাহারই ফাঁকে বুঝাইয়া দিলেন,— "যখনই বমন হইবে, তৎক্ষণাৎ সঙ্গে সঙ্গেই জোর করিয়া পেটে কিছু গমন করান অত্যাবশ্যক; এটিও এ-রোগের একটি অমোঘ টোট্কা।" আমি কিন্তু এই বীভৎস ব্যাপার আর তাঁর কদর্য্য কষ্ট দেখিয়া, ব্যস্ত

হইয়া সরিয়া পড়িলাম। উল্লেখে রুচি ছিল না; তবে, সকলের ত ধাত সমান নহে—যদি কাহারও কাজে লাগে, তাই উল্লেখ করিলাম।

সমুদ্র-সফরে ও-রোগটা আছে; সেজন্য যাত্রীরা যথাসাধ্য প্রস্তুত হইয়াই আসেন। আমরাও কেহ কেহ কিছু কিছু ফল, বিশেষ করিয়া নেবুটা, সঙ্গে লইয়াছিলাম, এবং যখন-তখন ও দরকারে-অদরকারে তাহারই ব্যবহার চলিতেছিল। সর্ব্বোপরি চাটুয্যে ফলগুলির উপর এমন ভর্ করিলেন যে, একদিন দেখি,—ডাব্ ও আনারস্ একটিও নাই; কয়েকটি কাগজি নেবু মাত্র গড়াগড়ি যাইতেছে। আমরা চিন্তিত হওয়ায়, তিনি অভয় দিয়া বলিলেন,—"আমার ফল ত সবই মজুত আছে, সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত খুব চলে যাবে।" শুনিয়া আমরা আশ্বস্ত হইলাম। উমেদার যুবকদ্বয়ের অন্যতম ছিল পাচু, তাহার সম্মুখের দন্তগুলি কিছু বড় ছিল এবং সে সর্ব্বদাই হাসিত। চাটুয্যের অভয়বাণী শুনিয়া সে, সব দাঁতগুলি অনাবৃত করতঃ থক্ থক্ করিয়া হাসিতে লাগিল। হাসির কারণ কিছু বুঝিলাম না; চাটুয্যেও না বুঝিয়া একটু হাসিল মাত্র। তবে, ইতিমধ্যে যুবকদ্বয়ের সহিত চাটুয্যের প্রণয়টা কিছু গাঢ়তর বোধ হইতেছিল; ভাবিলাম—এ-সব হাসি, সেই হিসাবেরই অন্তর্গত হইবে।

—৪—

পরিবর্ত্তনই প্রকৃতির ধর্ম্ম; আবার জলের রং ফিরিল। নয়নরঞ্জন নবদূর্ব্বাদলশ্যামবর্ণ দেখা দিল; জলরাশি অপেক্ষাকৃত শান্তমূর্ত্তি ধরিল; বশিষ্ঠের নিকট বিশ্বামিত্র যেন পরাস্ত হইয়া সরিয়া পড়িলেন।

অভাব ও অপ্রাচুর্য্যই সকল বস্তুর মূল্য বাড়ায়। আজ কয়দিন জল ভিন্ন কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই; আকাশও তাহার অসীম শূন্যমধ্যে মেঘ ও বায়ু ভিন্ন কাহাকেও প্রবেশাধিকার দেয় নাই। আজ সহসা একটি পাখী দেখা দেওয়ায়, জাহাজ-শুদ্ধ লোক তাহা দেখিতে বালকের মত উপরের ডেকে ছুটিল। এই কয়দিন মধ্যে পাখীটাও দুর্লভ বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শুনিলাম সিঙ্গাপুর সন্নিকট। একটা আশ্বাসের নিশ্বাস পড়িল। দেখিতে দেখিতে জাহাজখানি যেন পাঠশালায় পরিণত হইল। রকমারি কাগজ, দোয়াত, কলম, ফাউণ্টেন্-পেন্ ট্রঙ্ক হইতে বাহিরে আসিয়া বাঁচিল। সকলেই পত্র লিখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; কারণ সিঙ্গাপুরে পৌঁছিয়াই পোস্ট্ করিতে হইবে;—সূর্য্যমুখীর মাথার দিব্যটা এই-ভাবেরই ছিল। কেহ কেবিনে, কেহ ডেকে, কেহ চেয়ারে, কেহ বেঞ্চে বসিয়া গেলেন। এরূপ নাটকোচিত ক্ষেত্র পাইয়া, অনেকেই মনে মনে অনেক রকম ভাব ভাঁজিয়াছিলেন। কেহ বা একটি মাত্র বিরহ চ্যাপ্‌টারের চপেটাঘাতে, "উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম"কে চাটুয্যে মহাশয়ের দোকান হইতে মশলার দোকানে নির্ব্বাসিত করিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু বিধাতার বেয়াড়বী কাহাকেও বড় একটা অগ্রসর হইতে দেয় নাই। হঠাৎ একটা জোর হাওয়া, জাহাজের গায়ে ও ভাবের ঘরে, ভীষণ ধাক্কা দেওয়ায় অনেকেরই ইচ্ছা অপূর্ণ রহিয়া গেল। পত্র শেষ হইল বটে, কিন্তু অত নড়াচড়ার মধ্যে ভাবটা জমিল না—দিস্তে পড়ে গেল!

বেলা ৮টা হইতে সুদূর দিগন্তে পর্ব্বতমালা দেখা দিল। তাহারাই আমাদের দৃষ্টিকেন্দ্র হইয়া ক্রমশঃ সন্নিকট হইতে লাগিল। জাহাজ এখন যেন "শ্যাম-সায়রে" চলিয়াছে; জলের সে দুরন্ত ভাব নাই, জাহাজেরও গতি মন্থর। তখন "কূল" বলিয়া যে একটা কিছু

আছে তাহা বঙ্গদেশ ও "দেবীবরের" পেঁতে ছাড়িয়া, আমাদের দুই পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত। সকলেরই বদনে যেন—"আঃ বাঁচিলাম," এই ভাবটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইল; "ত্রাহি ত্রাহি" ভাবটা তফাতে গিয়া দাঁড়াইল।

বোসজা ছিলেন আমাদের বড়বাবু। তাঁহার সহিত আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ। তিনি খুব কাজের লোক, বুদ্ধিমান ও মিশুক মানুষ বলিয়া শোনা মাত্র ছিল। আমাকে "আপনি আপনি" বলিয়াই কথা কহিতেন। তিনি বলিলেন, "কেদারবাবু, সিঙ্গাপুর ত সন্নিকট; একবার ভাঁড়ারটার যদি খোঁজ নেন; সঙ্গে কিছু ফলের ব্যবস্থা ত থাকা চাই? অবস্থা বুঝে স্টুয়ার্ডকে অর্ডার দি। (স্টুয়ার্ডই যাত্রীদের আহার্য্য যোগাইয়া থাকেন, এবং সে জন্য কোম্পানীর কাছে নির্দ্দিষ্ট হারে মূল্য পান। অনুরোধ করিলে ও মূল্য দিলে আবশ্যক মত অতিরিক্ত দ্রব্যাদি আনাইয়াও দেন।) বোসজাকে বলিলাম—"চাটুয্যে বলেচে, তার সব মালই মজুদ্, সামান্য কিছু অর্ডার দিতে পারেন।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "বাঁড়ুয্যেদের সহজ-বিশ্বাসী ব'লে একটা সুনাম আছে বটে, তার আনন্দ তাঁরা নিজেরাই উপভোগ করুন,—তাতে কারুর আপত্তি নেই,—আর পাঁচজনকে জড়াবেন না প্রভু!" আমি চাটুয্যের আশ্বাসবাণী অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ না পাইয়া বলিলাম,—"কেন বলুন দিকি, সে কি মিছে কথা কয়েছে?" বোসজা বলিলেন,—"আমি তা' বলচিনা, তবে চাটুয্যে যে কাবুলী-মেওয়া আনেনি সেটা বোধ হয় অনুমান ক'রে নেওয়া কঠিন নয়; সুতরাং সে ফলগুলি সপ্তাহিক কাল সজীব না থাকাই সম্ভব।"

এই সময়, মলিন ও ছিন্ন একখণ্ড লাল পাছাপেড়ে কাপড়ে বাঁধা একটা মোট হস্তে, চাটুয্যেকে অস্বাভাবিক চালে আসিতে

দেখিয়া, আমাদের কথাটা থামিয়া গেল। চাটুয্যে আসিয়াই সজোরে সেই মোটটা ঝপ করিয়া বোসজার সম্মুখে ফেলায়, ভক্ করিয়া একটা তীব্র দুর্গন্ধ, সকলের নাসিকাকেই কুঞ্চিত করিয়া দিল। বোসজা ব্যস্তভাবে নাকে কাপড় দিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি?" চাটুয্যে সরোষে বলিল—"ঐ চারপেয়েদের আবার চাকরি হবে? কি সর্ব্বনাশটা করেচে দেখুন,—এক টুক্‌রি ফলের মধ্যে এই রেখেছে!" সকলে নাকে কাপড় দিয়া ঝুঁকিয়া দেখি, -একটি তাল, দুটি অর্দ্ধপক্ক কাঁচকলা, গণ্ডাকয়েক কাঁচা লঙ্কা (অধুনা চেনা কঠিন), কতকগুলি কাঁটালবীচি ও কাঁটালের পরিত্যক্তাংশ, আর দীর্ঘ-প্রস্থে অঙ্গুলি পরিমাণ ছয়-সাতটি শিকড়। পরে শুনিলাম, পূর্ব্বাশ্রমে ও পূর্ব্বাবস্থায়, তাঁহারা ছিলেন "মূলো"! দেখিয়া সকলেই অবাক্। উর্দ্ধে রুষ্ট কালকেতু সদৃশ চাটুয্যে, নিম্নে এই দৃশ্য, এতদুভয়ের মধ্যে হাসিটা কেবল সকলের কণ্ঠের কাছে হোঁচট্ খাইতে লাগিল! বোসজা বেসামাল হইবার ভয়ে, গাম্ভীর্য্য রক্ষার্থে, খুব ছোট্ট কথা খুঁজিয়া বলিলেন—"আর কিছু ছিল?" চাটুয্যে বলিল, "তার কি চিহ্ন রেখেচে মশাই—চেটে খেয়েছে।" ফলের চেহারা দেখিয়া সকলে নির্ব্বাক হইয়া ত ছিলই, কিন্তু এই পর্য্যন্ত শুনিয়া মজুমদার ভায়া আর থাকিতে না পারিয়া—"ওরে বাবারে, সে আবার কি ফলরে বাবা," বলিয়া বেধড়ক্ হাসিতে হাসিতে কুব্জাকারে ছুটিয়া অপর একখানি বেঞ্চে গিয়া বসিয়া হাসির ধাক্কা সামলাইতে লাগিল। চেটে খাবার ফলটা যে কি, সত্যই তাহা কেহ অনুমান করিতে পারিতেছিল না। মজুমদারের উপর একটি কঠিন কটাক্ষপাত করিয়া, চাটুয্যেই বলিল—"তিন্-তিন্‌পো গুড়ের এক গুঁড়োও রাখেনি! কত বড় অন্যাই! মশাই—প্রথম গাছের ফল সেই নধর শশাটি, সে আমাকেই খেতে ব'লে দিয়েছিল, বোকোসেরা—"

এইখানে বাধা দিয়া মজুমদার চীৎকার করিয়া হাসি ও কান্নার সুরে—"মেরে ফেল্লেরে বাবা, পারে আর পৌছুতে দিলে নারে বাবা" বলিতে বলিতে আবার একছুটে তৃতীয় বেঞ্চিতে গিয়া শুইয়া ধুঁকিতে লাগিল। বোসজা রাগের ভাণ করিয়া বলিলেন—"বড় ছেলে মানুষ ত"। আমার "বফার স্টেটের" (Buffer-state-এর) মত অবস্থা দাঁড়াইল; না হাসিতে পারি—কারণ চাটুয্যের কাছে আমার একটু বেশী সম্মান ছিল, পাছে খেলো হইয়া পড়ি; অথচ সে-আসরে হাসি চাপাও মস্ত বড় বীরের কাজ। ভগবান রক্ষা করিলেন, একটা দমকা হাওয়ায় একজন ফিরিঙ্গির চ্যাটায়ের টুপিটা উড়িয়া যাওয়ায়, তাহার পশ্চাতে আমার হাসিটাকে বেদম্ দৌড় করাইয়া দিয়া, সে-যাত্রা মান ও প্রাণ দুই-ই রক্ষা করিলাম। বোসজা বুঝিতে পারিয়া সহাস্যে বলিলেন, "ও টুপিটার দাম কম নয় কেদারবাবু!"

চাটুয্যে ছাড়িবার পাত্র নয়, সে বলিল—"আপনাকে এর বিচার করতেই হবে বড়বাবু।" বোসজা বলিলেন—"নাঃ—এ বড় অন্যায় কথা, এ-সব চেপে যাওয়া চলে না; আজ ফল গেল, কাল ঘটুটে-বাটুটে যেতে পারে, গরু-বাছুর থাকলে স্বস্তি থাকত না। সিঙ্গাপুর দেখা যাচ্চে, এখন সকলের মন ঐদিকেই থাকবে। তুমি নাব্‌চ ত? ফিরে এসে এই নিয়ে পড়া যাবে, আমি ছাড়চি না।" চাটুয্যে ঝুড়ি লইয়া চলিয়া গেল। আমরা নাকের কাপড় খুলিয়া ও সঞ্চিত হাসিটা যথাসাধ্য শেষ করিয়া বাঁচিলাম। মজুমদার তখনো প্রকৃতিস্থ হয় নাই, সে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"ফলের বহরটা দেখলেন ত—লঙ্কা মূলো গুড়! ওরে বাবারে—সাক্ষাৎ ফলহরির আবির্ভাব!" এ-সম্বন্ধে একটি ঘটনা উল্লেখ-যোগ্য, এই প্রহসনের যখন পরিপূর্ণ পরিণত অবস্থা, তখন আমাদের ট্রিগ্নোমেট্রি-দত্ত মহাশয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এতটা হাসির

হল্লার মধ্যে, তাঁহার বদনের কোন অংশে এতটুকু হাসির রেখা কেহ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। চলন্ত গাছ-পাথরের মত তিনি একটু তফাতে নড়িয়া গেলেন মাত্র।

জগতের সুন্দর ও সুবিখ্যাত বন্দরগুলির মধ্যে সিঙ্গাপুর বন্দরটি অন্যতম। বন্দরটির উভয় তীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালা ও বিবিধ বৃক্ষরাজি-পরিশোভিত ভূখণ্ড, মধ্যে মধ্যে হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র, স্থানে স্থানে উপবন-বেষ্টিত কুটির, নিম্নে নীলবর্ণ সমুদ্র,—বন্দরটিকে অতি নয়নারাম করিয়া রাখিয়াছে। অধিত্যকাভূমিতে সুন্দর সুন্দর ক্ষেত্র ও ফুল-ফল-পরিশোভিত উদ্যান, এবং নানা জাতীয় সুদৃশ্য পক্ষীসকলের কলকণ্ঠ দূরদেশাগত দর্শক মাত্রকেই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিয়া থাকে।

নানা বর্ণের ও নব নব গঠনের জাহাজ, স্টিমার, লঞ্চ্ ও নৌকা, ভিন্ন ভিন্ন পতাকায় পরিশোভিত হইয়া বন্দরটির দুই কূলের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। একটু গভীর জলে বিভিন্ন জাতীয় রণতরীসকল, আপন আপন গৌরব ও গাম্ভীর্য্যভারে স্থির রহিয়াছে। যেন একটি আর একটির গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকটিকে যেন অবহেলার চক্ষে দেখিতেছে। সমরপোতগুলি শ্বেতবর্ণের; দূর হইতে বিপক্ষের দৃষ্টি এড়ানই বোধ হয় এই শ্বেত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। যাহা হউক, রংটা কৃষ্ণ বা লোহিত বর্ণ হইলে, সাক্ষাৎ যম বা ছিন্নমস্তার প্রতিকৃতি বলিয়া ভ্রম হইত। তাহারা যেন এক একটি অভেদ্য অগ্নি-গর্ভ লৌহ-প্রাসাদ;—দিবারাত্র সসজ্জ ও প্রস্তুত থাকিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন সহ ধূম উদ্গিরণ করিতেছে। প্রত্যেকটিই যেন আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করিতেছে;—

"কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে বিতংসে।"

—আপসোস্, সেখানে অতিবিজ্ঞ বা বুদ্ধিমানদের ব্যবস্থা চলে না; চলিলে অকাজে এই লক্ষ লক্ষ টন্ কয়লা এরূপ বৃথা পুড়িতে পাইত না। "কাজের সময় আগুন দিলেই হবে" নীতিটা এখানে একদম্ অগ্রাহ্য।

এইবার সিঙ্গাপুর দেখিতে যাইবার ছাড় পাইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণ দুই ঘণ্টার ছাড় পাইলেন; কারণ জাহাজ বেশীক্ষণ দাঁড়াইবে না, কয়লা লইয়া সেইদিনই আবার গন্তব্য পথাভিমুখী হইবে। তখন সযত্ন-রক্ষিত মহামূল্য পত্রগুলি লইয়া জাহাজ ছাড়িয়া ডিঙ্গিতে উঠা গেল। ডিঙ্গি-গুলির উত্তর দক্ষিণে "কিঞ্চিৎ চাপা"। বাল্যকালে পৃথিবী সম্বন্ধেও এই কথা পড়িয়াছিলাম। দেখিলাম, কল্পনাটা এ-ক্ষেত্রেও অসংলগ্ন হয় নাই; কারণ, এই ডিঙ্গিগুলি এক একটি ক্ষুদ্র জগৎ বলিলেই হয়। ডিঙ্গির স্বত্বাধিকারীদের জন্ম, কর্ম্ম, বিবাহ, মৃত্যু এই ডিঙ্গির মধ্যেই হইয়া থাকে। সে-ই তাহাদের গৃহ, সে-ই তাহাদের সংসার ও কার্য্যক্ষেত্র, তাহাতেই রন্ধন, তাহাতেই শয়ন। গৃহিণী কোলের ছেলেটিকে পিঠে বাঁধিয়া হাল ধরিয়াছে, স্বামী ও পুত্র-কন্যারা দাঁড় টানিতেছে। স্ত্রীলোকের হাতে হাল দেখিয়া, তাহাতে আত্মসমর্পণ করিতে একবার একটু ইতস্ততঃ ভাব যে আসে নাই এমন নহে।

ডিঙ্গির ভিতর আটজন আরোহী বেঞ্চীতে বসার ন্যায় পা ঝুলাইয়া বেশ বসিতে পারেন। আমরা ততটা ভরসা না করিয়া চারজনে একখানি ডিঙ্গি দখল করিলাম, এবং কর্ত্রীকে বুঝাইয়া দিলাম যে, আমরা আটজনের পয়সা দিব। ডিঙ্গি পালভরে চলিল। ডিঙ্গিওয়ালী সহাস্যমুখে আমাদের বলিল—"ভয় পাইও না, নড়িও না।" আমাদের হিসাবে ভয়ের যথেষ্ট কারণ থাকিলেও, অভয়ার জাতের অভয় বাক্যে নির্ভর করা ভিন্ন তখন আর অন্য উপায় ছিল না।

ডিঙ্গির পালখানি নৌকার পরিমাণে ও আমাদের দেশের পালের তুলনায় অনেক বড়; এমন কি আমাদের দেশের মাঝিরা ইহা অপেক্ষা দ্বিগুণ বড় নৌকাতেও এত বড় পাল সংযত করিতে ও সামলাইতে পারে না। বাংলাদেশে জোর হাওয়ায়, পালতোলা নৌকা বড়ই ভয়ের বস্তু। একটু বেশী হাওয়া লাগিলে, মাঝি পর্য্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়ে, এবং আরোহীদের প্রাণ শুকাইয়া যায়, নিঃশ্বাস মূলাধারে গিয়া আশ্রয় লয়। পালের দড়ি ছিঁড়িলে পুরোহিত সুদ্ধ নিরঞ্জন। সে অবস্থায় পালখানি নামাইতে বা "মারিতে" দুইজন বলবান লোকের আবশ্যক। এখানে কিন্তু খুব সামান্য ও সহজ উপায় বর্ত্তমান; হাওয়ার বেগ বুঝিয়া প্রয়োজন মত পালের সঙ্কোচ ও বিস্তার করা চলে। পালের দড়িগাছটি কর্ণধার-রূপিণী কর্ত্রীর হাতেই থাকে, তিনি বায়ুর ন্যূনাধিক্য অনুসারে, পাল কমান্ বা বাড়ান্। একটু বেশী হাওয়া সংগ্রহ করিবার বা আট্‌কাইবার ইচ্ছা করিলে, যতটুকু আবশ্যক পালখানি বাড়াইয়া দেন। অনেকটা রঙ্গমঞ্চের পটের হিসাব, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অনেক সহজ ও সামান্য উপায়ে এ কার্য্য সাধিত হয়। পালগুলি প্রায়ই চেটায়ের বা মাদুরের; এমনভাবে বোনা যে চট্ বলিয়া ভ্রম হয়; অথচ তাহা বেশ কার্য্যোপযোগী ও সস্তা।

—৫—

ডিঙ্গি ডাঙ্গা স্পর্শ করিতে না করিতে, সকলে লম্ফ দিয়া ভূমি স্পর্শ করিয়া বাঁচিলাম; কারণ "সপ্ত দিবা বিভাবরী" ভূমির দর্শন বা স্পর্শন ঘটে নাই। তদ্ভিন্ন, এই লম্ফটা অনেক দিক রক্ষা করিল;

সাগর-পারের সনাতন নিয়মটা এইভাবে রক্ষা হইয়া গেল; বোধ হয় এতদ্দ্বারা সাগর-পারের দেবতাটিরও সম্মান বজায় রহিল। আমাদের নামিতে দেখিয়া ঘোড়ার গাড়ী ও রিক্সাবাহকের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। রিক্সাগুলি বগিগাড়ীর "বাবালোগ্" বা বাচ্চা বলিলেও চলে। রিক্সা কথাটার ব্যাখ্যা আজ অনাবশ্যক, এখন তাহাদের কলিকাতার পথে-ঘাটে পা ছড়াইয়া থাকিতে নিত্যই দেখা যায়। আমরা একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিয়া, গাড়োয়ানকে হুকুম করিলাম—"পোস্ট-অফিস্"; কারণ জাহাজে-লেখা পত্রগুলির মধ্যে "সাতশো রাক্ষসীর প্রাণ" রহিয়াছে; অন্ততঃ সকলের ইহাই ধারণা।

দেখি, সিঙ্গাপুরের পথগুলি প্রশস্ত, পরিষ্কার ও পাকা। দুই পার্শ্বে সুদৃশ্য উদ্যান এবং তন্মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চভূমি বা পর্ব্বতখণ্ডের উপর, অতি সৌখীনভাবে নির্ম্মিত বাংলো (Bunglow) ধরনের বাড়ী। কোনটি লাল, কোনটি নীল, কোনটি হলদে, কোনটি সবুজ এবং কোনটি বা গোলাপী,—যেন ছবিগুলি। দেখিতে দেখিতে ডাকঘরে পৌঁছিলাম। ডাকঘরটি ছোট অথচ বেশ সুন্দর ও পরিষ্কার। কর্ম্মচারিগণ অধিকাংশই সাঙ্গাই-যুবক। যিনি আমাদের পত্রগুলি লইলেন, তিনি ইংরাজি বোঝেন ও ইংরাজিতে কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন। টিকিট কিনিবার জন্য টাকা বাহির করিয়া ফ্যাসাদে পড়িলাম; আমাদের টাকা এখানে অচল! এত সাধের চিঠিগুলি চড়ায় ঠেকিল। সৌভাগ্যক্রমে সকল বাঙ্গালীই আমার মত বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা লইয়া ঘরের বাহির হয়েন নাই। কেহ কেহ জাহাজের কর্ম্মচারিগণের নিকট হইতে পূর্ব্বাহ্নেই টাকা বদলাইয়া ডলার্ ও সেন্ট্ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই সাহায্যে আমার মত বুদ্ধিমানের কিনারা হইল।

এইবার নিশ্চিন্ত হইয়া সিঙ্গাপুর সহর ভ্রমণে বাহির হওয়া গেল। গাড়োয়ানকে হুকুম করা গেল "মার্কেট্"। সুদৃশ্য উদ্যান, হর্ম্ম্য, কলকারখানা দেখিতে দেখিতে বাজারে উপস্থিত হইলাম। প্রায় এক বিঘা জমির উপর পাকা নাটমন্দির সদৃশ ইমারৎ—মাঝে মাঝে থাম দেওয়া। আমরা বাঙ্গালী—শাক্-সব্জী ও মাছ খাইয়াই মানুষ, সুতরাং সব্জী-বাজারেই প্রবেশ করা গেল। দেখিলাম—নটে, পালম্, কল্মী পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। সুশনী শাকটা বোধ করি বঙ্গদেশে যাঁহারা কোমর-ভাঙ্গা পড়া পড়িয়া, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গুরুপাক উপাধিগুলি গ্রাস করতঃ এখন অজীর্ণ-জন্য ধোয়ামুগ ও জলসাগুর আশ্রয় লইয়াও অনিদ্রার অশান্তি এড়াইতে পারিতেছেন না, তাঁহাদেরই জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছে। যে কারণেই হউক, সুশনীর সাক্ষাৎ পাইলাম না। পুঁই শাক্টাও বোধ হয় বঙ্গদেশের একচেটে ঐশ্বর্য্য, নচেৎ একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রতিপালন দুঃসাধ্য হইত। বেগুনের বাড়্ বিষম। মূলো অপেক্ষাকৃত বেঁটে, কিন্তু খর্ব্বতাটুকু পরিধিতেই পূরণ করিয়া লইয়াছে। আলু, রাঙাআলু, কপি, কচু, কিছুরই অনটন নাই। ওল এখন সাঁতরাগাছির উপর সদয়; তিনি গৌরবর্ণ ধারণ করিয়া জেণ্টেল্ম্যান্ হইয়াছেন। গাড়ী করিয়া কলিকাতায় আসেন, আর কোষ্ঠ-কঠিন বাবুদের রুমালে বা গ্লাড্স্টোন্ ব্যাগে স্থান পান; তাই এ-সব অঞ্চলে বড় একটা নজর রাখেননি।

ফলের বাজারে চাহিলে চক্ষু জুড়ায়। একা আনারসই যেন কিংখাপের আবরণে চাবিদিক আলো করিয়া রাখিয়াছে; তাহাদের মিষ্টগন্ধে বাজার ভরপুর। যেমনি সরস তেমনি সুমিষ্ট, কেহ কণামাত্র চিনির মুখাপেক্ষী নহে। সিঙ্গাপুরী কলা ও নারিকেল সুপ্রসিদ্ধ। শ্রদ্ধা সহকারে কিঞ্চিৎ কলা সংগ্রহ করা গেল; কারণ, নিরাপদে সমুদ্র

পার হইবার পক্ষে, উহাই ত্রেতাযুগের ছাড়পত্র। সিঙ্গাপুরের শশাগুলি কিঞ্চিৎ কৃশ, কিন্তু দৈর্ঘ্যে তাহা পূরণ- হইয়াছে। চাটুয্যের মামলা ঝুলিতেছে, তাহার শান্তির জন্য কয়েকটি মূলো ও ক-জোড়া শশা লওয়া হইল। ইক্ষুদণ্ডগুলি কচি বাঁশ বলিলে চলে। লেবু প্রভৃতি অন্যান্য ফলের বিশেষ উল্লেখ অনাবশ্যক। বাজারে ডাব দেখিতে না পাইয়া বড়ই দমিয়া গেলাম, কিন্তু আশা ত্যাগ করিলাম না।

মাংসের বাজারটা দ্রুতপদেই অতিক্রম করিতে হইল; কারণ, মাংসটা সেখানে মাংস ভিন্ন আর কিছু নয়; গো-মাংস, শূকর-মাংস ভেড়ার মাংস বেশ সদ্ভাবে পাশাপাশি অবস্থান করিতেছে। মৎস্যের বাজারে প্রবেশ করা গেল। মৎস্য দেখিয়া যাঁহার না আনন্দ ও লোভ হইয়াছিল, তিনি বাঙ্গালীই নন। ঘুশো-চিংড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া রুই, মির্গেল, কালবোস, ভেঁট্কি সকলেই উপস্থিত। এত বড় পায়রাচাঁদা পূর্ব্বে কখন দেখি নাই, ওজনে এক একটি দেড় সের হইবে ভেঁট্কিগুলি একআধ বৎসরের শিশু অবলীলাক্রমে গ্রাস করিতে পারে। শঙ্কর মাছ যথেষ্ট, তদ্ব্যতীত অজ্ঞাতনামা মৎস্য যে কত প্রকারের দেখিলাম, তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা ফটো দ্বারা অধিক পরিস্ফুট করা চলে। ডিঃ গুপ্ত মহাশয়ের জীবিত মৎস্যের ঝোলের ব্যবস্থাটা এইখানেই তামিল হওয়া সহজ, কিন্তু একটিও পীলে-রোগী দেখিলাম না। ইলিস প্রচুর। লাল রংয়ের মাছ আমাদের দেশের সৌখীন বড়-লোকদের একটা ঐশ্বর্য্যের মধ্যে গণ্য। কেহ বোতলে, কেহ চৌব্বাচ্চায় রাখিয়া নয়ন ও মন তৃপ্ত করেন। সেগুলির মধ্যে যাহারা খুব বড়, তাহারা আধ-পোয়ার মধ্যে। এখানে আধ-পো হইতে আরম্ভ করিয়া, তিনি চারি সের পর্য্যন্ত, লাল ও সবুজ বর্ণের

মাছ দেখিলাম ; এক আধটি নয়,—স্তূপাকার ! প্রথম দর্শনে তাহাদের প্রকৃত বলিয়া কেহই বিশ্বাস করিতে পারি নাই। ভাবিয়াছিলাম ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য রং মাখাইয়া রাখিয়াছে। পরে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, সত্য সত্যই তাহাদের রংই ঐ। এইবার কর্কটের কাহিনী ; তাহাদের সংখ্যাতীত সমাবেশ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। এক-একটি আধসের তিনপো, শ্বেত ও ধূসর বর্ণের উপর নীলের চিত্র, নীল বর্ণের উপর শ্বেত ও লোহিত বর্ণের চিত্র অতি মনোহর। তাহারা অযোধ্যার রাজসিংহাসন পাইবার উপযুক্ত কি না জানি না, তবে বরুণরাজের বালাখানার বস্তু বটে। সুঁট্‌কি মাছের বাজার বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেও, পাঠকের নাড়ী কয়টা স্থানচ্যুত হইবার আশঙ্কায় পরিত্যক্ত হইল। পরে ডিম্ব ও পক্ষিবিশেষের বাজার পার হইয়া দেখি, একদিকে রন্ধন কার্য্য চলিয়াছে ও দলে দলে শ্রম-জীবীরা আসিয়া, সেই অর্দ্ধপক্ক খাদ্য, এক একটি চীনেমাটির বাটিতে করিয়া, দুইটি কাটির সাহায্যে অতি উপাদেয় জ্ঞানে ভক্ষণ করিতেছে। তন্মধ্যে শাক-সব্জী, মৎস্য-মাংস, একাধারে সবই বর্ত্তমান। জাতিভেদের জয়ঢাক এখানে একদম নীরব।

ইতিমধ্যে ইলিস্, বাটা ও গল্‌দাচিংড়ি খরিদ হইয়াছিল, তাহা ও সামান্য শাক-সব্জী এবং গোটাকয়েক আনারস লইয়া গাড়ীতে ওঠা গেল। পান ও ডাব কিনিবার ইচ্ছা প্রবল থাকায়, একটি দ্বিভাষীকে সঙ্গে লইয়া সহরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সহরের পথের দুইধারে সমরেখায় সারবন্দী, বড়লোকদের ও সওদাগরদের বাটীর সম্মুখভাগ রঙিন কাগজ, জগ্‌জগা ও সোনালীর ফল ফুল পতাকা ও আলেপনে স্বত্বাধিকারীর রুচি ও অবস্থা জ্ঞাপন করিতেছে। সাইন্‌বোর্ডগুলি সোনার জলে লেখা।

অনেক ভারতবাসী এখানে আসিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছেন। তন্মধ্যে নাকোদার এবং বোম্বাই ও গুজরাট অঞ্চলের শেঠ্‌ ও মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। এখানকার সাধারণ সম্প্রদায় ও মুটে-মজুরগণ, আকার প্রকার ও বর্ণে অনেকটা ব্রহ্মদেশবাসীদেরই মত। বড় লোক সর্ব্বত্রই স্বতন্ত্র জীব।

আমাদেব দেশে পাঠশালার গুরুমহাশয়েরাই বেতের বাগানের মালিক; তাঁহাদেরই কৃপায় আমাদের এই ধারণা ছিল, তাহার প্রমাণ খুঁজিতে অপরের পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে হইত না। কিন্তু এখানে বেতের ব্যাপার দেখিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম যে, এখানকার পাঠশালে পড়িতে হয় নাই! যাহা হউক এখানে বেতের শিল্পকার্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। বেতের টেবিল, চেয়ার, কৌচ, টুপি, ট্রঙ্ক, বিবিধ প্রকারের আধার—টুল, বেঞ্চি, আলমারি, সবই বেতের। তাহাদের সূক্ষ্ম-শিল্প-সৌন্দর্য্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তদ্ব্যতীত এক এক পাব "ম্যালাক্কা কেনের" সুগঠিত ছড়ি ও চাবুক সৌখীন-সম্প্রদায়মাত্রেরই সোহাগের বস্তু।

একস্থানে ডাব দেখিতে পাইয়া গাড়ী থামান গেল। আমারই উপর খরিদের ভার পড়িল। ইতিপূর্ব্বে কখনও একত্র থাকার সুযোগ (বা কুযোগ) না ঘটায়, সহচরগণ এমন ভুলটা করিয়া ফেলিলেন। একে ব্রাহ্মণ-সন্তান, তাহাতে সময়টা মধ্যাহ্ন, রৌদ্রটাও খুব প্রচণ্ড থাকায় পিপাসাটাও দস্তরমত প্রবল দাঁড়াইয়াছিল, কাজেই দর-দস্তর না করিয়াই দুইটা ডাবের মুখ কাটাইয়া ফেলিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়—দুইটা ডাবের জল নিঃশেষ করিতে আমরা চারিজন জখম্ হইয়া পড়িলাম। জলের মিষ্টতা পাইয়া নেয়ার উপর লোভ পড়িল, তাহাও অতি প্রীতির সহিত ভক্ষণ করা গেল। পান ও ভক্ষণান্তে, সে দুর্লভ বস্তুর দর-দস্তুর

করা ভদ্রোচিত হয় না। একটি কাঁদিতে পাঁচটি ডাব ছিল, তাহাও গাড়ীতে তুলিয়া লওয়া গেল, এবং তাহারা যে মূল্য চাহিল, তাহাই দেওয়া হইল; এক একটি ডাব প্রায় ছয় পয়সা করিয়া পড়িল। বোসজা বলিলেন, "দর করলে বোধ হয় চার পয়সা ক'রে পেতেন।" আমি বলিলাম—"দোহাই মশায়, ঐ 'বোধহয়টার' কুহকে পড়বেন না, ওটা চিরকালই লোকের শান্তিভঙ্গ করে আসছে।" পরে পান, সুপারি, চুণ ও খয়ের খরিদ হইল। পানগুলি কর্পূরী পান, খয়ের খুব খাস্তা— একটু টিপিলেই ময়দার মত হইয়া যায়।

আর বিলম্ব করা যায় না, নির্দ্দিষ্ট সময় সন্নিকট হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং জাহাজে ফেরা গেল। স্টুয়ার্ডকে ফল আনিবার ফর্দ্দ দেওয়া হইয়াছিল; তিনি প্রচুর ডাব, আনারস, কলা, নেবু প্রভৃতি আনিয়া হাজির করিলেন; জাহাজও ছাড়িল।

—৬—

আবার সেই অসীম অনন্ত অতলস্পর্শ সিন্ধু। সমুদ্রবক্ষে জাহাজের অবিরাম গতি আবার আরম্ভ হইল। জলের উপর থাকিয়া জলের কথা লিখিবার অনেক থাকিলেও, তাহা কোন পক্ষেরই স্বাস্থ্যকর নহে; সুতরাং দু'একটা অন্য প্রসঙ্গে হংকং পৌছিবার চেষ্টা করাই ভাল।

জাহাজ সিঙ্গাপুর পৌছিবার কিছু পূর্ব্বে, বোসজা মহাশয়, সঙ্গী যুবকদ্বয়কে ডাকিয়া, চাটুয্যের শশা-চুরির ইতিহাসটা সবিস্তারে শুনিতে চান। তাহাতে দীর্ঘদন্তী পাঁচুর বা পঞ্চাননের দন্তগুলি

একেবারে বদনের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং বর্ণনার ব্যাঘাত উৎপাদন করে। সে বহু বাধা ঠেলিয়া আরম্ভ করিল—"মশাই, উনি কোন্ দেশের লোক জানি না, এই মরণ-বাঁচনের পথে রাজ্যের অযাত্রা নিয়ে, আমাদের ডোবাতে এসেছিলেন।" বোসজা বলিলেন—"এসেছিলেন কি হে? এখনও ত রয়েছেন। আবার অযাত্রাটা কি পেলে?" পাঁচু উৎসাহের সহিত বলিল—"রয়েছেন বটে, কিন্তু সে বিষ আর নেই, আমরাই সেটা সাবার ক'রে দিয়েছি, চাকরি-বাকরি নেই, যেতে হয় আমাদেরি যাওয়া ভাল।" বোসজা হাসিয়া বলিলেন,—"একটু শীগ্‌গির সারো।" পাঁচু বলিয়া চলিল—"লোকটা মশাই খাটি aboriginal, একদম আদিম আমলের আর দস্তুরমত দাশুরায়-ঘাঁটা;—অপচার আর অযাত্রার মধ্যেও অনুপ্রাসের ঘটা কি!" বোসজা অধীর হইয়া বলিলেন,—"নাঃ, তোমার কাছে শুনতে হ'লে এ-জন্মে কুলোবে না।—হরিপদ, তুমিই বল।" হরিপদ মাথা হেঁট করিয়া বলিল,—"আজ্ঞে ও-ই সবটা জানে, আমার পাঁচ কোষেই পেটের অসুখ করেছিল।" শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল। মজুমদার ভায়া বলিলেন,—"ওরে বাবা! এযে বোসজা মশা'র যাত্রার দল হয়ে দাঁড়ালো। চলতে দিন্ মশাই—বেশ চল্‌চে।"

কোন একটা ভারি রকমের আশা ভরসা বা উৎসাহ পাইলে লোকের বুক পাঁচ হাত বাড়িয়া যাইতে শুনিয়াছি, দাঁত বাড়িয়া যাইবার কথা কুত্রাপি শুনি নাই; এ ক্ষেত্রে একেবারে সরেজমিনে সেটার দর্শনলাভ ঘটিল, পাঁচুর দাঁত সামলান সুকঠিন হইয়া দাঁড়াইল। সে আবার আরম্ভ করিল—"মশাই, ঝোলার হাত দিয়ে দেখি—কলা, কাঁটাল, কাসুন্দি, 'ক'য়ের কেরাবাৎ কমিটি! বাকি ফলগুলি ত দেখেছেনই! মূলো, লঙ্কা যদি ফল হয়, ত কাসুন্দিটে হবে না কেন?

ফল না বলেন, 'ফলেট' বলতে পারেন ; ওতে থাকেন—তেঁতুল, সরষে, হলুদ, সবই ত গেছো জিনিষ।" বোসজা বলিলেন,—"বাবা ক্ষেমা দাও, আমার ঘাট হয়েছে।" "সে কি মশাই"—বলিয়া পাঁচু তাড়াতাড়ি বোসজা মশায়ের চরণ স্পর্শ করিল ও বলিল,—"মশাই, সে কি দু'কথার জিনিষ, একদম মধুবন !—পেল্লায় দু'ছড়া কাঁচকলা,—যেন মালসা পোড়াতে চলেছি ! একটা কেঁদো কাঁঠালের আধ-পচা আধ-খানা, একটি প্রকাণ্ড পাড় শশা, গুটিকয়েক মূলিকা (পালমের গোড়াও বলা চলে), তদুপরি গুড়, কাসুন্দি, লঙ্কা,—একেবারে জয়ডঙ্কা,—ফলের ফ্যামিলি গ্রুপ্ ! অযাত্রাগুলি রেখে কি স্বস্তি ছিল মশাই, আপনারা দয়া ক'রে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন, ও-বিপদ কি আমাদের স্কন্ধে রেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি ?" মজুমদার তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "বটেই ত, বেঁচে থাক ভাই, বেশ করেছ : কিন্তু বেচারার সেই কচি শশাটি—" পাচু তাড়াতাড়ি বলিল—"ওঃ, সে এক ভীষণ প্যাথেটিক চ্যাপটার্। একদিন চাটুয্যে-মশাই শশাটি বার করে বল্লেন,—"এটি আমাদের গাছের প্রথম ফল কি না তাই আমাকেই খেতে বলে দিয়েছেন।" এই বলেই কাঁদ কাঁদ হয়ে পড়লেন ; সেটি নেড়ে চেড়ে আবার যথাস্থানে রেখে দিলেন। বোধ হয় গাছটির গোড়া পর্য্যন্ত তাঁর মনে প'ড়ে গিয়েছিল। আহা, দেখাতে পারলাম না, সেটি মশাই দেখবার জিনিষ ছিল,—পাকা পাটকিলে রঙ্গের শিবলিঙ্গ বললে হয়, চন্দনের ফোটা টেনে প্রতিষ্ঠা করা চলত। তাই আমি মশাই তাতে যে শিনি, হরিপদ বামনের ছেলে—ও-ই উদরস্থ করেছে। কলকেতায় থাকলে বিচিগুলো ডেন্টিস্টদের কাছে দরে বিক্রি হত।" বোসজা যেন ভীতভাবে প্রশ্ন করিলেন—"বিচিগুলো শুদ্ধ গিলেছে নাকি ?" পাঁচু বলিল,—"ফ্যালে কোথায় বলুন ; আসছে জন্মে

আমারি মত 'খলু দন্তবন্ত' হবেন আর কি! তা মশাই, এ-সব কাজ ত আর ধীরে-সুস্থিরে করা চলে না,—অমন্ আমড়ার মত কাঁটাল বিচিগুলোই আধাআধি পেটে গেছে। সে-সব 'ক্রিটিকেল্ মোমেণ্ট্'—ভবানী-ভ্রূকুটি-ভঙ্গীর মত, ভুক্তভোগী ভিন্ন বুঝতে পারবেন না।"

হাসির রোল্ পড়িয়া গেল। হাসির বিরাম ত ছিলই না, তাহা তালে তালে উঠিতে নামিতেছিল,—সেটা বাদ দিয়াই লিখিতেছি। মজুমদার মুগ্ধ হইয়া পঞ্চাননের বচন-পারিপাট্য উপভোগ করিতেছিল। বোসজা বলিলেন,—"শেষ হ'ল যে, বাঁচলুম।" পাঁচু বলিল,—"সে আর কতক্ষণের জন্যে মশাই; ও নরুকে-টুকরি বর্ত্তমান থাকতে, ও-তল্লাটের কারুর কি আর বাঁচবার আশা আছে।" বোসজা বলিলেন,—"ঐ কথাটার জন্যেই ত ডেকেছিলুম; তোমার ব্যাখ্যায় বেহোঁস ক'রে দিয়েছে। অথ—আমরা চাটুয্যেকে নিয়ে নাব্‌চি, আমাদের ফেরবার আগেই ও-বিপদটি বিসর্জ্জন দিয়ে ফেলো।" পাঁচু বলিল—"তারপর উনি এসে কি আর আমাদের ডাঙ্গায় রাখবেন!"

বোসজা বলিলেন,—"সেই কথাটাই ত বলচি; জিজ্ঞাসা করলে বোলো—জাহাজের চিফ্-সাহেব ঘুরতে ঘুরতে আমাদের মহলে ঢুকেই নাকে রুমাল দিয়ে ভ্রূ কুঁচকে থমকে দাঁড়ালেন, তারপর চতুর্দ্দিকে দেখে বেড়াতে বেড়াতে টুকরির কাছে এসেই লাফিয়ে উঠলেন, আর চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে প্রশ্ন করলেন—'এ ডার্টি জঞ্জাল কারু?' আমি বিপদ বুঝে বল্লুম—'হুজুর এ ত এখানে ছিল না, কে রেখে গেছে দেখছি, এ বাঙ্গালীর জিনিষ হতেই পারে না।' সাহেব তখন একজন খালাসিকে ডেকে সেটা তুলিয়ে নিয়ে গেলেন; তারপর কি হ'ল জানি না! যাবার সময় কেবল বললেন,—মুর্খেরা জানেনা—জাহাজে এপিডেমিক আরম্ভ হ'লে কেউ বাঁচবেনা।" পাঁচু বলিল—"যে আজ্ঞে, আপনি নিশ্চিন্ত

থাকুন।" আমি সাক্ষী ভ'য়েরের তারিফ করিয়া বলিলাম—"বোসজা মশাই, আপনি অদ্বিতীয় উকিল হ'তে পারতেন।" তিনি হাসিয়া বলিলেন,—আমি আনরপুর পরগনার লোক হে,—সেখানকার এক একজন চাষাও বড় বড় ব্যারিস্টারকে বোকা বানিয়ে বিদায় দেয়!"

সকলেই এই একটানা একঘেয়ে সুদীর্ঘ সফরে একটু আমোদের কিছু পাইলে বাঁচে। মজুমদার ভায়া আজ পঞ্চাননকে আবিষ্কার করিয়া বড়ই আশান্বিত হইয়াছিল। সিঙ্গাপুর দর্শনান্তে ফিরিয়া রাত্রে আহারাদির পর সকলে যখন উপরের ডেকে জমায়েৎ হওয়া গেল, সে আশা করিতেছিল, সকালের মুলতুবী মামলাটা এইবার বেশ গুলজারভাবে রুজু হইবে। কিন্তু কাহাকেও সে সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করিতে না দেখিয়া শেষে নিজেই কথাটা তুলিল,—এতবড় দুনিয়াটায় এতকাল বাস ক'রে যা দেখিনি, এতটুকু জাহাজে এই ক'টা দিন মাত্র বাস ক'রে তা দেখা গেল। উষাহরণ, সীতাহরণ, পারিজাত-হরণ, বস্ত্রহরণ দেখেছি; কিন্তু বাবা শশা-হরণের সংবাদ পাইনি, সেটা এই জলে পড়ে পেলুম!" চাটুয্যে তাড়াতাড়ি একটু ঘেঁসিয়া গিয়া, নীচুস্বরে বলিল—"সে-সব মিটে গেছে মশাই, ওকথা আর তুলবেন না, যেতে দিন।" বোসজা বলিয়া উঠিলেন—"সে কি, আমি যে এই গঙ্গার উপর—" কথা শেষ করিতে না দিয়া চাটুয্যে সকাতর বিনয়ে তাহাকে একটু তফাতে লইয়া গিয়া, বিপদের বার্ত্তাটা জানাইয়া, এ সঙ্কটে রক্ষা করিতে অনুরোধ করিল! বোসজা গম্ভীরভাবে সবটা শুনিয়া অভয় দিয়া বলিলেন,—"তবে কি না, ঐ চিফ্ সাহেবটি সহজ লোক নহেন, বড়ই তিরিক্ষি;—তা হ'ক, অমন অনেক সাহেব চরিয়ে এসেছি; তোমার কোন ভয় নেই।" বুঝিলাম ঔষধ ধরিয়াছে, পঞ্চাননের ফতে। মামলা মিটিয়া গেল। মজুমদার মন-মরা হইয়া শয়ন করিতে গেল, চাটুয্যে অনুগমন করিল।

পঞ্চানন বলিল,—"যা করেছি মশাই, কলকেত্তা হ'লে রোজ চপ্ খাবার সুবিধে হ'য়ে যেত।" বোসজা বাহবা দিয়া বলিলেন—"আর যেন ও কথার উল্লেখ করা না হয়।" এইখানেই ফল-হরণের পালা সমাপ্ত হইয়া গেল।

—৭—

জাহাজে পদার্পণ করিয়া পর্য্যন্ত যাহা যাহা চক্ষে পড়িয়াছে, তাহার সবগুলিই অজ্ঞাত-পূর্ব্ব ও অদ্ভুত এবং বাঙ্গালী (অন্ততঃ বিশ বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালীর) শোণিত-শোষক। মধ্যে মধ্যে এক একটা হাবাতে হিড়িকে হাড় হিম হইয়া যাইত।

একদিন প্রাতে ঘন ঘন ঘণ্টার ঘায়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; ব্যাপারটা জানিবার জন্য তাড়াতাড়ি অপার-ডেকে উঠিতে গিয়া বাধা পাইলাম; জাহাজের একজন কর্ম্মচারী উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"যে যে-অবস্থায় যেখানে আছ, পথ ছাড়িয়া স্থির হইয়া দাঁড়াও, এদিক্ ওদিক্ করিওনা, গোলমাল না হয়।" শুনিয়া সকলের মুখ শুকাইয়া গেল, কারণটা বা ঘটনাটা কি তাহা জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে টাঙ্গি, হাতুড়ি, খন্তা, হাম্বোর প্রভৃতি অস্ত্রাদি লইয়া ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ও তাঁহার পশ্চাতে—কয়েকজন খালাসী দ্রুত ছুটিয়া গেল; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জন পনের লোক মোটা লম্বা লম্বা চামড়ার নল ও পম্পিংমেশিন্ লইয়া ছুটিল। পশ্চাতে অপর বারজন বালতি, দড়ি ও চেন লইয়া চলিল; সকলেই বেজায় গম্ভীর ও ব্যস্ত। হুলস্থূল পড়িয়া গেল। আমাদের নাড়ীও তাহাদের এক এক দলের আবির্ভাব ও অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর

চঞ্চল হইয়া হৃৎপিণ্ডে ধাক্কা দিতে লাগিল। পনের কি বিশ মিনিট অন্তর নূতন লোক যাইতে লাগিল ও পূর্ব্ব দলগুলি ঘর্ম্মাক্ত হইয়া ফিরিতে লাগিল। কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাওয়া যায় না। অনুমানে ও কাণাঘুষায় বোঝা গেল জাহাজে আগুন লাগিয়াছে।

আবার ওদিকে জাহাজের গাত্রসংলগ্ন বা প্রলম্বিত ছোট ছোট জলিবোট্গুলির উপর দাঁড়ি-মাঝিয়া গিয়া যথাস্থানে বসিয়াছে—আদেশ মাত্র বোট্-সমেত অকূলে ঝাঁপ দিবার জন্য প্রস্তুত। জলিবোট্গুলি উপরেই থাকে কিন্তু এমন অবস্থায় আছে যে, আবশ্যক মাত্র যথাসম্ভব আরোহিসহ জল-লগ্ন হইতে মুহূর্ত্ত বিলম্বও হয় না। দেখিয়া শুনিয়া মন আড়ষ্ট ও প্রাণ অধীর হইয়া উঠিল। এতক্ষণ অন্তরের মধ্যে অনেকেরই অনেক বোল্ বাজিয়া উঠিতেছিল; এইবার মনে হইতে লাগিল "ওগো বাবাগো" বলিয়া একটা বিকট চীৎকার বুঝি আর চাপা থাকে না! এমন সময় আবার ঘণ্টা বাজিল। সঙ্গে সঙ্গেই সেই সব "ফায়ার্ ব্রিগেডের" ফৌজ তোড়জোড় সহ নীরবে ও ধীর-পদক্ষেপে স্বেদ-সিক্ত শরীরে ফিরিল। বিজয়ের হৈ চৈ শব্দটা না থাকায় হৃদয়ে সান্ত্বনা আসিল না, সে অধিকতর জিজ্ঞাসু হইয়া উঠিল। দেখি চিফ্ সাহেব দুই হাত নাড়িয়া দুই দিকের লোকদের—"বস্—হোগিয়া, আব্ যাও" বলিতে বলিতে খালিপায়ে দ্রুত চলিয়াছেন।

দুর্গা,—ধড়ে প্রাণ আসিল; আসন্ন ও জীবন্ত অগ্নি-সংস্কারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলাম। নিম্নে জলরাশি, উপরে অগ্নিদেব—এই ধূপ্ ছায়া মৃত্যুর সৌন্দর্য্য থাকিলেও কাহারও তাহা প্রার্থনীয় ছিল না। ব্যাপারটি পুরা একটি ঘণ্টা স্থায়ী হইয়াছিল; সেই এক ঘণ্টা কাল যূপকাষ্ঠে বাঁধা উৎসর্গকরা জীবের মতই কাটাইতে হইয়াছিল। প্রাতঃকৃত্যাদি কাহারও আর স্মরণ ছিল না। রেহাই পাইয়া সকলেই অপার-ডেকের হাওয়ায়

গিয়া হাঁপ ছাড়িল। আমি সঙ্গীদের সন্ধানে ছুটিলাম—বিশেষ করিয়া চাটুয্যের; কারণ সে অত্যধিক নার্ভাস্। গিয়া দেখি—মহাপুরুষের নাক ডাকিতেছে—তখনও নিদ্রা ভাঙ্গে নাই! ভাবিলাম ভালই হইয়াছে নচেৎ আজ একটা বিষম উৎপাত উপস্থিত হইত—তাহাকে কেহই নীরব ও স্থির রাখিতে পারিত না। সত্য বলিতে কি—আগাগোড়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া এরূপ অগ্নি-পরীক্ষা দিবার সামর্থ্য কাহারই বা ছিল!

পরে অপার-ডেকে গিয়া যাহা শুনিলাম তাহাতে এত বড় ঘটনাটা একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। মনটাও অজ্ঞতার অপমানে ছোট হইয়া পড়িল এবং এত বড় বিপদটার বর্ণনার উৎসাহটা মাটি হইয়া গেল। শুনিলাম, জাহাজে সত্য সত্যই আগুন লাগে নাই। ভাবী বিপদের প্রতিকার-কল্পে মধ্যে মধ্যে এইরূপ Practice (অভিনয় দ্বারা অভ্যাস) ও উৎসাহ, সজাগ ও 'সড়গড়' রাখিতে হয়। ও হরি! এই মিছে কাজের জন্যে এত মাথাব্যথা, আর লোকের জান্-হায়রান্! বিস্ময়ে ও বিরক্তিতে বিমূঢ় বনিয়া গেলাম। এদের বুদ্ধি দিতে কি বাংলা দেশের একটিও বিজ্ঞ জোটেননি?

মজুমদার বসিয়া বসিয়া প্যাল্‌পিটেশন্ সামলাইতেছিল; পঞ্চানন পেট টিপিতে টিপিতে আসিয়া বলিল,—"অত বড় পোষা পীলেটার পাত্তাই পাচ্ছিনা মশাই, একদম শুকিয়ে গেছে।" ট্রিগ্‌নোমেট্রি-দত্তের সংবাদ লইতে যাইতেছি, দেখি ফলোয়ার বা মজুর-মহলে হাসির মহা ধুম্ পড়িয়া গিয়াছে। তাহার কারণটা যাহা পাইলাম, তাহাতেই আমার অনুসন্ধান-স্পৃহা মিটিয়া গেল। দত্ত মহাশয়ের দাড়ি ছিল, তিনি সেই বিপদের সময় একটি "লাইফ্‌বয়া" ঘেঁশিয়া, হাঁটু গাড়িয়া, ঊর্দ্ধনেত্রে ও যুক্তকরে বসিয়া, ইংরাজিতে প্রেয়ার্ শুরু করিয়াছিলেন, ও তাঁহার দাড়ি বহিয়া অশ্রু অনবরত টোপাইয়াছিল। এটা ঠিক্ যে, কি হিন্দু কি

মুসলমান সে সময় সকলেই ব্যাকুলভাবে ভগবানের কাছে প্রাণের জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিল। শ্রুত ছিলাম—ভয়ে ও বিপদে মাতৃ-ভাষাই মুখে আসা স্বাভাবিক; কিন্তু দত্তজা সকল বিষয়েই একটু অস্বাভাবিকতা রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাই, ফলোয়ারেরা, সেই অনুকরণে মাথা নাড়িয়া—"ও লাট্—ও লাট্" (oh lord) বলিয়া অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।

বোসজা মহাশয় বুদ্ধিমান্ লোক, তিনি স্বাস্থ্যরক্ষার সেরা সেরা উপদেশগুলি, কোন অবস্থাতেই অমান্য করিতেন না। এতটা কাণ্ড তিনি শৌচাগারেই সমাপ্ত করিয়া উঠিয়াছিলেন; স্নানান্তে চুল ফিরাইয়া ও পিত্ত-নাশের প্রতিকার-প্রথা রক্ষা করিয়া, উপরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন চা'য়ের কথায় সকলের চট্‌কা ভাঙ্গিল। মজুমদার বলিল,—"বেটারা নাড়ী দমিয়ে দিয়েছে, দু' কাপের কম আজ আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না।" সকলেই এ-কথাটি একবাক্যে সমর্থন করিল। 'চা'ও আসিল, এবং প্রত্যেকে তাহার দু'কাপ করিয়া পানান্তে, শরীরে ও মনে বলও আসিল।

আমার ইউরেসিয়ান বন্ধুটি দেখি, তাঁহাদের দলে খুব উত্তেজিত হইয়া বক্তৃতা করিতেছেন। মর্ম্মটা এই—যাহাদের দায়িত্বজ্ঞান আছে, এরূপ একটা আতঙ্ক-উৎপাদক-ব্যাপার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, নোটিস্ দিয়া সকলকে সেটা বুঝাইয়া রাখা তাহাদের উচিত ছিল না কি? সহসা এরূপ কাণ্ডটা নার্ভাস্ লোকের পক্ষে মারাত্মক নয় কি? ইত্যাদি। বুঝিলাম, সকলেই একই রোগাক্রান্ত হইয়াছিলাম; প্রাণের মায়াটা সকলেরই সমান।

পরে দেখা গেল, সপ্তাহের মধ্যে এরূপ অন্ততঃ দুইটি অভিনয় হইয়া থাকে;—কোনটিই "আনন্দ রহো" নহে। পূর্ব্বোক্তটি অগ্নিভয়ের

প্রতিকারকল্পে, অপরটি—হাইড্রোফোবিয়ার না হইলেও জলাতঙ্কের বটে। এটিরও বিধিব্যবস্থা মন্ত্র-তন্ত্র ঐ একইরূপ, কেবল যন্ত্রাদি স্বতন্ত্র। জাহাজের তলদেশ হঠাৎ যদি ফাটিয়া বা ফাঁসিয়া যায় তাহারই প্রতিকারকল্পে এটি অনুষ্ঠিত বা অভিনীত হইয়া থাকে। কথাটা যাহাদের জানা নাই, তাহারা সেই ছুটাছুটি, উৎকণ্ঠাজড়িত ব্যবস্থা ও তোড়জোড় দেখিয়া স্তম্ভিত ও ভয়-বিহ্বল হইয়া পড়ে। একবার ঠকিলেও, অভিনেতাদের দক্ষতা এতই নিখুঁৎ যে, ক্ষণেকের জন্য সকলকে চমকিত ও আত্মহারা করিয়া ফেলে ও ঘটনাটা সত্য বলিয়াই ধারণা হয়। পম্প্ ও যন্ত্রাদি ব্যতীত, পাট, চট, পুরাতন কাছির টুকরা ও ক্যাম্বিস্ এবং মুদ্‌গরই এ বিপদের পরিত্রাতা।

সেই অসীম অতলস্পর্শের মধ্যে উপস্থিত হইলে, বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্রতম ও নগণ্য বস্তুটির মূল্যও সমান হইয়া দাঁড়ায়, সেখানে ছোট বড়র প্রভেদ নাই; মহাশ্মশান বলিলে চলে। বিপদের সময় একটি ক্ষুদ্র স্ক্রুর অভাব ঘটিলে ও সেইটির উপর জাহাজখানির শুভাশুভ নির্ভর করিলে, সমগ্র ইঞ্জিন ও শত শত আরোহীদের প্রাণবিনিময়েও তাহা যদি পূরণ না হয়, তাহা হইলে সেই সামান্য সামগ্রীটির মূল্যটা যে কত, তাহা অনুমানের বস্তু। সুতরাং, এই অগ্নিগর্ভ জাহাজের কোন্ কথাটাই বা বলিব, ইহার সবটাই বিস্ময়কর। ইঞ্জিন-ঘরের অগ্নিকাণ্ড ও সেই লোহার অসুরের খেলা দেখিলে, ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। তাহারাই জাহাজকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে, আবার তাহারাই নিমেষে তাহাকে ভস্মে পরিণত করিতে পারে। সেই দুর্ঘটনা হইতে রক্ষার কত না ব্যবস্থা! আবার উপরে মহামহীরুহ সদৃশ মাস্তুল জটায়ুর ন্যায় পক্ষ বিস্তার করতঃ বায়ুকে কুক্ষিগত করিয়া, সশব্দে সর সর বলিতে বলিতে চলিয়াছে। কিন্তু এই প্রায় দেড়শত মণের

মৈনাকটি, মাত্র চার পাঁচটি মাল্লার সাহায্যে যখন নিঃশব্দে মস্তক নত করিয়া শুইয়া পড়ে বা মস্তকোন্নত করিয়া দাঁড়ায়, তখন ম্যাজিক্ দেখিতেছি বলিয়া ভ্রম হয়। যাহা কিছু অসম্ভব, এই টুকুর মধ্যে তাহাদের যেন সম্ভব করিয়া দেখান হইয়াছে।

—৮—

আমাদের "ক্লাইভ" জাহাজখানি সরকারী জাহাজ। তাহা প্রধানতঃ সামরিক কার্য্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সৈন্যাদি ও সৈন্য-সংক্রান্ত দ্রব্যাদি বহন করাই তাহার প্রধান কাজ; আবশ্যক হইলে গোলা বর্ষণ করিতেও প্রস্তুত। ইহাতে পি-এন-ও প্রভৃতি কোম্পানীর জাহাজগুলির মত বাসব-বাঞ্ছিত বিলাস-ব্যসনের বন্দোবস্তের ও সাজ-সজ্জার বাড়াবাড়ি ছিল না। ছিল মাত্র রাজোচিত "সেলুন" অর্থাৎ সর্ব্বাংশে সুসজ্জিত কক্ষ,—মায় ফুলের বাগান, লাইব্রেরী, ক্রীড়াভূমি, গির্জ্জাঘর, সবই সুবিন্যস্ত ও সুন্দর। মূল্যবান্ রেশমী বস্ত্রে গদি-আঁটা সোফা, চেয়ার, স্বর্ণ-শিল্প-শোভন টেবিল-আচ্ছাদন, কার্পেট আঁটা (ফ্লোর্) মেজে, সুদৃশ্য মূল্যবান পর্দ্দা, আয়না, আলমারী, ইলেকট্রিক্ আলো, ফ্যান্, সবই আমাদের হিসাবে রাজ-হর্ম্ম্যোচিত। ইহার মধ্যে পশুশালা, গোয়াল, গারদ, সবই পাইবেন; কিন্তু সৌখীন ধনী যাত্রীদের পক্ষে ইহা নাকি পর্য্যাপ্ত নহে, লড়ায়ে-সেনাপতিরা ও সৈন্যেরা কোন প্রকারে মাথা গুঁজিয়া গুজরান্ করেন!

ডেকগুলির কাঠের মেজে হইতে আরম্ভ করিয়া, দরজার খড়খড়ি রেলিং ও প্রত্যেক কল-কব্জাটি পর্য্যন্ত নিত্য নিয়মিত প্রাতে ধোয়া

মাজা ঘসা হইয়া থাকে; তাহাতে জাহাজখানি নূতন ও সুন্দর ত দেখায়-ই, তদ্ভিন্ন কোনরূপ ময়লা জমিতে না পাওয়ায়, পীড়াদি সহজে প্রবেশ-পথ পায় না। ফিনাইল্ ও সাবানের বেদরদ্ ব্যবহারও নিত্যই চলে। আমাদের অভ্যাসের উল্টা ব্যাপারগুলা দেখিয়া মনে হইত,—গরিবদের শাস্ত্রই স্বতন্ত্র। আমাদের হেঁসেলের—তেল কালি ময়লা-মাখা দুর্গন্ধযুক্ত আমিষ রন্ধনের কড়াখানি মৃতাশৌচ বা গ্রহণাদি ক্ষেত্রেই, একবার মাজা হইয়া থাকে। অথচ, সেই ম্যাক্‌বেথের ডাইনীদের (কলড্রন্) কটাহ-সদৃশ পাত্র-পক্ব ভোজ্যই আমরা নির্ব্বিকার চিত্তে নিত্য গ্রহণ করিয়া থাকি! কানপুর সহরে একজন বাঙ্গালীবাবু একটি বেণের বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন। তিনি নিত্য উপর-তালা ও নীচের-তালা ধোয়াইতেন। এই অপরাধে বাড়ীওলা তাঁহাকে নোটিস্ দিয়া বাড়ী ছাড়িতে বাধ্য করে। কারণ, নিত্য ধুইলে বাড়ী কয়দিন টিকিবে! ইহাকে সনাতন অভ্যাস-অনুবর্ত্তিতা বা অভাবে স্বভাব নষ্ট বা বুদ্ধির বাড়াবাড়ি বলিব, তাহা ঠিক্ করিতে পারি না।

জাহাজে উঠিয়া পর্য্যন্ত সারা দিনের মধ্যে আমার একটু একান্ত হইবার অবকাশ ছিল না। বোসজা ও মজুমদার ভায়া আমার বিরহটা একদম্ সহিতে পারিতেন না। পঞ্চানন প্রায় পাছু-পাছুই ফিরিত; না হয়—"শুনেছেন মশাই" কি "দেখেছেন মশাই" বলিয়া, একটা না একটা কিছু লইয়া, দণ্ডে দণ্ডে হাজির হইত। তদ্ভিন্ন চাটুয্যের সুখ-দুঃখের কথা, মনোনিবেশপূর্ব্বক সম্যক্ সহানুভূতির সহিত নিত্য শোনাটা আমার অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। একটা দিনের একটি মাত্র কথার উল্লেখ করিলেই সকলে তাঁহার সুখ-দুঃখের কথার স্বরূপ সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারিবেন। একদিন দেখি, চাটুয্যে খুবই বিমর্ষভাবে রগ্ টিপিয়া বসিয়া আছে, চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত।

কারণ জিজ্ঞাসা করায়, অধর ঈষৎ বক্র হইল, চাটুয্যে একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। আমি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—হঠাৎ কি হইল, ব্যাপারটা কি? চাটুয্যে মোটা নাকি সুরে বল্লে, "ভোরে স্বপ্ন দেখলুম্—টেঁপি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাবা বাবা ক'রে কাঁদচে।" কি বিপদ! আমি জানিতাম,—টেঁপি তার চার নম্বরের মেয়ে এবং দেখিতে বজায় তাহারই অনুরূপ (বা দ্বিতীয় মূর্ত্তি) হওয়ায়, তার ভালবাসাটা তাহার প্রতিই সমধিক ছিল। তাহার এই 'ফ্যাক্‌সিমলিটি'র জন্য দুর্ভাবনাটা আমাকে কিন্তু তখন বিচলিতই করিয়াছিল। যাহা হউক, আমি বলিলাম, "তুমি তাকে বেশী ভাব ব'লেই স্বপ্ন দেখেছ, তাতে হয়েছে কি! স্বপ্ন কি আর সত্য হয়!" চাটুয্যে পূর্ব্ববৎ থাকিয়াই বলিল, "ভোরের-স্বপ্ন যে বাঁড়ুয্যে মশাই!" বলিলাম, "আচ্ছা তাই যদি হয় ত: তাতে এতটা ব্যাকুল হবার কি আছে, টেঁপি তোমার খুব 'ন্যাওটো,' তোমার তরে তার কাঁদাটা ত খুবই স্বাভাবিক।" চাটুয্যে এবার একটু নাদ ও খাদ মিশ্রিত সিক্তস্বরে বলিল,—"সে তবে পথে দাঁড়িয়ে কাঁদলে কেন?" কি ফ্যাসাদ্! বড়ই মুস্কিলে পড়িলাম, ওপথে সুবিধা হইল না। বলিলাম,—"যদি স্বপ্নে বিশ্বাসই কর ত ভাবনা কি; ও বিষয়ে শাস্ত্র যা বলেন তা মানতেই হবে, আর ও সম্বন্ধে 'খনাম্বুধির' চেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থও আর নেই! স্বপ্নাধিকারে খনা স্বয়ং বল্‌চেন :—

হাসির চেয়ে কান্না ভাল—কাঁদলে পথে ঘাটে,
স্বপ্নের সেরা শোণিত দেখা—সামনে যদি কাটে।

এত' মেয়েরাও জানেন; তুমি যেটা ভেবে ব্যাকুল হচ্চ, সেটা সম্পূর্ণ সুস্বপ্ন; যাকে তাকে বোলোনা, তিন কাণ করতে নেই, নিষেধ আছে। অদৃষ্ট প্রসন্ন না হ'লে,—ও সব দেখা প্রায়ই ঘটে না;—

সাহেবের খিঁচুনি, আর পাওনাদারদের তাগাদার বিকটমূর্ত্তিই এসে হাজির হয়।"

"ঠিক্ বলেচেন মশাই, এক একদিন আঁৎকে উঠি," বলিয়া চাটুয্যে একদম্ চাঙ্গা হইয়া হাসিয়া ফেলিল, পূর্ব্ব ভাবটা একেবারেই কাটিয়া গেল। আমি বাঁচিলাম, কোথাকার জল কোথায় আসিয়া মরিল! তাহাকে লইয়া চা খাইতে গেলাম। সাধারণ সুখ-দুঃখের কথা ছাড়া, এইরূপ অসাধারণ ফ্যাঁসাদও মধ্যে মধ্যে লাগিয়া থাকিত।

"দত্ত" আমার পূর্ব্ব-পরিচিত; এক ক্ষেত্রে কলিকাতায় কাজ করিয়াছিলাম। আমার উপর তাঁহার একটু (good opinion) ভাল ধারণা থাকায়, বড়ই বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। তাঁহার নিকট কিছুক্ষণ কাটাইতেই হইত, ও বড় বড় উপদেশ-বাণী, অসামান্য আলোচনা এবং সুগভীর তত্ত্ব সকল হজম করিতে হইত; নচেৎ তাঁহার অভিমানের পরিসীমা থাকিত না। ভারতের মানুষগুলার হাতগুলাকে পা'য়ের পর্য্যায়ে ফেলিয়াই তিনি দেখিতেন। তিনি পাক্কা পেসিমিস্ট ও সিনিক্ ভাবাপন্ন হইলেও তাঁহার আদর্শ খুবই উচ্চ ছিল। রাজা রামমোহন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ এবং জস্টিস রাণাডে ও চন্দ্রভার্কার ভিন্ন তাঁহার মুখে কাহারও সুখ্যাতি শুনিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। তবে, সাহেবদের রীতি-নীতি ও কার্য্য-কলাপের তিনি পরম পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার স্মরণশক্তি ও অধ্যবসায়, দুইটিই উল্লেখযোগ্য ছিল। কেরানিগিরি করিতে করিতে, ন্যূনাধিক ৪০ বৎসর বয়সে তিনি ফার্স্ট্ আর্ট্স্ পরীক্ষা দিয়া সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হন। এইরূপ প্রকৃতির লোকেরা প্রায়ই সাধারণ-ঘেঁসা হন না ও সাধারণের অনেক উপরে নিজেরাই নিজেদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া রাখেন। তাই, সাধারণেও সেই অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের আঘাতটা

তাচ্ছিল্যের দ্বারাই পরিশোধ করিয়া, তাঁহাদের মতটাকে ও মেজাজটাকে আরো তিক্ত করিয়া তোলে। ফলে, তাঁহারা ঠিক্ সামাজিক লোক হইতে পারেন না। অভ্যাস বশতঃই হউক, বা অধিকারবোধেই হউক, অথবা যে কারণেই হউক—কোন বিষয়ে কিছু বলিতে গিয়া, তাঁহারা এতবার ও এত অধিক "আমি" ও "আমার" শব্দ দুইটি ব্যবহার করেন, এবং "আমি" ও "আমার" কথা বা উদাহরণ আনিয়া ফেলেন যে, তাহা সাধারণের উপভোগ্য ত হয়ই না, বরং তাহা আত্ম-মহিমা-প্রকাশেই পরিণত হইয়া পড়ে। দত্তর গুণাংশই অধিক ছিল, এবং আমি তাঁহার গুণগুলির খুবই পক্ষপাতি ছিলাম। কিন্তু তাঁহার ঐ "আমি" আর "আমার" ভাল প্রসঙ্গগুলিকেও পীড়াদায়ক করিয়া তুলিত। যাহা হউক সকাল হইতে রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত আমার একান্ত হইবার অবসর ছিল না। এরূপ ঘটিবার প্রধান কারণ,—আমি সকলের সকল কথারই খুব সহিষ্ণু শ্রোতা ছিলাম। তাঁহারা আমাকে বক্তার অপবাদ দিলেও, সত্য কথাটা ঐ।

আকাশ পর্ব্বত সমুদ্র ও জনশূন্য গভীর অরণ্য না দেখিলে, হৃদয় প্রশস্ত ও উদার হয় না এবং বিশ্বস্রষ্টার আভাসমাত্রও তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয় না, এইরূপ ধারণাটা বরাবরই ছিল। এতদিনে ভাগ্যে যদি সমুদ্র দর্শন ঘটিল তাহা উপভোগের অবসর ঘটিয়া উঠে না। তাই রাত্রি ১১ টার পর আমাকে সময় করিয়া লইতে হইত। তখন আমি নিশ্চিন্ত মনে জাহাজের সম্মুখ সীমায় গিয়া বসিতাম। সে অনাবিল বায়ুস্পর্শে শরীর-মন যেন নিষ্কলুষ হইয়া যাইত। সে সীমাহারা বিশাল বিস্তৃতির মহান্ মহিমা না বুঝিলেও হৃদয়-মন কি এক অজানা ভাবে ভরিয়া উঠিত, মস্তক আপনা আপনি অবনত হইয়া পড়িত, গভীর শ্রদ্ধার সহিত বারবার নমস্কার করিতাম, পরক্ষণেই সহসা যেন লক্ষ লক্ষ

ভেরীমুখে বিশ্ববীণা বাজিয়া উঠিত, সচকিত করিয়া দিত। এই অনাদি শব্দকর্ম্মশালা হইতে, শব্দ সুর তাল লয়, দিকে দিকে দেশে দেশে নব নব শব্দ ভাষা সঙ্গীত লইয়া ছুটিয়াছে। মানব জীবজন্তু বিহঙ্গ, তাহা নিজ নিজ নির্বাচন ও প্রকৃতি অনুসারে গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে। কি অশ্রান্ত সৃষ্টি, কি অনন্ত সঙ্গীত, কি আনন্দ-তাণ্ডব! থাক্, ক্রমে কবির অধিকারে আসিয়া পড়িতেছি। যাহার সীমা নাই, সসীম মানবের কি সাধ্য যে, তাহার স্বল্প আভাসকেও ভাষা দিতে পারে।

সকল দিন (রাত্রি বলাই উচিত) মনের ভাব সমান থাকিত না। কোন কোন দিন নক্রের খেলা দেখিয়াই সময় কাটিত। তাহারা দলে দলে জাহাজের সম্মুখ ঘেঁসিয়া, এমন বেগে সাঁতার দিত, যেন কোন ক্রমেই জাহাজকে তাহাদের অগ্রে যাইতে দিবে না। জগতে কেহই পরাভব স্বীকার করিতে চায় না। বঙ্গোপসাগরে কোন কোন দিন অবাক্ হইয়া দেখিতাম—সাগর-বক্ষে যোজনব্যাপী অনল-প্রবাহ ছুটিয়াছে; উর্ম্মি-চূড়াগুলি প্রদীপ্ত স্বর্ণ-মুকুট-মণ্ডিত। এখানকার জলে ফস্‌ফরসের অংশ এত অধিক যে, সামান্য সংস্পর্শে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে। একদিন জাহাজের চার ইঞ্চি মোটা, তিন-চার রশি লম্বা লোহার চেন আর অতিকায় নঙ্গরটি দেখিয়া কত কথাই ভাবিলাম। আমাদের ব্রজের বলিষ্ঠ বলরাম ঠাকুর সে "হল্" বহন করিতে বোধ হয় বিশেষ বেগ পাইতেন। সূতা ও বঁড়শীর মত তাহাদের বিনা আয়াসে জলে ফেলিতে ও তুলিতে দেখিয়া বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া ভাবিতাম, —বচনকে বিদায় দিয়া, এখনও কিছুকাল হাতে-কলমে শিক্ষা পাইলে, দেশের কথা মুখে আনিবার উপযুক্ত হইতে পারিব। হতাশের একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস পড়িত।

—৯—

আগামী কল্য হংকং পৌঁছিবার কথা, অতএব সকলে দিনে দিনেই পত্রাদি লেখাটা সারিয়া রাখিলেন। মর্ম্ম সেই একই,—অর্থাৎ "এখনও বাঁচিয়া আছি" এবং বিরহের যার যতটা বহর। আর, বর্ণনার মধ্যে—জল বায়ু আকাশ ও মেঘ। তাহাতে অতিরঞ্জন বা মিথ্যা আড়ম্বর স্পর্শ করিবার আশঙ্কা মাত্র ছিল না; কারণ, যিনি যতবড় বিশেষণে তাহাদের বিভূষিত করিবার চেষ্টা করুন না কেন, ভাষায় তাহা কুলাইবে না। শুনিয়াছিলাম একটি সাদাসিদে ব্রাহ্মণ-কুমার আর আর পাঁচ জনের অন্যতম হইয়া গ্রামান্তরে 'কনে' দেখিতে যান। ফিরিয়া আসিলে সকলে তাঁহার মতটাই বিশেষ করিয়া শুনিতে চান, —"কেমন দেখলেন, সুন্দরী কি না?" ইত্যাদি। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলাম, "সে আর কি বোল্‌ব,—এই এত্তোবড় খোঁপা!" এই বলিয়া দুই হস্তদ্বারা একটি আদমুণি ধামার আকৃতির আভাস দিয়াছিলেন মাত্র; অর্থাৎ বাকিটা যাহার বুদ্ধি আছে বুঝিয়া লও। এখানেও সেই এক কথা—"কি আর বোল্‌ব।"

প্রভাত হইতে প্রথমেই পক্ষীরা তীরভূমির অগ্রদূত সম দেখা দিল। তাহারা উড়িয়া উড়িয়া সেই ভীষণ তরঙ্গোপরি গিয়া বসিতেছে এবং আনন্দে দোল খাইতে খাইতে বহুদূর ভাসিয়া চলিয়াছে। জেলেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় পাল তুলিয়া, তীর হইতে তিন চার মাইল দূর পর্য্যন্ত মাছ ধরিতে আসিয়াছে। যেখানে জাহাজে থাকিয়াও নিরাপদ বলা চলে না, সেখানে জেলে-ডিঙ্গির গতিবিধি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ভাবিলাম,—ধন্য অন্নচিন্তা, তুমি করাইতে পার না এমন কিছুই নাই। পরে, পর্ব্বত, জাহাজ ও উপকূল দেখা দিতে লাগিল।

আমাদের জাহাজের গতিও মন্থর হইয়া আসিল। ক্রমে গৃহাদি সমাচ্ছন্ন একটি পর্ব্বত দেখা গেল; সকলে আনন্দে বলিলেন—"উহাই হংকং"। বাস্তবিক তাহাই বটে।

এখানে জাহাজ লঞ্চ বোট ও ডিঙ্গী ব্যতীত রণতরীর কিছু বাহুল্য দেখিলাম। তাহারা বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন চিহ্নাঙ্কিত পতাকায়, ইংরাজ, মার্কিন, জার্ম্মান, ফরাসী, রুশ, জাপান প্রভৃতি শক্তির পরিচয় দিতেছে। বিবিধ আকার প্রকারের জাহাজ ও লঞ্চ, বন্দরটি ব্যাপিয়া রহিয়াছে। যেন, তৎসংলগ্নেই সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা সকল মাথা তুলিয়া একের গায়ে অপরটি ক্রমোচ্চভাবে, ঊর্দ্ধপথ অবলম্বন করিয়া আকাশ স্পর্শ করিয়াছে; এবং বিবিধ বর্ণে, আকারে ও সজ্জায়—হংকংকে সমুদ্রবক্ষে একখানি রথ করিয়া রাখিয়াছে। ইহার ঠিক বিপরীতে, বন্দরটির অপর তীরে, ইংরাজ সেনানিবাস বা কেণ্টন্‌মেণ্ট্। বলা বাহুল্য যে, হংকং সহরটি ইংরাজ-অধিকৃত।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও পড়িতেছিল; বেলা আন্দাজ আটটার সময়, আমাদের জাহাজ হংকং বন্দরে নঙ্গর করিল। আমরাও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সকলেই হংকং দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। এবার আরোহিমাত্রেই "ছাড়" পাইল, কারণ জাহাজ আজ দিবারাত্র এইখানেই থাকিবে, গতকল্য প্রাতে গন্তব্য পথ লইবে।

—১০—

জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিবার সঙ্গেই সঙ্গেই দশ বারখানি ডিঙ্গি সঙ্গ লইয়াছিল। সেগুলি ব্যবসায়ীদের নৌকা, বন্দর-সমাগত প্রত্যেক জাহাজেই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া বেড়ায়।

কোনখানি নানাবিধ ফল-ফুলে পূর্ণ; কেহ শাক-সব্জী আনিয়াছে; কোনখানিতে মৎস্য মাংস ও ডিম্ব আছে; কেহ বা মদ, বিয়ার, সোডা-লিমনেড, সিগারেট, চুরট, দেশালাই বিক্রয় করে, কোনখানি সর্ব্ববিধ মনোহারী দ্রব্য লইয়া উপস্থিত; কেহ কাপড় জামা কোট প্যাণ্ট্ মোজা রুমাল টুপি ছড়ি আনিয়াছে; ইত্যাদি। একখানি হইতে সহসা চার পাঁচটি সহাস্য-বদনা চীনা রমণী বাহির হইয়া বিদ্যুদ্বেগে জাহাজের সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া, একদম উপর-ডেকে আসিয়া উপস্থিত। একবার চারিদিকে কটাক্ষ করিয়া হাসিতে হাসিতে আরোহী সাহেবদের এবং জাহাজী সাহেবদের কেবিনে গিয়া প্রবেশ করিল। তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি ও অপ্রতিহত গতি এবং হাস্যবিজড়িত অবহেলার ভাব দৃষ্টে, বাঙ্গালী আরোহীরা সম্ভবতঃ ভাবিয়াছিলেন,—ইহারাই আমাদের দত্তজা মহাশয়ের প্রমীলার সহচরী হইবে। মোগল-আস্তিন চ্যায়না-কোটের উপর পৃষ্ঠদেশে প্রলম্বিত বেণী, পরিধানে ঢিলে পাজামা, পায়ে মোজা ও জুতা, হস্তে সুদর্শন চক্রবৎ পাখা;—আর, ভাব ভঙ্গীতে—

"অধরে ধরিলো মধু, গরল লোচনে,
আমরা দানবী।"

যাহা হউক, তাহারা যেন তাহাদের পরিচিত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল; দর্শকেরা অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পঞ্চাননের দাঁত দু'পাটি যেন দাঁত-তোলা শাঁড়াসীর মত হাঁ করিয়া কিছু একটা ধরিতে ছুটিল। কিছুক্ষণ পরে দেখি রমণী কয়টি প্রত্যেকেই তোয়ালেতে বাঁধা এক একটি পুঁটুলী হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে কেবিন হইতে বাহির হইল, ও আমাদের সম্মুখ দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। চাটুয্যে একটু দূরে বসিয়াছিল, তাহার সম্মুখীন হইতেই সে একটু ঝুঁকিয়া সেলাম করিল;—কিছুই বুঝিলাম না।

অনুসন্ধিৎসু পঞ্চানন ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—"মশাই, এই যেমন চীনের পুতুল, চীনের শোর, চীনের বাদাম হয় না, তেমনি ঐ ক'বেটী চীনের ধোপানী! শুনলাম সব জাহাজেই ওদের অবাধ-গতি; সাহেবেরা ঢালা হুকুম দিয়ে রেখেছে ওদের যেন কেউ না রোখে। ওরা একদিনেই কাপড় কেচে এনে দেয়, সাহেবেরা ওদের তাই খুব পছন্দ করে।" পঞ্চানন এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া ফেলিল। তাহার কথা সাঙ্গ হইতেই মজুমদার ভায়া বলিয়া উঠিল—"সত্যি ধোপানী নাকি? এই মরেচে দেখচি!" পঞ্চানন বলিল,—"কেন, কি হয়েছে মশাই?" চাটুয্যেকে একবার ডেকে আন ত পাঁচু" বলিয়া মজুমদার হাসিতে লাগিল। পঞ্চানন তাহাকে ডাকিয়া দিয়া সরিয়া গেল। চাটুয্যে আসিতেই মজুমদার গম্ভীরভাবে বলিল—"ঐ চীনে মেয়েমানুষ ক'টিকে চেন নাকি,—রেঙ্গুনে ছিলেন বুঝি, ওঁরা কে?" চাটুয্যে বলিল—"জানেন না! হংকং-এর চীনে লাটের মেয়ে, জাহাজে বেড়াতে এসেছিলেন, কি রূপ দেখছেন?" মজুমদার আর গাম্ভীর্য্য রক্ষা পারিল না, কারণ ঠিক সেই সময় বোসজা না হাসিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরিয়া অনুচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"পুতে ফ্যালো,—পুতে ফ্যালো!" মজুমদার অতি কষ্টে উচ্চ হাস্য সম্বরণ করিয়া ইন্‌টারমিডিয়েট্ হাস্যের মধ্যে বলিল, "সে কি? আমরা শুনলুম ওঁরা মালপাড়ার পুরুভুজ গোস্বামীর বংশ, তুমি প্রণাম না ক'রে সেলাম করলে দেখে অবাক্ হয়েছি, তাই তাঁরাও বোধ হয় পায়ের ধূলো দিতে দাঁড়ালেন না।" চাটুয্যে সত্যই একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল,—"বটে? তা আমি—" বোসজা আর থাকিতে না পারিয়া বলেন—"তুমি একটি ব্রহ্মদেশের ব্রহ্মদত্যি! ধোপানীগুলোকে সাত-তাড়াতাড়ি সেলাম করা হল যে বড়?" "সত্যি নাকি বড়বাবু,—আপনি বলেন কি, তবে যে পাঁচু বল্লে

—চীনে লাটের মেয়ে, জাহাজ দেখতে এসেছে,—ভাল করে সেলাম কোরো, তানা ত ভারতবাসীদের অসভ্য ঠাওরাবে।” —“না বড়বাবু, আপনি ঠাট্টা করচেন, ধোপানী অমন হয়? আর তা হলে আমাদের কাপড়গুলো চাইত না?” বোসজা বলিলেন—“চাইত বই কি; চায়নি এই ভাগ্যি, চাইলে আর আমাদের এগুতে হত না, এইখানেই জেলে পুরতো। বোল্‌ত,—কাপড়ে রাজ্জির সংক্রামক রোগের বীজ বিজ্‌ বিজ্‌ করচে, এরা সেই সব ছড়াতে এদেশে এসেছে। চীনে রাজ্যের যে রকম কড়া আইন, জীবাণুর জড মারবার জন্যে চাইকি আমাদের শুদ্ধু খাড়া পুঁতে ফেল্‌ত!” শুনিয়া চাটুয্যের মুখ ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল; “পেঁচোটা কি সর্ব্বনেশে ছেলে, ও-পাপ কি ক’রে যাবে বড়বাবু, ও ত এখন সঙ্গেই চোল্‌ল। আর দেশও কি বিট্‌কেল মশাই—ধোপানীও যেন রাজপুত্তুর, কি করে চিন্‌বো বলুন। এই নাকে কাণে খৎ, ধোপানী ত ধোপানী, আর মেথরাণী এলেও সেলাম করবো না।” কথাটা ভাবের মুখে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহা নিজের প্রাপ্য আদায় না করিয়া ছাড়িল না, সকলে হো হো করিয়া একটু দীর্ঘছন্দে হাসিয়া বাঁচিল; চাটুয্যে হাসির মূল কারণটায় লক্ষ্যই রাখে নাই। কি ভাবিয়া জানি না, চাটুয্যে হঠাৎ বলিল—“তা হলে সে বেটীদেরও ত উচিত ছিল আমাকে প্রণাম করা।” মজুমদার বলিল—“তাদের দোষ দিতে পারি না,—তোমার উচিত সর্ব্বক্ষণ কাণে পইতে দিয়ে থাকা তানা ত লোকে ব্রাহ্মণ বলে চিনবে কি ক’রে, (এবং একটু অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল—চেহারা দেখে মানুষ বলেই বোধ হয় ভাবতে পারেনি) যা হক তুমি একবার নেয়ে ফ্যাল, কাজটা অসামাজিক ত হয়েইছে, অশাস্ত্রীয়ও বটে।” চাটুয্যে অসহায়ভাবে আমার দিকে চাহিল; আমি অভয় দিয়া বলিলাম, “কেন শোনো

ওসব কথা ; এই ত চণ্ডীদাস 'রামী' রজকিনীকে পূজা পর্য্যন্ত করতেন।" সেলাম-সমস্যা এইখানেই শেষ হইয়া গেল।

যাহা হউক, কথাটা সত্যও বটে, দুঃখেরও বটে যে ভারতবর্ষীয় আরোহীদের দিকে তাহারা একবার দৃকপাতও করিল না। একবার ভাবিলও না যে, তাহাদেরও কাপড় থাকিতে পারে, এবং সে কাপড় মলিনতায় সাহেবদের কাপড়কে চিরদিনই পরাস্ত করিয়া আসিতেছে। বাস্তবিকই চাটুয্যে তাহার (সম্ভবত ফুলশয্যার) ফুলপেড়ে পরিয়া বসিয়াছিল ; ধপধপে ধোপানীরা চকচকে চুল নাড়া দিয়া চলিয়া গেল ; সেলাম সত্ত্বেও একবার সেদিকে তাকাইল না।

দেখিতে দেখিতে আকণ্ঠ কয়লা বোঝাই তিনখানি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বোট জাহাজের গাত্রসংলগ্ন ফ্ল্যাটে আসিয়া লাগিল। তাহারা জাহাজে কয়লা যোগাইতে আসিয়াছে। ফ্ল্যাটের উপর চল্লিশজন চীনে মজুর পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। আমাদের দেশের মুটে মজুরদের যেরূপ চিরপ্রথা আছে, এ অবস্থায় গুড়ুকের একটা গদিয়ান মহোৎসব, আলস্য-ভঞ্জন হাইতোলা এবং ধূমপানের সহিত গল্পের ধূম অনিবার্য্য। কিন্তু এখানে তাহার কিছুই দেখিলাম না। বোট লাগিতেই, মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া চীনে কুলীরা ফ্ল্যাটের উপর দুই সার দিয়া দাঁড়াইয়া গেল। এক সারের হাতেহাতে কয়লা বোঝাই টুকরিগুলি ক্রমান্বয়ে জাহাজের মধ্যে আসিয়া পড়িতে লাগিল, এবং অপর সারের হাতেহাতে খালি টুকরিগুলি বোটে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। প্রতি দশ ক্ষেপের পর এসারে ওসারে কাজ বদল হইতে লাগিল। কাজ যেন কলে চলিল! এইরূপ চক্রগতিতে কাজ হইতে লাগিল, ও ঘণ্টা চারেকের মধ্যে অত বড় বড় তিনখানি বোটের কয়লা সহজেই জাহাজে পৌঁছিয়া গেল। কাজের সময় কাহারও মুখে টুঁ শব্দটি শুনিলাম না। মুটে মজুরের কাজ যে এমন সুবিরামে ও

সুশৃঙ্খলে হইতে পারে, পূর্ব্বে সে দৃশ্য কখনও চক্ষে পড়ে নাই; কলিকাতার কয়লাঘাটে বা হাটখোলায় হৈ-চৈ হট্টগোলের হাটই দেখিয়াছি।

তাড়াতাড়ি কিঞ্চিৎ আহার সারিয়া নৌকাযোগে তীরে নামিলাম। ঔৎসুক্যের প্রধান কারণ যে চিঠি পোস্ট করা, তাহা বলাই বাহুল্য।

—১১—

হংকং পরিদর্শনটা পদব্রজে করিবারই পরামর্শ স্থির হইল,—পোস্ট আফিসের পথ ধরা গেল। হংকং-এর রাস্তাগুলি তেমন প্রশস্ত নহে, পাহাড়ের উপর সেটা সম্ভবও নহে; তবে পরিষ্কার, বড় রাস্তাগুলি দুইধারে ফুটপাথ দিয়া আঁটা। ঘোড়ার বা গরুর গাড়ির গোলমাল নাই, —রিক্সাই মানরক্ষা করিয়া থাকে। রাস্তার একদিকে ব্যাঙ্ক, পোস্টাপিস্, সওদাগরী অফিস্, হোটেল্ প্রভৃতি সাহেবী সৌষ্ঠবে শোভা পাইতেছে, অপর দিকে চীনাদের দোকান। সে-দিকটায় যেন কলিকাতার রাধাবাজার, চীনাবাজার, চাঁদনী ও মুরগীহাটার একীকরণ ঘটিয়াছে, কিন্তু পারিপাট্যে ও শিল্পসমাবেশে তাহাদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এটা পাহাড় হইলেও রামগিরি নয়, এখানে মেঘ থাকিলেও তাহারা দৌত্য করে না, সে ভার পোস্টাপিসের। ইহাদের উদরকে বিশ্বাস করিতে পারিলেই উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। পথের ধারে পোস্টাপিস্ পাইয়া নিজেদের পেটের কথা তাহারই পেটে নিশ্চিন্তে সমর্পণ করিয়া, ঝাড়া হাতপা হইয়া বাজারে প্রবেশ করা গেল।

হংকং-এর বাজারটি একটি প্রকাণ্ড পাকা ইমারৎ, দীর্ঘে প্রস্থে প্রায় দুই বিঘা জমি আত্মসাৎ করিয়াছে। চারিদিকে সু-উচ্চ গেট্,

মধ্যে তিনটি সুপ্রশস্ত বিভাগ। একটিতে কপি, আলু, বেগুন, মটরসুঁটি, শাকসব্জী; একটিতে বিবিধ ফলমূল, অপরটিতে পিঁয়াজ, রসুন, আদা, লঙ্কা, হলুদ প্রভৃতি মশলা,—সেই প্রকাণ্ড বিভাগগুলি পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। এরূপ বিচিত্র ফলমূলের সমাবেশ ও প্রাচুর্য্য কুত্রাপি দেখি নাই। বঙ্গদেশে ও কাবুলের পরিচিত ফলের মধ্যে বেল ও আতা দেখিলাম না। আঙ্গুর, আপেল, নাসপাতি, ডালিম, লিচু, আনারস, শশা, কলা, জলপাই, তরমুজ প্রভৃতির সৌন্দর্য্যে বাজারের রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। দেখি, এই সুদূর সমুদ্র-বক্ষে ক্ষুদ্র পাহাড়টিতে তরমুজগুলির মধ্যে আমাদের সাধের চাতুর্ব্বর্ণের বীজ রক্ষিত হইতেছে। টেবিলের উপর কাটা-তরমুজগুলি বিক্রয়ার্থ সাজান রহিয়াছে—তাহাদের কোনটির মধ্যে সাদা রং, কোনটির লাল, কোনটির পীত, কোনটির বর্ণ সবুজ। সুমিষ্ট গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের উপর মধুমক্ষিকার সানন্দ-গুঞ্জন মধুর মজলিস্ বসিয়াছে।

আমরা পাঁচ আনায় বড় বড় একশত লিচু খরিদ করিলাম। প্রাপ্ত মাত্রেণ আমাদের প্রিয় পঞ্চানন পরিচয় লইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল ও গালভরা কণ্ঠে বলিল—"মশাই, মজঃফরপুরকে মাৎ করেছে।"

ক্রেতাদের হস্তে মৎস্য মাংসাদি দেখিলাম, কিন্তু এত-বড় বাজারটির মধ্যে তাহাদের নাম-গন্ধও পাইলাম না! তখন অনুসন্ধানে জানিলাম —এই বাজারটির নিম্নতলে মৎস্য মাংসের বাজার। সোপান-পথে মেচোহাটায় প্রবেশ করা গেল। যে অংশে মেচোহাটা সেটি যেন সমুদ্র-গর্ভের সামিল। মাছের বাজারে মেয়ে-পুরুষের প্রবেশ ও প্রত্যাবর্ত্তনের ভিড় দেখিলে রথের ভিড়ও পাতলা হইয়া পড়ে। সহস্র কণ্ঠের বেতালা চীৎকারে চৌষট্টি যোগিনীর যোগ ভঙ্গ হয়। তবে মেছুনীদের মাকড়ি, নথ বা অনন্ত নাড়ার বিভীষিকা ছিল না, কারণ বিক্রেতারা পুরুষ-মানুষ।

তাহাদের সম্মুখে আবক্ষ-উচ্চ টেবিল; টেবিলের উপর তিন চারখানি ছোট বড় সুতীক্ষ্ণ ছোরা, এবং টেবিলের উপরই দাঁড়িপাল্লা আঁটা। নীচে বড় বড় টবে মৎস্য রহিয়াছে, কেবল বাছা বাছা দুই চারিটি মাছ টেবিলের উপর থাকিয়া ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। ছোরার সাহায্যে অতি সত্বর ও সহজে আঁস ছাড়ান, মাছ কোটা, কাঁটা বাছিয়া বাহির করিয়া ফেলিয়া দেওয়া,—দেখিলে অবাক হইতে হয়। খুব ছোট কাঁটাই কেবল থাকিয়া যাওয়া সম্ভব। মিব্‌গেল মাছটাই মানে ও মূল্যে বড় দেখিলাম; বোধ হইল, এ অঞ্চলে ঐ মাছটাই স্বাদু ও প্রিয়।

এই নিম্নতলের অপরার্দ্ধ নানাপ্রকারের মাংস, পক্ষী ও ডিম্বে পরিপূর্ণ। এখানকার গৃহস্থেরা বটে "মৃগমাংস পক্ষমাংস যেবা ইচ্ছা হয়" বলিয়া আগন্তুক অতিথিদের অনায়াসেই আপ্যায়িত করিতে পারেন। এক প্রান্তে দেয়ালের গণ্ডীর মধ্যে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কটাহে টগ্‌বগ্‌ করিয়া গরম জল ফুটিতেছে। জীবন্ত কুক্কুট, হংস, পারাবত প্রভৃতি পক্ষীর পা বাঁধিয়া তন্মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়। দু' এক মিনিট পরেই তাহাদের তুলিয়া লইয়া, অতি সহজে মুহূর্ত্ত মধ্যে উপরের পালকশুদ্ধ ছালখানি তুলিয়া ফেলিয়া, পাখীগুলি ক্রেতাদের হাতে দেওয়া হয়। অর্থাৎ—এক ফোঁটা রক্ত না বাজে নষ্ট হয়,—সমস্তটুকু যাহাতে ক্রেতাদের পেটে পৌঁছায়, আর যাহাতে সহজে পরিষ্কারভাবে ছালটি ছাড়ান হয়,—এই দুই কারণে এই বীভৎস কাণ্ডটা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এবং লজ্জার কথাও কম নহে যে, এমন সহজ উপায়টি—যাহা চীনাদের মগজে আসিয়াছে, রক্তবীজ বধের সময় তাহা দেবগুরু বৃহস্পতিরও বুদ্ধিতে আসে নাই।

কতকগুলি কারণে পানের প্রয়োজনটা বড়ই তীব্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহা ভাবিতেছেন তাহা নহে,—এই অকূল জলমগ্ন

রাজ্যে প্রাণ হাতে করিয়া, স্ফূর্ত্তির ফিন্‌কিটুকু পর্য্যন্ত কাহারও ছিল না। জাহাজে বমন-প্রবৃত্তিটা মধ্যে মধ্যে উদয় হইয়া একটা অস্বস্তি আনিয়া দেয়, তদ্ভিন্ন আজকাল গুড়ুক্ ও গল্পেই দিন গুজরান হইতেছিল ; এইরূপ ক্ষেত্রে পানটাই রসনার রঞ্জন্ স্বরূপ। তৃতীয়তঃ আমাদের মধ্যে দু'-একটি পানের পোকাও ছিলেন। যাহা হউক, একটি ফুট্‌পাথে দেখি, দুইটি চীনা পান বেচিতেছে। অতি লোলুপের ন্যায় তাহাদের নিকট উপস্থিত হওয়া গেল, এবং দরদস্তুর না করিয়াই এক ডজন পান সাজিয়া দিবার হুকুম দেওয়া হইল। তাহারা দুইটি তুলি বাহির করায়, পঞ্চানন বলিল,—"মশাই এরা তুলি বাগায় কেন, চেহারা তুলবে নাকি ?" মজুমদার ভায়া বলিলেন—চাটুয্যেকে একটু তফাৎ কর।" পরে দেখি, তুলির সাহায্যে পানে চুণ-খয়েরের প্রলেপ লাগাইয়া প্রত্যেক পানটিতে পরিষ্কারভাবে ছাড়ানো একটি করিয়া আস্ত সুপারী দিয়া সুন্দর খিলি করিয়া দিল। ভাবিলাম, এ খিলি চর্ব্বন করিতে হইলে দন্ত কয়টি আর চীন পর্য্যন্ত পৌঁছিবে না। কার্য্যকালে কিন্তু কোন কষ্টই অনুভব করিলাম না; এতই মোলায়েম যে, দন্তের নিকট তাহারা খুবই বিনীতভাবে আত্মসমর্পণ করিল, অথচ সুপারীগুলি কাঁচাও নহে ;—চীনের হুনুর বটে! উত্তর চীনে পান পাওয়া যাইবে না, সুতরাং উদ্‌যাপনের উপযোগী আয়োজন লওয়া হইল। প্রত্যেক পানটি এক পয়সা হিসাবেই পড়িল।

হংকং-এর শিখরদেশে উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারী, সওদাগর প্রভৃতি বড় লোকেরা বাংলা বানাইয়া বাস করিয়া থাকেন। ঐ স্থানটি স্বাস্থ্যকর, বিরলবসতি এবং সকল সময়েই ঠাণ্ডা। সহর হইতে তাহা অর্দ্ধাধিক মাইল উর্দ্ধে, এবং নিম্ন হইতে প্রায় সোজাই উঠিয়াছে ; অতি অল্পই ঢালু। সত্বর ও অনায়াসে শীর্ষদেশে পৌঁছিতে হইলে "পীক্-ট্রামে"

(peak-tram) যাওয়াই সুবিধাজনক। প্রতি দশ মিনিট অন্তর, প্রায় ৩০ জন আরোহী লইয়া, নিম্ন হইতে একখানি গাড়ি ঊর্দ্ধে উঠিতেছে এবং ঊর্দ্ধ হইতে একখানি গাড়ি নিম্নে নামিতেছে। পাহাড়ের গায়ে লাইন পাতা আছে এবং প্রধানতঃ তারের কাছির (wire rope) সাহায্যে, তাহাদের ঊর্দ্ধ ও অধোগতি পরিচালিত হইতেছে। দেখিলে বাস্তবিকই ভয় হয়। তাহাতে আবার Single line, অথচ দুইখানি গাড়িই একই সময়ে ছাড়ে। মধ্যপথে তাহাদের সাক্ষাৎ হয়, সেখানে একটু পাশ কাটাইবার পথ বা Sidingএর মত আছে; একখানিকে সেই Sidingএ ঢুকিয়া অপরখানিকে পথ ছাড়িয়া দিতে হয়।

আমার সহযাত্রীরা সম্ভবতঃ বিদায়কালে "রণে যেতে বাধা দিও না" বলিয়া গ্যালেণ্ট্রির গৌরব লইয়া বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই Peak-tramএর সাহায্যে শিখরদেশ দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। আমি তাঁহাদের সাহসের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তত্রাচ বলিলাম—"অভিযান-ব্যপদেশে উত্তর-চীনে চলিয়াছি, যদি মরিতেই হয় ত শুনিতে পাই রণে মরিলে স্বর্গ লাভের সম্ভাবনা আছে। এখানে মরিলে পাহাড় না হয় সমুদ্র লাভ ঘটাই সম্ভব, দেখ—যেটা সুবিধাজনক বোধ হয়!" ফল কথা, আমি বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, মনটাও ততোধিক অবসন্ন ছিল;—কারণটা বলাই ভাল।

একটা কথা আছে—'চেনা বামনের পৈতের দরকার নেই'। কথাটা বোধ হয় নিজের দেশে, স্বগ্রামে, বিশেষ করিয়া পরিচিত স্থলে কাজে লাগিতে বা সাহায্য করিতে পারে। সম্ভবতঃ আদ্য-শ্রাদ্ধের সংস্রবেই ইহার জন্ম,—যে ক্ষেত্রে ও যে সময়ে বঙ্গদেশে বিশখানা লুচি,

ষোলটা মোণ্ডা ও আধসের চিনি, ছোট-বড়-নির্ব্বিশেষে যজ্ঞোপবীত-ধারীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। যাহা হউক, উক্ত বচনটাই আমরা সুবিধামত পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও প্রয়োগ করিয়া থাকি। কথাটা কিন্তু সকল ক্ষেত্রে মানায় না—চলে না; যথা—কর্ম্মস্থলে, যুদ্ধস্থলে, দেশান্তরে সভায়, শ্বশুরালয়ে ইত্যাদি। ভারতের অপর সকল জাতিই, শরীর ও সম্মান যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া, নিজ নিজ স্বদেশী পোষাকে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে পারেন বলিয়াই মনে হয়। (অবশ্য উড়িষ্যাবাসী ও মান্দ্রাজের সকল শ্রেণীর কথা জানি না) কিন্তু বাঙ্গালীরা নিজেদের সনাতন ধুতি চাদর ও পিরান পরিয়া যে তাহা পারেন না, সেটা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। কেন বলা যায়—তাহা সময়ান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। আপাততঃ যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুই উল্লেখ করিলাম।

কলিকাতার বাসাড়ে চাকুরে বাবুদের শনিবারের পোষাকেই আমরা জাহাজে পদার্পণ করি, (মাইনাস্—চাদর ও মোজা) আর মাথায় চুল ও চিন্তা ছাড়া আমাদের ত কোন কালেই অন্য আবরণ নাই। কাহারও হুঁশ্ ছিলনা যে এই পোষাকটা জাহাজে বা দূর বিদেশে কতটা শোভন, সুবিধাজনক ও সচল হইবে। জাহাজে সহযাত্রীদের মধ্যে ছোটখাট কয়েকটি তথাকথিত সাহেবলোগ ভিন্ন, যুবরাজ সদৃশ মাতব্বর ও মেমলোগ না থাকায়, পোষাক সম্বন্ধে আমাদের কাহারও নজর পড়ে নাই; ধুতি ও গেঞ্জী বা ধুতি ও শার্টই আমাদের সাজসজ্জার চূড়ান্ত ছিল। ঠাণ্ডা বোধ হইলে জুট ফ্ল্যানালের সরকারী vestই chest রক্ষা করিত। তিন সপ্তাহ জাহাজী জুলুম সহ্য করিয়া, এক প্রকার আমাদের অলক্ষ্যেই তাহাদেরও অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। ফল কথা, পরিচ্ছদের মালিন্যে ও দৈন্যে, আমরাও বোধ হয় নিজেদের অজ্ঞাতে, ফলোয়ার (কুলি) শ্রেণীর

মধ্যেই পরিগণিত হইয়া পড়িতেছিলাম। জাহাজের কাপ্তেন্, চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার ও সহকারী ও শিক্ষানবিস খাঁটি কুলীন্ (European) কয়জনও তাহাই ঠাওরাইয়া থাকিবেন। কারণ, তাঁহাদের ত সে অধিকার বরাবরই আছে,—এ ক্ষেত্রে ত কথাই ছিল না।

বিষয়টা সিঙ্গাপুরে নিজেদের নজরে পড়ে নাই, কারণ সেখানে ঘোরাফেরাটা গাড়ীর সাহায্যেই সমাধা হইয়াছিল। কিন্তু হংকং সহরে পদব্রজে ভ্রমণকালে, কি ইংরাজ, কি পারসী, কি জাপানী, কি চীনা, কি গুজরাটী, কি পাঞ্জাবী, কি বোম্বাইওলা সকলকেই দেশকালোচিত সর্ব্বাঙ্গ-ঢাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশে পাইয়া, আমাদের দৈন্যটা জনসমাকুল রাজপথের মাঝখানেই উলঙ্গ হইয়া দেখা দিল। এই অভব্যতার ফলটাও কয়েক স্থানের আদর অভ্যর্থনা ও কথাবার্ত্তায় বেশ সুস্পষ্টই অনুভূত হইল;—

—গ্রামার-দুরস্ত বিশুদ্ধ ইংরাজি বুলিতে কেহ ভুলিল না,—আমোলও দিল না। সহ-সহচর আমাদের মোটা টাকা বেতনের বড়বাবু (বোসজা মশাই) বেওকুব বনিয়া ফিরিলেন। বাস্তবিক সে অসবর্ণের দেশে, আধময়লা ধুতি-পরা, শার্ট-গায়, মাথা-খোলা মানুষের কোন কদরই হওয়া সম্ভব নয়; সেটা ত আর কলিকাতার "কস্টম্ হাউস্" বা "জেটি" নয়। গত্যন্তরও ছিলনা, সব সময়টা অভ্যস্ত হাসিমুখে হজম করিয়া হংকং দেখা খতম করিতে হইল। কিন্তু আমাদের মধ্যে যাহার সামান্য মাত্রও আত্মসম্মানবোধটা সচেতন ছিল, তাঁহাকেই সারা পথটা অস্বাচ্ছন্দ্যেই সারিতে হইয়াছে। এই 'নড়েভোলার' মত পথে পথে ঘুরিতে পদে পদে লজ্জাবোধ হইয়াছে।

এমন অবস্থায় যখন বাবুদের Peak-tramএ চড়িয়া হংকং পাহাড়ের শিখরদেশ দেখিবার সখ চাপিল, তখন বোসজাকে বলিলাম

—"এর-ওপরেও 'উঁচু' যাবার ইচ্ছা করচেন,—আমি কিন্তু ন্যায্যটাই গ্রাহ্য করলুম,—আপনারা যান!" বোসজা সকল কথা সামান্য ইঙ্গিতেই বুঝিতেন, তিনি বলিলেন—"ঠিকই ঠাউরেচেন, এখন ভাবচি —একটায় ঠকেচি বলে, সকল বিষয়ে ঠকি কেন?—আর ঘটে না ঘটে।" এইখানেই ব্রাহ্মণ আর কায়স্থে তফাৎ, ব্রাহ্মণ চটেই মাটি করেন। মজুমদার-ভায়া চিরদিনই একটু সৌখিন্ মানুষ, তবে দলে ও জলে পড়িয়া স্রোতোধীন চলিয়াছিলেন, তাঁহাকেও লজ্জাটা হাড়ে-হাড়ে স্পর্শ করিয়াছিল, তিনি গম্ভীরভাবে চুপ করিয়াই রহিলেন, —একটি কথাও কহিলেন না। বুঝিলাম Peak দেখিবার প্রলোভনটা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা ট্রামে উঠিলেন, আমি নিয়ন্তা-নির্দ্দিষ্ট নসীব লইয়া নীচু পথ ধরিলাম। ইহাতে কেহ এমন মনে করিবেন না যে, আমার আত্মসম্মানবোধটা সর্ব্বাপেক্ষা উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল; সম্ভবতঃ শ্রান্তি ও আমার nervousnessই আমাকে বাধা দিয়া থাকিবে।

যাহা হউক, নানা চিন্তা লইয়া এককই ফিরিলাম। মেঘ করিয়াছিল,—মনটাও ঘোলাটে হইয়া গেল। ভাবিলাম,—শুনিতে পাই আমাদের দেশ নাকি সমুদ্রপারে দেশদেশান্তরে কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র জোগাইত, এবং সওদাগরেরা নাকি তাহা সাদরে ও সাগ্রহে লইত; তবে এত বড় বস্ত্রপ্রসূ দেশের বাসিন্দাদের পরিধেয়টা এমন কেন? এটা যদি অনাবশ্যকের প্রতি অনাস্থাজনিত ত্যাগের নিদর্শন হয়,—কথাটা বেশ পাকা রকম শোনায়, শ্রুতিসুখকরও বটে, তাহাতে ভারতের ধাতও বজায় থাকে। কিন্তু নিজের চৌহদ্দির বাহিরে সেটা যদি শরীর, সম্মান ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইত, তবেই সুখের হইত। বচনই আমাদের বর্ম্ম,—"ময়রায় মেঠাই খায় না" এই

রক্ষাবন্ধনই বোধ হয় আমাদের রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। থাক্— গোলামের গবেষণা কোথাও গ্রাহ্য হইবে না, সুতরাং এ প্রগল্‌ভতা থামাই ভাল। আসল কথা, বস্ত্রের দৈন্য ও মলিনতাটা তখনও পথের মাঝে এবং আমার মনের মাঝে ধাক্কা দিতেছিল।

—১২—

সঙ্গীদের 'দুর্গা' বলিয়া বিদায় দিয়া, একটু ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইবার ইচ্ছা করিলাম। সরকারী আপিস, ব্যাঙ্ক্, পুলিস্, সর্ব্বত্রই পাঞ্জাবী শিখপ্রহরী দেখিলাম। প্রত্যেক চৌমাথাতে শিখেরাই পাহারা দিতেছে। এক জনের সহিত কথা কহিয়া জানিলাম, তাহারা হংকং অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে এখানে আসিয়াছে, এবং ক্রমশঃ স্ত্রী-পুত্রও আনিয়াছে। এতাবৎ বিশেষ সম্মানের সহিত ইংরাজ বাহাদুর ২৫।৩০ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ২৫০।৩০০, এমন কি তাহা অপেক্ষা অধিক বেতন দিয়াও তাহাদের রাখিয়াছেন। হংকং-এর শিখ-সৈন্য ইংরাজ সরকারের একটি স্পর্দ্ধার সামগ্রী। এরূপ সুনির্ব্বাচিত সুদীর্ঘ সুন্দরকায় ও বলিষ্ঠ পুরুষদের সমাবেশে সম্পূর্ণ রেজিমেণ্ট ও পুলিস গঠন করা সহজসাধ্য নহে। ইহাদের পরিচ্ছদাদিও সুন্দর ও সম্মানসূচক। রাজপথের স্থানে স্থানে ইহারা যেন এক একটি সজীব সুদৃশ্য স্তম্ভস্বরূপ শোভা পাইতেছে।

জনৈক শিখ-সৈনিকের সহিত আলাপ হইল; সৈনিকটি বলিল— "আমাদের এতাবৎ যা একটু কদর ও সম্মান ছিল,—চীন অভিযান কালস্বরূপ হইয়া আসিয়া তাহাকে আঘাত দিল। ইতিপূর্ব্বে এ অঞ্চলে কোন ভারত-সৈন্য আসে নাই,—আমরাই সর্ব্বাগ্রে আসিয়াছি,

এবং এই রাজ্য জয় ও সরকার বাহাদুরের হুকুম পালন করিয়াছি,—সে জন্য সম্মান ও আদর পাইয়াছি। এখন দেখিতেছি, হিন্দুস্থান নিরন্ন হইয়াছে; আজ কিনা সহস্র সহস্র ভারত-সৈন্য, হংকংকে অর্দ্ধপথে ফেলিয়া, সুদূর উত্তর চীনে ১০।১২ টাকা বেতনে প্রাণ দিতে চলিয়াছে! আর কি সরকার বাহাদুর আমাদের এই উচ্চ বেতন,—প্রতি তিন বৎসরে ৩।৪ শত মুদ্রা ইনাম, এবং দেশে যাইবার জন্য তিন মাস করিয়া ছুটি ও পাথেয় দিয়া পোষণ করিবেন? এ যাবৎ আমাদের, ইংরাজ-সৈন্যের সহিত প্রায় একই পর্য্যায়ে ও ব্যবস্থায় রাখা হইয়াছে। আর কি আমরা তাহা আশা করিতে পারি?" ইত্যাদি। লোকটির প্রত্যেক কথায় হতাশা ও অভিমান প্রকাশ পাইতেছিল। মেঘ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতেছে দেখিয়া কথা সংক্ষেপ করিবার জন্য বলিলাম—"অনুমানের উপর এতটা ভয় পাইতেছ কেন?" পরে—সেলামের আদান-প্রদান সত্বর শেষ করিয়া বিদায় লইলাম।

দেখিলাম, হংকং-এর সহরে বিস্তর বোম্বাই অঞ্চলের লোক, সিন্ধুদেশবাসী ও পাঞ্জাবী, ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া থাকেন। কলিকাতা ও বোম্বাই নগরীর বিভব-বিভাগটা যেন সম্মুখে সমুদ্র ও পশ্চাতে পর্ব্বতের চাপে জড়সড় হইয়া এক বর্গ মাইলের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। পাঞ্জাবীরা মুদীখানার দোকানও খুলিয়াছে;—বড়ি, বেসন, পাঁপর, পকৌড়ি,—নাগাইত চানাচুর—সবই বর্ত্তমান!

মাথার উপর মেঘ শাসাইতেছে, অধিক দেখিবার আর অবসর নাই; কিন্তু একটি পার্শ্বপথকে উপেক্ষা করিয়া কোন ক্রমেই এক পা অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। পথটির দুই ধারে ফুলের বাজার বসিয়াছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া বড়ই শ্রান্তি বোধ হইতেছিল, এবং ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। এই স্থানটির সুমধুর সৌরভে ও শীতল বায়ুস্পর্শে

বড়ই আরাম বোধ করিলাম। বিবিধ চাতুর্য্যে ও নানা নৈপুণ্যে সুগন্ধি পুষ্পের কমনীয় মালা, মেখলা, তোড়া, বেড়, কবরীবন্ধ, পাখা, অলঙ্কার, আসন, পর্দ্দা প্রভৃতির রচনা দেখিলে, সেই পুষ্পসম্ভার মধ্যে পূর্ব্বশ্রুত গন্ধর্ব্বনগরীর চিত্র ফুটিয়া উঠে, এবং চীনাদের বিলাসিতার বহরটা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। শীতল সুগন্ধে স্থানটি পথিকদের আনন্দ-মদির করিয়া মধুর আবেশ আনিয়া গতিভঙ্গ করিতেছে। বস্তুতই পথটি যেন বসন্তোৎসব জাগাইয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এ কি! একটি বিসদৃশ ব্যবস্থায় সমস্ত সৌন্দর্য্যটাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। বিক্রেতাগুলি অর্দ্ধ-ক্ষৌরিত মস্তক—পাজামা-পরা পুরুষ মানুষ! তাহাদের স্থূল কর্কশ হস্তে এই সুকুমার সৌন্দর্য্যের ভার পড়িয়া কমনীয়তায় যেন নিষ্ঠুর আঘাত করা হইয়াছে। ও-দিকে ব্রহ্মদেশে ত এরূপ বেসুরো ব্যবস্থা নাই;—এটা কি তবে চীনাদের "ব্যাসকাশী!" আমি কোন দিনই রুচিগ্রস্ত নহি, তথাপি এই দৃশ্যে আমার প্রাণও বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। কারণ, বাল্যকাল হইতে যে সব গল্প শোনা গিয়াছে, তাহাতে প্রায় সকল রাজপুত্রই মালিনীর মালঞ্চে গিয়া ঠেকিতেন, এখানে ঠেকিলে মাম্‌দোর হাতে পড়িতে হইত। "বিদ্যা-সুন্দরে" হীরা মালিনী না থাকিলে রায় গুণাকারের 'রায়ে' কেইবা কাণ দিতেন! "রজনী" অন্ধ ছিল, তবু তাহার হাতের ফুল হুলস্থূল বাধাইয়াছিল। ফল কথা, হীরা, মাণিক, মুক্তা, স্বর্ণকে আশ্রয় করিয়াই শোভন হয়।

হঠাৎ পাহাড়টির শীর্ষ দেশে চাহিয়া দেখি—সবটাই গাঢ় কুয়াশাচ্ছন্ন। সেখানে বড় বড় সৌখীন সাহেবরা "বাংলো" বানাইয়া বাস করেন ও শীতল বায়ু সেবন করেন। আমার অপ্রচুর-পোষাক-পরা সঙ্গীদের জন্য ভাবনা লইল,—ঠাণ্ডাটা খুবই ভোগ করিতে হইবে।

যাঁহাদের উচ্চস্থানে অধিকার, তাঁহারা চিরদিনই উচ্চে থাকুন; আমি নীচু যাওয়ার নসীব লইয়া অবতরণ করিতে করিতে একেবারে সমুদ্র-তীরে হাজির হইলাম। তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে, হাওয়া ক্রমশই প্রবল হইতেছে, তরঙ্গেরও উন্নতির মুখ;—ঘাটেও নৌকার ভিড় নাই। শুনিলাম, নৌকার মালিকেরা নৌকাগুলি নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়াছে। কেবল যাহাদের হাঁড়ি চড়াইবার কড়ি তখনও সংগ্রহ হয় নাই, তাহারাই পাড়ি মারিয়া বেড়াইতেছে। যেমন আদালতের আব্‌ছায়ায় এক শ্রেণীর জীব—অপরের বিপদকে উপায়স্বরূপ ধরিয়া নিজেরা বাড়িয়া উঠিতে থাকে ও স্ফূর্ত্তি লাভ করে, সেইরূপ ইহাদের মধ্যে দু'একজন এমনও আছে যাহারা এই দুর্য্যোগ-গুলিকে রোজগারের উপায় বলিয়াই গ্রহণ করে।

যাহা হউক, নৌকার প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া আছি, ইতিমধ্যে দু'একটি আমাদের সহযাত্রী মান্দ্রাজী সঙ্গী আসিয়া জুটিলেন। তাঁহারা তৎপর হইয়া একখানি নৌকার মালিকের সহিত দরকসাকসি আরম্ভ করিয়া দিলেন। মাঝি ত প্রথমতঃ নৌকা ছাড়িতেই নারাজ,—পরে চতুর্গুণ ভাড়া চাহিল। তাহাদের ভাবগতিক লক্ষ্য করিয়া এবং ঝড় আসন্ন বুঝিয়া আমি মাঝির কথায় তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া নৌকায় উঠিয়া পড়িলাম, কারণ আর ইতস্ততঃ করিলে জাহাজে পৌঁছিবার উপায় থাকিবে না;—এদিকে বেলাও অবসান। বুঝিলাম, মান্দ্রাজী সঙ্গীরা আমার এই ত্বরা দেখিয়া বিশেষ বিরক্ত হইলেন। আমি তাঁহাদের ডাকিয়া লইলাম;—নৌকা খুলিল এবং অতি কষ্টে তরঙ্গ ও তুফান অতিক্রম করিয়া আমাদের জাহাজে তুলিয়া দিল।

জাহাজের মাল্লারা বলিল,—"দিন থাকিতে ভালয় ভালয় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, বড়ই ভাল হইয়াছে; হাওয়াটাতে যেন টাইফুনের

(Typhoon) আভাস পাওয়া যাইতেছে।" কিছুই বুঝিলাম না, তথাপি "টাইফুন্" কথাটার যেরূপ দীর্ঘ ছুঁচোলো উচ্চারণ কাণে ঠেকিল বা বিঁধিল, তাহাতেই মুখ চূণ হইয়া গেল! সাইক্লোন্, টরনেডো প্রভৃতি শ্রুত ছিল, কিন্তু টাইফুন্ শব্দটা যেন তাহাদের অপেক্ষা ওজনে ঢের ভারী ও ভীতিপ্রদ বলিয়া বোধ হইল। তবে বন্দরে বাঁধা জাহাজ; ঘর বলিলেই হয়। ঘরে আমাদের সাহস অসীম; সুতরাং টাইফুন্ দেখিবার সাধটা স্বতঃই আসিল। কিন্তু নিজে জলে থাকিলেও আজ ডাঙ্গার সঙ্গীদের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলাম এবং উপরের ডেকে গিয়া তাঁহাদের প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। যতই উত্তরোত্তর বৃষ্টি, বায়ু, বিদ্যুৎ, তরঙ্গ, একত্রে মিলিয়া প্রবল হইতে লাগিল, ততই আমরা এই দুর্গম পথের স্বদেশী সঙ্গীদের জন্য চিন্তা ও উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল। ক্রমে লঞ্চ্, স্টীম্‌বোট নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইল। বড় বড় জাহাজ ও স্টীমার পাল গুটাইয়া মাস্তুল নামাইল, এবং উপরের (Canvas) ছাত খুলিয়া ফেলিল, চারিদিকে নঙ্গর পড়িল। রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। স্টুয়ার্ড (Steward) আসিয়া বলিলেন,—"আপনারা খেতে যাননি কেন—খাবেন না?" আমি তখন তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। শুনিয়া তিনি ভীত হইলেন ও বলিলেন—"একে এই দুর্য্যোগ, তায় নূতন লোক, অপরিচিত স্থান! এখনি এ বিষয় চিফ্ সাহেবকে রিপোর্ট করা উচিত, তিনি অনুসন্ধানে লোক পাঠাতে পারেন; কিন্তু বড় রাগ করবেন।" এইবার আমি বিশেষ চিন্তিত হইলাম; দু'এক মিনিট পরামর্শের পর চিফ্ সাহেবকে রিপোর্ট করাই স্থির করিলাম। ঠিক্ এই সময় সেই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া একটি আলোক আমাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া স্টুয়ার্ড্ বলিলেন—"এটা কি আগে

দেখা যাক্।” দেখিতে দেখিতে একখানি ক্ষুদ্র লঞ্চ্ আমাদের জাহাজের পার্শ্বে আসিয়া লাগিল এবং তন্মধ্য হইতে আমার বহু-প্রতীক্ষিত সঙ্গীরা ভিজে বিড়ালগুলির মত অতি কষ্টে সিঁড়ির ও দড়ির সাহায্যে জাহাজের ক্রোড়স্থ হইলেন। আমি যেন বাঁচিলাম, স্টুয়ার্ড বলিয়া উঠিলেন—Thank God. (ঈশ্বরকে ধন্যবাদ)।

বোসজা বলিলেন—“কিছু আর বলবেন না, আপনার কথা না শুনে—প্যাঁজ-পয়জার দুই-ই হয়েছে! ঝাড়া ৩।৪ ঘণ্টা এই ঝড়বৃষ্টিতে একটানা ভিজেছি; সকল রকম চেষ্টা পেয়েও একখানা নৌকা যোগাড় হ'ল না; শেষে একজন সাহেবকে ধরে দু' পেগ হুইস্কী, খাইয়ে তারি সুপারিসে একখানা লঞ্চ—(হাঁড়ির বদলে টোপর)—পাওয়া গেল. তাই রক্ষা! তারপর ঝকঝকে দুটি গিনি অর্থাৎ কন্‌কনে তিরিশটি টাকা, আক্কেলসেলামী দিয়ে,—এই বত্রিশ হাত বৈতরণীটুকু পার হয়ে আস্‌ছি। মনে রাখবেন—পথ খরচের আর সিকি পয়সাটিও পকেটে নেই! এখন লজ্জার বদলে—গরম গরম এক কাপ্ ক'রে চা দিয়ে প্রাণ বাঁচান।” স্টুয়ার্ড কাজের কথাটা ঠিক বুঝিয়া লইয়াছিলেন, তিনি সহাস্যে বলিলেন,—“আমি এতটা নির্দ্দয় নই যে,—এই অবস্থায় এক কাপ ক'রে ব্যবস্থা ক'রব;—আমি সব সাজ সরঞ্জাম আর ত'য়েরি দু' কেটলি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি, যাঁর যতটা দরকার ঢেলে নেবেন। বলেন ত ঐ সঙ্গে ডিনারও পাঠিয়ে দি।” “সেই ভাল” বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলাম,—কারণ তখন ১০টা বাজিয়া গিয়াছে।

সঙ্গীদের অবস্থা দেখিয়া বাস্তবিকই কষ্ট হইতেছিল, যেন ডুবো আসামী! সকলে কাপড় ছাড়িলেন,—সঙ্গে সঙ্গে চা'ও আসিয়া পৌঁছিল; ক্রমে ডিনার,—অ্যাকেবারে জামাই-ষষ্ঠী! কখন বিস্কুট, কখন চপের সঙ্গে চা চলিতে লাগিল; পাঁচুর উৎপাতে চাটুয্যে

দু'চারখানা চপ্ পকেটে ফেলিল। আমি বলিলাম—"বোসজা মশাই, এত কষ্ট আর ভয় পাবার কারণ ছিল? কি এ সব ত হোটেল-প্রধান দেশ,—একটা হোটেলে রাতটা কাটালেই হ'ত।" মজুমদার ভায়া বলিলেন—"এ পোষাকে পাঁদাড়েও স্থান পেতাম না।" বুঝিলাম—পোষাকটির জন্য পশ্চাত্তাপ ও লজ্জা সকলেরই দেখা দিয়াছে। বোস্জা বলিলেন—"সেটা ঠিক বটে কিন্তু প্রত্যুষেই জাহাজ যে ছেড়ে যাবে সেটাও ত ভুলিনি;—চাকরী বড় চিজ,—ওটি আমাদের 'প্যানামা',—পেট আর পাওনাদার, এ দুয়েরেই ভার বহন করে! তার ওপর—এই দ্বীপান্তরে ছেড়ে গেলে, কি হাড়ির হালই হ'ত!" আমি বলিলাম—"রাজপুত্তুরও ন'ন্, দুয়োরাণীর গর্ভেও জন্মাননি, আর এমন কোন্ পাপও করেননি যা'তে দ্বীপান্তর হব।" তিনি উত্তর করিলেন,—"ও কথা বল্বেন না, কিসে যে পাপ হয় তা কেউ বলতে পারে না; এই ধরুন, গৃহিণীকে তাঁর মনের মত অলঙ্কার দেওয়া হয়নি।" মজুমদার—"এই ধরুন—জুলপি দুটো ভ্রূর parallel-এ এক ইঞ্চি ওপরে—মুড়িয়ে কামানো হয়নি!"—ইত্যাদি হাস্য-কৌতুকে মজলিস্ জমিয়া উঠিল। মজুমদার ভায়া তখন আমার একাকী প্রত্যাবর্ত্তনের পালাটা শুনিতে চাহিলেন;—মতলবটা,—যাহাতে আরো কিছুক্ষণ এই আনন্দ-মজলিসটা চলে। সকলে উৎসাহের সহিত অনুমোদন করায় অগত্যা আমি সম্মত হইয়া সুরু করিলাম। ক্রমে পুষ্প-বিপণীর বর্ণনা শেষ করিয়া, যখন তাহার বিসদৃশ রূঢ় অংশ সম্বন্ধে, অর্থাৎ বিক্রেতাদের সম্বন্ধে, আমার অভিমত ব্যক্ত করিলাম, এক মজুমদার ভায়া ভিন্ন তাহাতে আর কাহারো সহানুভূতি পাইলাম না। সকলেই এক বাক্যে বলিলেন—"তাতে দোষ কি, এ আপনার অন্যায় কথা,—এ সম্বন্ধে আবার মেয়ে-পুরুষ কি?—ফুল নিয়েই কথা। ধরুন—একটা মোহর,—তা সেটা স্ত্রীলোকের

হাত থেকেই পান, আর পুরুষের হাত হ'তেই পান,—মূল্য এক-ই। বাজারে তার ইতর-বিশেষ আছে কি?" বলিলাম—"তাই ত,—তোমরাও যে সেই এক ইউনিভারসিটিরই এম্-এ, তা জানতুম না! কিন্তু সব-জজেও যে তোমাদের এই প্রত্যক্ষ সত্যটা বুঝতে পারে না—এই আশ্চর্য্য!" শুনিয়া সকলে সাগ্রহে—"সে আবার কি!" বলিয়া কথাটা শুনিবার জন্য জিদ্ করিয়া বসিলেন।—হায়, একদিন যাহা শুনিবার জন্য সঙ্গীরা কতনা আগ্রহ ও জিদ্ প্রকাশ করিয়াছিলেন—আজ তাহাই "অবান্তর" বোধে অনাদৃত হইতে পারে ভাবিয়া লিখিতে শঙ্কা বোধ করিতেছি!* সঙ্গীদের বলিলাম ব্যাপারটা এই—কোন এক পুত্র-পুত্রবধূ-পরিবৃত সব-জজ্ বাবুর ৫২ বৎসর বয়সে পত্নীবিয়োগ হয়। সেই দিন হ'তে তিনি বহির্ব্বাটীতেই ভরন্তর করেন। তিনি সে কালের শিক্ষিত ও সৌখীন লোক ছিলেন। পিতার কষ্ট না হয় বা সেবার কোনরূপ অভাব না হয়—উপযুক্ত-পুত্রেরা সাধ্যমত তার ব্যবস্থায় মন দিলে, আর বাপের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের পরামর্শ নিয়ে,—তিনজন চাকর ও একটি রাঁধুনী-বামন নিযুক্ত ক'রে নিশ্চিত হ'ল। কারণ—উপযুক্ত ছেলেরা থাকতে বাপের যে বিবাহের আর আবশ্যকই হ'তে পারে না, অযাচিত হ'লেও,—সকলেই ইসারা-ইঙ্গিতে সব-জজ বাবুকে এই সহজ কথাটা জানিয়ে দিলে। তিনিও সকলের সকল কথায় ছোট একটি 'হুঁ' ভিন্ন অন্য দ্বিরুক্তি করলেন না।

*"চীনযাত্রী"—ভ্রমণ-কাহিনীর পর্য্যায়ে পড়িলেও, ইহাকে বৈঠকী ভ্রমণ বলাই সঙ্গত; কারণ, এ"যাত্রায়" নিজের গতিশক্তির খরচ অল্পই—জাহাজের মোশনেই (motion) এই ভ্রমণ; অর্থাৎ কিভাবে ও কিরূপে যে আমাদের দীর্ঘ জাহাজী দিনগুলা কাটিয়াছিল,—ইহাতে সেই কথারই আধিক্য বেশী,—তাহাই ইহার প্রধান উপকরণ।

সমস্ত দিন পরে, সেই বিশেষ পরিচিত পশুটির খাটুনি খেটে সব-জজ বাবু যখন ব্রুহাম্ গাড়ী ক'রে বাড়ীর ফটকে ঢুকলেন,—তাঁর নজরে প'ড়ল—তিনটি অপরিচিত গুণ্ডাগোছের খোট্টা মূর্ত্তি! দেখেই তাঁর মুখে বিরক্তি আর অস্বস্তি ফুটে উঠল। তিনি মাটিতে পা দিতেই সেই তিন মূর্ত্তি;—পিঠের শিরদাঁড়া দেখিয়ে সেলাম করলে। তিনি সেদিকে লক্ষ্য না ক'রে দ্রুত গিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকলেন। আরাম চৌকিখানায় ঘুরে বসতে গিয়ে দেখেন তিন মূর্ত্তিই ঘরের মধ্যে হাজির! কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই একজন জুতো খুলতে বসে গেল;—একজন বাতাস আরম্ভ ক'রে দিলে; তৃতীয়টি তাওয়াদার সুগন্ধি তামাকের কলকেটি গড়গড়ায় বসিয়ে দিয়ে ভাঙ্গাগলায় বল্লে—"পিজিয়ে হুজুর।"

সহসা এই তিন মূর্ত্তির আক্রমণে, তিনি যেন নিজের বাড়ীতেই অসহায় অবস্থায় পড়ে গেলেন; রাগে সর্ব্বশরীর জ্বলে উঠল। জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমরা কে?"

যে বাতাস করছিল—সে প্রায় ছ'ফিট লম্বা, বাবরি চুল, গালপাট্টা দাড়ি—ইয়া মোচ্, বর্ণ ধূসর, হাতের গুলের উপর রূপার কবজ, কোমরে গোট, আঙ্গুলে আসমানি পাথর বসান রূপোর আংটি; গলায় একছড়া প্রবালের মালা। সে বাজখাঁই আওয়াজে বললে—"জজ বাহাদুর" হাম্‌রা নামটি আছে 'মুচ্‌কুন্দা,' হাম সব কাম করিয়েছে—পাঁও দাবানা, তেল লাগানা, কাপ্‌ড়া কুচানা—"

সব-জজ বাবু,—আচ্ছা বাস্, (তামাকুদারের প্রতি)—তোমার কিছু শুনি।

সে ব্যক্তি বেঁটে জোয়ান, খাটো খোঁচা খোঁচা চুল, ছাঁটা গোঁফ, গোল চক্ষু, কিট্‌-কিটে কালো, এক কানে মাকড়ি, পদাঙ্গুষ্ঠে তামার তার জড়ান, ঘুনশি সূতায় ইঞ্চি তিনেক লম্বা একটি রৌপ্য-ফলক গলায়

ঝুলচে। সে বল্লে—"মহারাজ, হামি দুর্গাচরণ ডাকদারকে তাম্বাকু পিলিয়েছে, বিছোনা করিয়েছে, পান লাগিয়েছে হাড়কাট্টাকে—"

সব-জজ বাবু—বাস্ করো। তোমার নাম? উত্তর,—হুজুর—"কাট্টুরিলাল" আছে।

সব-জজ—(তৃতীয়ের প্রতি) তুমিও কিছু শোনাও—

এটির ছুঁচোলো ছাঁচের গড়ন, ফর্সা রং, কটা চক্ষু, দাড়ি-গোঁফ বর্জ্জিত, মুখে বসন্তের দাগ, পরিধানে হলুদে ছোবান কাপড়, একহাতে রূপোর বালা, অপর হাতে সারগাঁথা রূপোর মাদুলী। নখে মেদির রং।

ইনি হেসে বল্লেন—"হামারা নামটি চমৌকীলাল আছে। হামি পারিরা সাহেবের মৌসীকা—"

সব-জজ বাবু সত্বর বল্লেন—"আচ্ছা বাস; তোদের কে এখানে কাম্ করতে বলেছে?"

সকলেই বল্লে—"বড় বাবু বাহাল করিয়েছে; হুজুর কাম দেখ্‌কে খুসী হোবেন,—কুছ্‌ভী কোস্টো থাকবে না।"

সব-জজ বাবু প্রথমে ভাল কথায়, পরে সরোষে তাদের বিদেয় হতে বল্লেন; কিন্তু তারা বাড়ী ছাড়লে না; বলে—"খুসী না কর্‌কে যাবে না।"

কিছুক্ষণ পরে এক উড়ে বামন জলখাবার নিয়ে উপস্থিত হ'ল। সবজজ বাবু এজলাসের ধড়া-চূড়া-বাঁধা intact অবস্থাতেই সেই আরাম-চৌকিতে অসাড় হয়ে পড়েছিলেন। ঘরে লোক ঢুকতেই তাঁর হুঁস্ হ'ল, বল্লেন—"কে"?

বামন ঠাকুর—প্রভু মিষ্টান্ন লউচি,—অধিন পকাইছে।

সব-জজ্ বাবু—তোমার নাম কি?

বামন ঠাকুর—উডুম্বর।

সব-জজ্ বাবু—বেশ, নে'যাও, আজ আমি খাব না।

দুই ছেলেই ক্লাব্ থেকে এসে সব শুন্‌লে; ঘরে ঢুকে দেখ্‌লে—চেয়ারের উপরই বাপের নাক ডাক্‌ছে। ছোট ছেলে তাঁর কপালে হাত দেওয়ায়, তিনি বল্লেন—"কে ও"?

ছেলে বল্‌লে—"আপনি এখনও কাপড় ছাড়েননি, হাত মুখ ধোন্‌নি, কিছু খাবেন না বলেছেন; কেন—শরীর কি ভাল নেই?"

সব-জজ্ বাবু বল্লেন,—"হাঁ, তোমরা খাওগে, আজ আর আমাকে বিরক্ত ক'র না।"

ছেলেরা চিন্তিত মনে চলে গেল। বড় পুত্রবধূর হিস্টিরিয়া; ছোটটির সন্তান-সম্ভাবনা। সব-জজের কন্যাসন্তান নাই।

প্রত্যূষে সকলের আগে উঠে, কাপড় ছেড়েই সব-জজ্ বাবু তাঁর প্রিয় বন্ধু উকীল নবগোপালবাবুর বাড়ী উপস্থিত হলেন। নবগোপালবাবু সেই মাত্র উঠে এসে বারাণ্ডায় বসেছেন। তিনি সব-জজ্ বাবুকে দেখে হাসিমুখে অভ্যর্থনা ক'রে, বসতে চেয়ার দিলেন। বল্লেন—"আজ আমার কি সুপ্রভাত"! সব্-জজ্ বাবু বল্লেন—"আর অত সমাদরে কাজ নেই, ঘাটের ব্যবস্থা কর, দূত এসে গেছে।"

নবগোপাল—কি রকম?

সব্-জজ্ বাবু—ছেলে দু'বেটায় পরামর্শ ক'রে, চারবেটা যমদূত হাজির করেছে,—আমার "পাট্" ক'রবে বলে! কাছারী থেকে ফিরে দেখি তিন খুনে-মূর্ত্তি আমার জন্যে অপেক্ষা করচে! পরে বুঝলুম—খুন করেনি, আমাকেই করতে বাহাল হয়েছে! বেটাদের আক্কেল্‌টা দেখ!—তারা নাকি আমার 'কোষ্ঠ মোচন' করবে!

নবগোপাল—সেই উদ্দেশ্যেই বাহাল হয়ে থাকবে।

সব-জজ্ বাবু—ঐ সব মুরোদ? কেন,—আমায় তারা কুস্তি শেখাবে, না পাঞ্জা লড়াবে?

নবগোপাল—এখন করবে কি বলো,—উপায় কি?

সব-জজ্ বাবু—তা বলে, আমি সংসারে থাকব আর সকল রসে বঞ্চিত হয়ে ঐ বেটাদের হাতে submit ক'রে সুখ খুঁজবো এ-তো পারব না। এ কি লোহারামের না টচণ্টারের ভিটে যে এক ফোঁটা রসের ঠাঁই থাকবে না! ছেলে বেটারা কি যত বেডউল পাথুরে মুরোদ দেখিয়ে, বাবাকে অজণ্টা গুহায় গোর্ দেবে! যদি ভাই নামগুলো শোনো ত এই সরস বাংলা দেশ থেকে ছুটে পালাবে। এক বেটা মুচ্কুন্দা, দ্বিতীয়—কাট্টুরী, তৃতীয়—চামোকী, আবার সব্সে সেরা —to crown the lot, উড়ে বামুন ঠাকুর হচ্চেন—উড়ুম্বর! এই ছুচুন্দর, কাঠঠোকরা চাম্চিকে, আর হুড়ুমভাজা নিয়ে আমাকে অবশিষ্ট দিন কাটাতে হবে? আমি "মেঘদূতে" মেডেল পেয়েছিলুম কি পরিণামে এই যমদূতের হাতে পড়তে হবে বলে! (এই কথায়, তাঁর চক্ষে জল পড়তে লাগলো,—তিনি আবার বল্লেন) কোনখানে একটু পোইট্রি—অন্ততঃ একটু সুন্দর হাসি না পেলে, মানুষ বাঁচতে পারে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। মেয়েদের কাজ মরদ দিয়ে—শোভনও নয়—সম্ভবও নয়। তা যদি হ'ত ত রেজিমেণ্টগুলোও সংসার নামের দাবী করতে পারত।• স্ত্রীলোকদের কি কেউ তাল গাছে উঠে তাড়ি পাড়তে বলে? যার যা। আমায় পান দেবে চামোকী, ব্যজন করবেন কাট্রোরী, আহার করাবেন—উড়ুম্বর! আরে ছ্যাঃ! ছেলেদের এম-এ পড়িয়েছিলুম কিনা, দু-বেটাই দেখছি Master of Arts দাঁড়িয়ে গেছে,—বেটাদের বাচায়ের্ তারিফ্ আছে! ইউ-নিভার্সিটিরও যেমন দৈন্যদশা—এক ফোঁটা ময়েন্ জোটেনি—একেবারে

কাটখোলায় ভেজে ছেড়ে দিয়েছে। আমাকে খুসী করবার জন্যে ঐ মালকোচা-মারা সালঙ্কারা মুরোদ ক'বেটাকে কোন দিন 'মা' বলে না ডাকে !!"—হাসির একটা হরিকেন্ বহিতে লাগিল।

—১৩—

কি আশ্চর্য্য, ঠিক সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে ঝড়ের গোঁ গোঁ শব্দ আরম্ভ হইল, সকলে সভয়ে উঠিয়া পড়িলাম। সম্মুখে পাইয়া সারেংজিকে সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সারেংজি, ভয় নাই ত?" তিনি মনোমত সেলাম ও সম্ভাষণ পাইয়া, নিজের গুরুত্ব উপলব্ধি করতঃ গম্ভীরভাবে বলিলেন—"টাইফুন অতি ভয়ঙ্কর জিনিষ, সমুদ্রের মাঝে থাকলে কোন ভয় ছিল না,—বন্দরে বড়ই বিপদের কথা! এই লহমায় চেন্ ছিঁড়ে, জাহাজে জাহাজে, কি পাহাড়ে লেগে গুঁড়ো হয়ে ডুবে যাওয়াই সম্ভব;—কিম্বা বন্দর থেকে বেরিয়ে অজানা দরিয়ায় গিয়ে খতম্ হ'তে পারে;—এ সময় খোদাই মালিক।" পরে একটু উদাসভাবে—"আল্লা তুঁহি সব্ কুছ্" বলিয়া সরিয়া পড়িলেন। এতক্ষণ আমরা যে আশাটুকুর উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম,—সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় সারেংজি তাহাতে সজোরে কোপ্ মারিয়া সেটুকু সাফ্—নির্ম্মূল করিয়া দিলেন;—তাঁহার কথা শুনিয়া আমরা একদম্ বসিয়া পড়িলাম। আমার টাইফুন দেখিবার সাধ ও আমার সঙ্গীদের সাহস,—সমূলে শুকাইয়া গেল।

সারেংজির কথা শুনিয়া পঞ্চানন কিন্তু চটিয়া বলিল—"মশাই, লোকটা কি বেয়াড়া-খোদার গড়ন্! আপনিও যেমন—ওকে মুরুব্বি ধরতে গেছেন,—বেটা ড্রেক্ না নেল্সন্?" যাহা হউক,—পঞ্চাননের এই সময়োচিত রিমার্কটা খুব কাজ করিল। আমাদের 'পারা'

normal point-এর নীচে যে-রকম নামিয়া পড়িয়াছিল, তাহার এই কথায় সেটা চন্‌চন্ করিয়া উর্দ্ধমুখে ছুটিতে আরম্ভ করিল ;—সত্যিই তাহা সকলকে একটু চাঙ্গা করিয়া দিল। চাটুয্যে কিন্তু ভীতকণ্ঠে বলিল—"হুঁ। বাঁড়ুয্যে মশাই, বুড়ো লোকটা তবে অমন কথা বল্লে কেন ? আমাকে তাহার উত্তর দিতে হইল না, পঞ্চাননই বলিয়া উঠিল,—"অমন ঢেব বেওকুব্ বুড়ো আমি দেখেছি,—বুড়ো হলেই বুঝি তাঁকে 'বিক্রমাদিত্যের বরাহ' ঠাওরাতে হবে ?"

ঝড় উত্তরোত্তর ভীষণ ভাব ধারণ করিল। তাহাতে আবার রাত্রিকালে বিপদগুলার বহর বাস্তব অপেক্ষা বহুগুণ বেশী বলিয়াই বোধ হয়,—সহায় সম্পত্তি সত্ত্বেও লোকে আপনাকে অসহায় বোধ করে। বন্দরে বদ্ধ থাকিলেও আমাদের সেদিনকার রাতটি যেন জীবনব্যাপী পাট্টা লইয়াই উপস্থিত হইয়াছিল। সে রাত্রে ঘড়ির-কাঁটা যেন এক ঘণ্টায় পাঁচ মিনিটের ঘরটি পার হইতেছিল। রজনীর নিস্তব্ধতায় ঝড়ের সোঁ-সোঁ, গোঁ-গোঁ শব্দ বিকটতর হইয়া সারেংজির কথা স্মরণ করাইয়া মুহুর্মুহু ভয়ের সৃষ্টি করিতেছিল !

সেই ঝড়ে আমরা জড়ের মত একস্থানে জড়-সড় হইয়া প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। চাটুয্যে আমাকে ঘেঁসিয়া বসিয়াছিল। এক একটা দুর্জ্জয় দমকায় কাহারো মুখে দুর্গা নাম, কাহারো মুখে 'নারায়ণ', কাহারো মুখে 'মধুসূদন'—ঠেলিয়া বাহির করিতেছিল, কেবল চাটুয্যে তাহার পূর্ব্বসংস্কার মত—জয় হনুমান, জয় হনুমান—করিয়া উঠিতেছিল। প্রত্যেক দমকায়, বোধ হয় সে আমাকে আসন্ন বিপদটা স্মরণ করাইয়া দিবার বা আমাকে সজাগ রাখিবার এমন এক মারাত্মক উদ্ভট উপায় অবলম্বন করিয়াছিল যে, ক্রমে তাহা আমার পক্ষে উপস্থিত বিপদ অপেক্ষা বিকট হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রত্যেক ঝাপটার

সঙ্গে সঙ্গে সে আমার উরুদেশ এমন সজোরে টিপ দিয়া ধরিতেছিল যে, তার সাংঘাতিক সাড়া আমার আত্মা পর্য্যন্ত পৌঁছিতেছিল। আমি তাহার তাড়নে প্রত্যেক বারই একটু করিয়া সরিয়া বসিতেছিলাম;—কিন্তু সে-ফাঁকটুকু ফি-বারেই পানাপুকুরের পানা সরার মতই তখনি অলক্ষ্যে পুরিয়া যাইতেছিল;—আবার সেই বিদকুটে টিপুনি! উরুত আউরে উঠলো। একবার চকিতে মনে হইল—বদি-বা ঝড়ে রক্ষা পাই, কিন্তু বিদেশে উরুস্তম্ভ হইলে আর বাঁচোয়া নাই। উঠিয়া পড়িলাম। চাটুয্যে অমনি তাড়াতাড়ি আমার কাপড় ধরিয়া কাতর দৃষ্টিতে বলিল—"কোথা যান বাঁড়ুয্যে মশাই!" আমি বলিলাম —"একটু দাঁড়াই, পা ধরে গেছে।" মজুমদার ভায়া দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল—"তবে আমি একটু বসি।" আমি তাহাকে স্থান ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইলাম।

মিনিট্ তিনেকের মধ্যেই, একটা দমকার সঙ্গে সঙ্গে, আচমকা —"ওরে বাবারে—উহুহু" করিয়া মজুমদার ভায়া লাফাইয়া ওঠায়, বিপদ বুঝি আসন্ন ভাবিয়া, চাটুয্যেও সচীৎকারে "হনুমান্ রক্ষা কর" বলিয়া শশব্যস্তে, আলুথালু উঠিয়া পড়িল। ভায়া ভয়ানক চটিয়াছিল, সে এক অপূর্ব্ব মুখভঙ্গী করিয়া বলিল—"কচুপোড়া খাও, তুমি কোথাকার লোক্ হ্যা!" সকলে অবাক্, বোসজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে, ব্যাপারটা কি!" মজুমদার—"ব্যাপার' এই দেখুন না,—একেবারে হাফ-খুন্" বলিয়া কটি পর্য্যন্ত কাপড় তুলিয়া উরুস্ত দেখাইল। ভায়ার বর্ণটা কাল নয়, বাস্তবিকই তাহার উপর চাটুয্যের বক্র তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সুস্পষ্ট হইয়া রক্তাভায় দেখা দিয়াছে।

আজিকার দুর্য্যোগে আমাদের পঞ্চাননের মুখও বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; সে এতক্ষণ বড়ই বিমর্ষভাবে অস্বস্তিতে কাটাইতেছিল।

এই আকস্মিক ঘটনাটা বামালশুদ্ধ পাওয়ায়, উৎসাহে তাহার দীর্ঘদন্তগুলি ঘরবার্ করিতে লাগিল। মজুমদার ভায়ার উরুত্‌টায় উঁকি মারিয়াই বলিয়া উঠিল—"উঃ—কি ভীষণ! দয়াময় দ্বাপরে উপস্থিত থাকলে ভীমকে আর হিম্‌সিম খেতে হ'ত না, দুর্য্যোধনের উরুতটা উনিই মড়াৎ করে ভেঙ্গে দিতে পারতেন!" মজুমদার বলিল—"তাই বটে, রত্নাকরের improved edition—বড়িয়া সংস্করণ, লাঠি ছুঁতে হয় না!"

আমি আর হাসি চাপিতে পারিতেছিলাম না। দু'পা অন্তরালে গেলাম। বোসজা বলিলেন—"একটু দাঁড়ান বাঁড়ুয্যে মশাই—একসঙ্গে যাই, আমারও বড় পীড়া উপস্থিত।" একটু সামলাইয়া আসিয়া—তখনো চাটুয্যেকে সেই অপ্রস্তুত অবস্থায় নীরব থাকিতে দেখিয়া বলিলাম—"কি এতবড় ব্যাপারটা ঘটেছে যে, তোমরা এখনো সেই নিয়ে রয়েছ?" শুনিয়া মজুমদার বলিল,—"ভায়া ত এর স্বাদ পাওনি, একেবারে কচ্ছপের কামড়—মাথা পর্য্যন্ত ঝন্‌ঝনিয়ে গেছে।" পঞ্চানন অমনি পোঁ ধরিল—"ভগবানের কৃপায় আজ ঘন ঘন মেঘ ডাকছে তাই, তা না হলে, জ্যান্তো শাঁড়াশীর চাপ্ সেঁটে ধোর্‌তো!" চাটুয্যে মজুমদারের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"আমি বুঝতে পারিনি, আমি ভেবেছিলুম—বাঁড়ুয্যে মশাই—।" তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইল; মজুমদার কিন্তু আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—"তোমরা দেখচি তিল্‌কে তাল করতে ভালবাস, আমিও ত ওখানে বসেছিলুম, বোধ হয় ছাপ্পান্নবার ওরকম হয়ে গিয়ে থাকবে, কি এমন মারাত্মক তা ত বুঝতে পারিনি। বিপদের সময় ভীরুলোক মাত্রই সামনে একটা অবলম্বন পেলে সেটা জোরেই ধরে থাকে!" মজুমদার—"তুমি বল কি বাঁড়ুয্যে! তুমি যদি এ যুগের জরাসন্ধ না হও, আর সত্যি যদি

তোমার উরুতের ওপর ঐ অস্তটিপুনির এন্‌কোর় চ'লে থাকে, ত পা খানি amputate করতে (বাদ দিতে) হবে জেনো।"

এমন সময় পঞ্চানন Eureka (পেয়েছি) বলিয়া লাফাইয়া উঠিল। বোসজা বলিলেন—"কিহে—তুমি আবার কি পেলে? তোমরা যে দেখচি আবার একখানা 'পঞ্চাঙ্ক' ফাঁদ্‌লে !"

পঞ্চানন বিকশিত দন্তে আরম্ভ করিল—"ঠাকুরদের নাম কিনা, তাই বিপদকালে মনে আসছিল না মশাই। গাঙ্গুলী মশাই তাঁর Blue-lotusটি (নীল-পদ্মটি) মর্ত্ত্যে ছেড়ে দিয়ে স্বর্গে সরে গেছেন। তা তাঁকে দোষ দেওয়াও যায় না,—বিধুভূষণকে দিয়ে খোঁজ করাতে কসুর করেননি ;—সে দুর্ল্লভ শর্ম্মাটি যে বেহ্নলা ফেলে সাগর লঙ্ঘে একদম বর্ম্মায় গা-ঢাকা হয়েছে, এ কারুর আক্কেলে আসতে পারে না।"

বোসজা—কি মাথামুণ্ডু বোকৃচ পঞ্চানন, তোমার গাঙ্গুলী মশাইটি কে ?

পঞ্চানন—ঐ দেখুন, আবার ভুল করেছি ; আমার আর গতি হবে না, ভূতই হতে হবে দেখচি।

আমি বলিলাম—"হতে হবে কিহে ?" পঞ্চানন একগাল হাসিয়া বলিল—"একটু আস্তে বলুন, সবাই আজও সেটা ধরতে পারেননি! দেখুননা ফের ঠাকুরদের নামটা ভুলেছি,—তারকনাথ গাঙ্গুলী, যিনি 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসখানির রচয়িতা।"

বোসজা হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"সেই পদ্ম-আঁখি! ওরে বা-বা, তোমার imaginationএর (কল্পনার দৌড়ের) তারিফ আছে!" মজুমদার—"টিপুনিটিরও মিল্ আছে! তার টিপুনিও মোক্ষম্ ছিল।"

এই কথায়, কালীঘাটের সেই গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রার আসরটা যুগপৎ সকলের মনে হওয়ায়, হাসির একটা হল্লা পড়িয়া গেল!—হাসিল না কেবল চাটুয্যে, আর আমাদের সুপরিচিত ও সুশিক্ষিত স্কলার্—দত্তজা। তিনিও উপস্থিত ছিলেন, বিপদের সময় প্রাণিমাত্রেই বিরুদ্ধভাব ভুলিয়া যায়, বাঘে ঘোগে এক স্থানেই আশ্রয় লয়। তাঁহার না হাসিবার অনেকগুলি কারণের মধ্যে—বঙ্গভাষায় লিখিত পুস্তকের সহিত অপরিচয় প্রকাশের গৌরবটাও অন্যতম। আর চাটুয্যের অবস্থাও ক্রমশ pitiable (কৃপার যোগ্য) হইয়াই দাঁড়াইয়াছিল। তত্রাপি রেহাই নাই; বোসজা বলিলেন—"ও বড় বড় লেখকদের ধারাই ঐ, তাঁরা লেলিয়ে দিয়ে সরে পড়েন। দেখ না, —বঙ্কিম বাবুই কি তাঁর বিদ্যাদিগ্‌গজকে সঙ্গে নে'গেছেন, না, তোমার ঐ গাঙ্গুলী মশায়-ই তাঁর গদাধরচন্দ্রকে সাথী করেছেন, আর রায় মশাই তাঁর নন্দলালকে নড়িয়েছেন কি? ঐ ক'রেই ত দুনিয়াটা দ' পড়ে যাচ্ছে—।" হায়—বেচারা চাটুয্যের হইয়া বড়বাবুকে কেহই বলিল না—You too Brutus (আপনিও লাগলেন)। মানুষের মজা দেখা স্বভাব।

পঞ্চানন উন্মুখ হইয়াছিল, সে বোসজাকে সমাপ্ত করিতে না দিয়াই বলিল—"দ' প'ড়ে কি মশাই! ভরাট হয়ে গেল—তারা এগুবাচ্ছা ছাড়্‌ছে না?"

এই সময় হরিপদ বলিয়া উঠিল—"সকাল হ'ল যে মশাই।" চাহিয়া দেখি—তাই বটে।

আমি চাটুয্যেকে একটু চাঙ্গা করিবার পথ খুঁজিতেছিলাম, ফাঁক পাইয়া বলিলাম—"তোমাদের মতলব হাসিল হয়েছে ত; ফর্সা হ'লে ফার্স ফিকে মেরে যায়, আর নয়, এখন দুর্গা দুর্গা বল।" চাটুয্যেকে

বলিলাম—"চাটুয্যে, এঁদের মতলবটা এখন বুঝ্‌তে পেরছ ত? ঝড়ের আতঙ্কটা ভুলে থাকবার জন্যে আর তোমাকেও ভুলিয়ে রাখবার তরে একটা উপলক্ষ্য করে এই অভিনয় চল্‌ছিল। ছেলেপুলেদের হেঁচ্‌কি ওঠা থামাতে হলে তাদের মিথ্যে একটা দোষ কি অপবাদ দিয়ে চটিয়ে অন্যমনস্ক বা আশ্চর্য্য ক'রে দিতে হয়, তা হলেই তাদের মন হেঁচ্‌কির দিকে না থেকে রাগের দিকে পড়ে, অম্‌নি হেঁচ্‌কিও বন্ধ হয়ে যায়,—এটা জান ত? আজকের এ ব্যাপারটাও তাই,—তোমাকে হতভম্ব বানিয়ে দিয়ে অন্যমনস্ক ক'রে রাখা।" শুনিয়া চাটুয্যে আর সে চাটুয্যে রহিল না, মুহূর্ত্তেই প্রকৃতিস্থ হইয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তাই বলুন, আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি; আপনারা সব করতে পারেন! এখন্ বুঝেছি—তানা ত বড়বাবু পর্য্যন্ত যোগ দেন!"

বাস্তবিক সেই ভৈরব টিপুনির পাল্লায় পড়িয়া ঘণ্টা দেড়েক অতবড় টাইফুন ঝড় যে কোথায় রড়্ দিয়া একদম গা-ঢাকা হইয়াছিল, সে-সংবাদ আমাদের কেহই রাখে নাই। মনই সুখ-দুঃখের সৃষ্টি করে, তাহাকে স্থানান্তরিত করিতে পারিলেই ফাঁকি দেওয়া যায়,—এই কথাটা পুঁথিতেই পড়া ছিল, তার সাক্ষাৎ প্রমাণ আজ পাওয়া গেল।

চট্‌কা ভাঙ্গিবার সঙ্গে সঙ্গেই ঝড়ের হুঙ্কার, জাহাজের ঝাঁকুনি, মুহূর্ত্তেই আমাদের চিত্তাকর্ষণ করিয়া আবার ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিল; আবার সেই দুর্গা দুর্গা। ঝড়-বৃষ্টি তখনও পূর্ব্ববৎই চলিতেছে। বিপদের দিনে সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে একটা অসহায় ভাব আসিয়া মনটাকে যেমন ভীত ও অবসন্ন করে, আবার অরুণোদয়ে তেমনি তাহাকে একটা নূতন আশা, নব বল দিয়া থাকে। আমরাও সেটা পাইলাম। সারেংজির গত রাত্রের সুতীক্ষ্ণ বাণীটা সকলের স্মরণ থাকিলেও প্রাতের আলোক তাহার বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিল। লোকে সাধারণতঃ বলিয়া

থাকে 'কূল' পেলে বাঁচি;"—আমরা সেই বহুবাঞ্ছিত 'কূল' তখন বুকে পিঠে দেখিতে পাইলাম।

ঝড়-বৃষ্টির প্রচণ্ডভাব সমানেই চলিতে লাগিল; বন্দরে থাকায় কেবল জাহাজের রোলিংটা তেমন মনের মত হিন্দোলরাগ আলাপ করিবার অবকাশ পায় নাই। তাই আমাদের কাজ-কর্ম্মে,—কি না—স্নানাহার ও গল্প গুজবে বিশেষ ব্যাঘাত হইল না। ইতিমধ্যে একবার আমার পরিচিত ইউরেসিয়ান্ মিস্টারটি আসিয়া হাসিতে হাসিতে গ্রীবাটা ফণা-ধরার ফ্যাশনে আন্দোলিত করিয়া বলিলেন—"হ্যালো—আমি ভেবেছিলাম দেখব—তোমরা কাঁদচো!" বলিলাম—"সে কি কথা,—তোমাদের মত সহৃদয় সহযাত্রী বেঁচে থাকতে আমাদের কান্নার কোন কারণই ত আমি ভেবে পাই না; তোমার এরূপ আশা করাই ভুল হয়েছে।" শুনিয়া তিনি হাসির সাহায্যে ও-পথটা ছাড়িয়া, গত বিভীষিকাময়ী রজনীর ঘাড়ে horrible, terrible, awful প্রভৃতি বিশেষণ চাপাইয়া চলিয়া গেলেন।

—১৪—

আমাদের আড্ডাটা অধিকাংশ সময়েই উপরের ডেকে জমিত। সারারাত্রি জাগরণের পর, আহারান্তে সকলেরই ঢুলুনি দেখা দিল। পঞ্চানন বেঞ্চে ঠেস্ দিয়া ঊর্দ্ধমুখ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বদ্ধ থাকিতে কেহই চায় না, স্বাধীনভাবে থাকিবার ইচ্ছা সকলেরই স্বাভাবিক। জাগ্রতাবস্থায় যে-দাঁতকে অনেক কষ্টে ও অনেক কষ্টে বদনমধ্যে বন্দী করিয়া রাখিতে হইত,—বেহুঁস্ অবস্থায় তাহারা প্রস্ফুটিত কুমুদের (হেলা ফুলের) মত বাহিরে আসিয়া তখন সহাস্তে

দেখা দিয়াছে! পাছে তাহা পদচারণা-প্রিয় ইউরোপীয়ান্ ও ইউ-রেসিয়ান্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও হাস্য পরিহাসের কারণ হয়, তাই পঞ্চাননকে শয্যায় পাঠাইয়া দিলাম। এইবার একটু ফাঁক পাইয়া জাহাজের ডাক্তারকে ধরিয়া উরুত্‌টার উপায় করিয়া লইলাম; তিনি টিংচার-আয়োডিন্ লাগাইয়া দিলেন।

একটু পরেই খাঁ-সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বিশেষ করিয়া বড়বাবুকে (বোসজাকে) একটি প্রমাণ সেলাম ঠুকিলেন ও আমাদের উপর সেটা সাপ্‌টাভাব একঝোঁকেই বুলাইয়া শেষ করিয়া দিলেন এবং ঐ সঙ্গে মেজাজ্ ও ভবিয়ৎ সম্বন্ধেও তত্ত্বটা লইলেন। এটি তাঁহার নিত্য কর্ম্ম ছিল;—কারণ তিনি পল্‌টনে রসদ (ration) প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয়ের Purchasing **Agent** (খরিদ-কর্ত্তা) হইয়া চলিয়াছিলেন এবং সে ক্ষেত্রে বড়বাবুরাই যে বঙ্গ-বিজয়ের বখতিয়ারের মত চীন-বিজয়ের চেঙ্গিজ্‌খাঁ, সেটা তাঁহার সাতাশ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা তাঁহাকে বিশেষ করিয়াই শিখাইয়া রাখিয়াছিল। লোকটি বয়সেও বড়, বিজ্ঞতাতেও বিশিষ্ট;—পঞ্চাশের উপর বোধ হয় পাঁচ কদম্ ফেলিয়াছিলেন। স্বধর্ম্মানুরাগী ও নেমাজী। তাঁহার হাতে পড়িয়া চাল বা চলন্, কোনটিই বেগড়াইবার বাগ পায় নাই। ফল কথা, তাঁহাতে বাহুল্যদোষ মাত্র ছিল না। সেটা নাকি পারচেজিং এজেণ্টের পক্ষে, অর্থাৎ তাঁহার পদাভিষিক্তের পক্ষে শোভন নয়, বা গুণবাচক নয়। কারণ একটা বড় রকম অভিযানের (যাহার খরচের খাতাটা ভূতের বাপের শ্রাদ্ধের হিসাবের সামিল বলিয়াই অনেকের ধারণা) ক্রয়-কর্ত্তা হইয়া যাওয়া মানে—নাকি লক্ষপতি হইয়া ফেরা, আর সেই সঙ্গে মিষ্টান্নম্ ইতরেজনাদের বিতরণ করা। তবে বড়লোক হবার যেটা রাজপথ, সে পথে চলিবার সাহস সকলের থাকে না,

এবং তাহারাই নাকি নির্ব্বোধ ও লক্ষ্মীছাড়া। আমাদের খাঁ-সাহেবের সেটা না থাকাই সম্ভব;—এই কথা লইয়া ইতিমধ্যেই আলোচনা চলিয়াছে। তাঁহার বয়স ও তাঁহার কপালে নেমাজের কালশিরাই কালস্বরূপ হইয়া এই সন্দেহটা তুলিয়াছে, এবং "খোরাকিদের" একটু নিরুৎসাহও করিয়াছে।

কিন্তু প্রত্যহ আহারের সময় যখন ডেকের উপর জাজিম পাতা হইত ও তাহার উপর বড় বড় পরাতে মোটারুটীর মহানৈবেদ্য ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাণ্ডায় দাল ও সুরুয়া আসিয়া পড়িত, এবং খাঁ-সাহেব, গুণ, অবস্থা ও পদনির্ব্বিশেষে তাঁহার সহচর ও সহধর্ম্মীদের লইয়া একত্রে আহারে বসিতেন, তাহা অপর সকল যাত্রী ও জাতিরই দর্শনীয় ও শিক্ষণীয় ছিল। সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে অধিকাংশই Menials and Followers (ছোটলোক মজুর); কেহ ভিস্তি, কেহ সইস্, কেহ কসাই, কেহ বাহক, কেহ baker (রুটিকর), কেহ খচ্চর চালক, কেহ বয়েল চালক, ইত্যাদি ইত্যাদি; তাহারা ৯৲ টাকা বেতনে চীনে চলিয়াছে। সকলেই বিভিন্ন প্রদেশাগত। সে শ্রীক্ষেত্রে পরিচিত-অপরিচিতের বাধা ছিল না—মুসলমান মাত্রেই welcome (স্বাগত); সকলকেই ডাক দেওয়া হইত। রোগী, বিকলাঙ্গ, নোংরা—সকলেই একাসনে বসিয়া একই পাত্র হইতে স্বহস্তে ভোজ্য বস্তু লইয়া বেশ সহজে ও সানন্দে গল্পাদির মধ্যে সকলের একত্রাহার সমাধা হইত। পরে একই বদ্না সকলেরই বদনে প্রবেশ করিয়া তাহাদের পিপাসা মিটাইত; পরিশেষে একই গড়্গড়ার নল, পর্য্যায়ক্রমে সকলকে এক এক টানের আরাম দিয়া, অর্দ্ধঘণ্টাকাল ঘুরপাক্ খাইয়া খাইয়া, এই নিত্য উৎসবের উপসংহার করিত। মহাপুরুষ মহম্মদোক্ত এই যে ধর্ম্মমূলক mandate (আদেশ), ইহাই আজ পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোককে এক

মহাজাতিতে, এক মহাপ্রাণে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে। এই একাসনে একই পাত্র হইতে—আহুত অনাহুত রবাহুত, ধনী দরিদ্র রোগী ভোগী, মলিন ও সৌখীনের একত্র ভোজন,—অপর কোন সুসভ্য শক্তিশালী জাতির মধ্যে আছে কি না জানিনা। অনেকে জাতিভেদকে বিদ্রূপ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু অবস্থাভেদ ও ঐশ্বর্য্যভেদকে বিলক্ষণ আঁকুড়িয়া থাকেন। আমাদের খাঁ-সাহেবের মজলিসে তাহা পাইলাম না; এই ভীষণ টাইফুনের দিনেও সেই নিত্য-নিয়মিত প্রথা অক্ষুণ্ণই রহিল। তথাকথিত হিন্দুরা কে কাহার খোঁজ রাখে! কেহ জাহাজের খানা, কেহ কাঁচা চানা খাইয়া এই দুর্য্যোগের দিনে জাতি রক্ষা করিল। সাহিত্যসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ আমাদের অভিসম্পাত করিয়া বলিয়াছেন :—

"মানুষের অধিকারে বঞ্চনা করেছ যারে"—ইত্যাদি।

আর আজ মহাত্মা গান্ধী বলিতেছেন :—

"The existence of untouchability must remain an impassable barrier in the path of our progress, which we must break down with supreme effort."

উভয়েই মহাপুরুষ,—বিপ্র সাবধান!

—১৫—

ঝড়ের বেগটা পূর্ব্ববৎ থাকিলেও আমাদের ভয়ের বেগটা শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। গল্পাদির মধ্যে এক একবার সেদিকে নজর পড়িতেছিল মাত্র। কিন্তু অকালে সন্ধ্যার আয়োজন দেখিয়া প্রাণটা কিছু দমিয়া গেল। ঠিক এই সময় মজুমদার ভায়ার ভৃত্য 'মহাদেব' একখানি গামলি হাতে করিয়া আসিয়া বলিল,—"বাবু খাচ্ছি, গরম

গরম বি আছে, কুড়্‌কুড়া বি আছে।" আমি বলিলাম—"কি খাচ্চিস্‌রে মহাদেব?" সে উত্তর করিল—"আপনি খাচ্চে,"—এই বলিয়া পাত্রটি আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিল।

এই মহাদেবটিকে দেখিয়া আমার বড়ই দুঃখ হইত। বেচারা মজুমদার-সংসারে একাদশ বর্ষ চাকুরী করিয়া, দু'কুল খোয়াইয়া বসিয়াছিল। তাহার বাড়ী গয়া জেলায়, কিন্তু দীর্ঘকাল বাঙ্গালীর বাড়ী থাকিয়া বাংলা বুলির প্রতি বিশেষ প্রীতিপরায়ণ হইয়া পড়ে। তাহাতে গয়ার বুলিও কতকটা বেহাত্‌ হইয়া গিয়াছে, এবং বাংলাটাও বাগে আসে নাই; কাজেই সে গয়ার ভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

যাহা হউক, গামলিতে হাত দিয়া দেখি,—বেসমের গরম গরম বড়া বা পশ্চিমাঞ্চলের পকুড়ি। সকলকে বণ্টন করিয়া দিলাম, দত্তকেও কতকগুলি দিয়া আসিলাম; কারণ আহার সম্বন্ধে কস্মিন্‌কালে তাঁহার আপত্তি বা অরুচি দেখি নাই। লঙ্কা জিরে পলাণ্ডু প্রভৃতি সহযোগে বস্তুটা এমন প্রস্তুত হইয়াছিল ও এমন সময়মত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল যে, সকলেই তাহা ইমন-কল্যাণের মত উপভোগ করিতে আরম্ভ করিল, পঞ্চানন পঞ্চমুখে তাহা পাচার করিতে লাগিল—তাহার অস্ত্রও সর্ব্বাংশে ও সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ছিল, সুতরাং তাহার ক্ষিপ্রকারিতার পুরস্কার দিতে সকলকেই কিছু কিছু ত্যাগস্বীকার করিতে হইল। কেবল চাটুয্যে এই শেষ ফলটা অনুমান করিয়া লইয়া নীচে সরিয়া গিয়াছিল। পকুড়ির মহিমাও মন্দ নয়, দেখিলাম। কিছুক্ষণ বেশ নিরুদ্বেগে কাটাইয়া দিল, টাইফুনের টু শব্দটি পর্য্যন্ত কেহ কাণে করিবার অবসর পান নাই।

সকলেই নিদ্রাতুর ছিলেন, রাত্রি আটটার পর চা খাইয়া শয্যা লইলেন—আহারের দিকে ঘেঁসিলেন না; কেবল দত্তজা ও চাটুয্যে

নিয়ম ভঙ্গ করিলেন না। মজুমদার ভায়া বলিল—“বাঁড়ুয্যে তুমি ত ঘুমুচ্ছনা, তেমন তেমন দেখ ত সময় থাকতে ডেকে দিও।” ঘণ্টা দেড়েক পরে চাটুয্যে আসিয়া বলিল, “ভয় নেই ত বাঁড়ুয্যে মশাই, শুতে পারি?—ঘুমুচ্চিনা।” আমি বলিলাম—“ভবে আর কি, জগদম্বা মালিক, শুয়ে পড়!” দেখিতে দেখিতে টাইফুনের তর্জ্জন ভেদ করিয়া, বোসজা, দত্তজা ও চাটুয্যের নাসিকা গর্জ্জন শ্রুত হইতে লাগিল। রাত্রি একটার পর ঝড় প্রবলতর মূর্ত্তিতে দেখা দিল, এক একবার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু যাঁহারা নিদ্রিত, তাঁহারা এই দ্বারস্থ মৃত্যুদূতের কোন সংবাদই রাখেন নাই। দুর্গা দুর্গা করিয়া তিনটা বাজিল; কাপ্তেন সাহেব ও মাল্লারা সবাই সজাগ, সকলেই ব্যস্ত। রাত্রি সাড়ে তিনটা আন্দাজ,—সে ভাবটা যেন সহসা সরিয়া গেল, তাহার পর ঝড় ক্রমশই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। নিদ্রায় সর্ব্বশরীর কাতর ও অভিভূত ত ছিলই। একটু উদ্বেগমুক্ত হইতেই, সে যে কখন্ আমাকে আপন অধিকারের মধ্যে টানিয়া লইয়াছে, তাহা জানিতেও পারি নাই।

নিদ্রাভঙ্গে দেখি, সূর্য্যদেব প্রতিরন্ধ্রে উঁকি মারিতেছেন,—উপরে মহা কোলাহল। অপার-ডেকে গিয়া দেখি, সব মূর্ত্তিই সেখানে উপস্থিত; আকাশ মেঘমুক্ত, সেই প্রবল বাত্যা সমীরণে দাঁড়াইয়াছে। জলের সে উন্মত্ত মাতুনি নাই,—অল্প আপ্সানি আছে মাত্র। ঝড়ের ভৈরব মূর্ত্তি দেখিয়া জাহাজের যে-সব যন্ত্র, আসবাব্ ও তোড়জোড় খুলিয়া রাখা হইয়াছিল, এখন তাহাদের যথাস্থানে ফিট্ (সংযুক্ত) করা হইতেছে; পালগুলি শুকাইয়া লইবার জন্য তাহাদের স্ব স্ব স্থানেই প্রলম্বভাবে মেলিয়া দেওয়া হইতেছে। কলকব্জায় চর্বি লাগান চলিয়াছে; হড়্ হড়্ ঝন্ ঝন্ শব্দে নঙ্গর উঠিতেছে;—

হুলস্থূল্ পড়িয়া গিয়াছে। কাপ্তেন, চিফ্ ও সহকারীরা খুবই ব্যস্ত,—আটটা বাজিলেই জাহাজ ছাড়িবে।

জাহাজের বাহিরে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। সেই দুর্যোগে কখন যে কয়েকখানি ঝড়-নড়া জাহাজ, আমাদের আশে-পাশে গা-ঘেঁসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, তাহা জানিতে পারি নাই। একই অবস্থাপীড়িত Strange bed companions দেখিয়া ভয় বিস্ময় ও দুঃখ হইল। কি ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি করিতে করিতে তাহারা যে বন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে, তাহা তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিলেই অনুমান করিয়া লওয়া যায়। কাহারো উপরের ছাদ উড়িয়া গিয়াছে; কাহারো মাস্তুল,—কে যেন মাঝখানে মোচড়্ দিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছে; কাহারো চিম্‌নি সটান্ শুইয়া পড়িয়াছে। কাহারো পার্শ্বসংলগ্ন জলিবোট্ কক্ষচ্যুত হইয়া গিয়াছে। একখানি ফরাসী জাহাজের হালের দিক্‌টা—হাল্ ও পতাকা সমেত নিশানদণ্ড, এবং মূল জাহাজের খানিকটা,—উপযুক্ত পুত্রের গন্ধমাদন উৎপাটনের পাল্‌টা জবাব হিসাবে স্বয়ং প্রভঞ্জন টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া গিয়াছেন! এত বড় প্রলয় শক্তি যে প্রকৃতির কোন্ প্রকোষ্ঠে প্রচ্ছন্নাবস্থায় থাকে, তাহা মানুষের ধারণার অতীত। সকল জাহাজেরই যেন ঝোড়োকাকের চেহারা,—সব সরঞ্জামই ওলট্‌পালট্ হইয়া গিয়াছে। এই দেখিয়া—দূর মহাসাগরস্থিত জাহাজগুলির পরিণাম ভাবিয়া সকলেই ভীত হইলাম। সকলেরি মনে হইল—"ভাগ্যে জাহাজ বন্দরে ছিল।" এবং সেই সঙ্গে সারেংজির পাণ্ডিত্যের প্রশংসাটা শত মুখেই চলিল! পঞ্চানন বলিল—"আমি তখুনি বলেছিলুম—বেটা বকেয়া বয়ার!"

জাহাজগুলির ত এই দশা; নাবিক ও আরোহীদের হৃৎপিণ্ডের

উপর দিয়া যে ধাক্কাগুলা গিয়াছে, তাহাতে তাহাদের হাত-পা ছড়াইয়া সপ্তাহখানেক শয্যায় শুইয়া সামলান ও বিশ্রাম লওয়াই উচিত ছিল। আশ্চর্য্য এই যে, আমাদের শয্যাত্যাগের পূর্ব্বেই, নিকবানন্দনেরা দড়ির ভারা ঝুলাইয়া, কেহ জাহাজে রং লাগাইতে, কেহ চর্ব্বি ঘষিতে, কেহ করাত হাতুড়ি লইয়া মেরামতের কাজে লাগিয়া গিয়াছে! শুনিতে পাই, আমাদেরও একদিন ছিল, আমরাও ঐরূপ ছিলাম;—বহুত আচ্ছা। কবি বলিতেছেন:—

"আসিবে সেদিন আসিবে,"—

বোধ হয়—রক্তভেদান্তে। অধুনা কিন্তু শুনিতে পাই,—শিক্ষা-নবিসীরও স্থানাভাব,— বর্গে বাধে!

—১৬—

বেলা সাতটা হইতেই চেষ্টা চলিতেছিল, পরে অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া, নানা প্রকার সুর ভাঁজিয়া, বেলা আটটার সময় জাহাজ ছাড়িল। আমরা দুর্গা দুর্গা বলিলাম; আমার ইউরেসিয়ান বন্ধুটি সদলে ও সবলে তিনবার হিপ্ হিপ্ হুররে হাঁকিলেন। জাহাজ মন্থর গতিতে পূর্ব্বমুখে চলিল। পনের মিনিটের মধ্যেই হংকং সহর পশ্চাতে পড়িয়া গেল; কেবল তৎ-সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বসতি-বিরল পর্ব্বতমালা, দুই দিনের অতিথিদের সঙ্গে সঙ্গে কিয়দ্দূর পথ দেখাইয়া চলিল।

বন্দরের অপর পারটা ইংরাজ-সেনা-নিবাস, সে দিকটায় মাঝে মাঝে ও দূরে দূরে ইতর সাধারণের বসতি দেখিলাম। এই পারটাই চীনের দক্ষিণ সীমা, এখান হইতে সোজা উত্তরেই চীনের ক্যান্টন্ সহর। পঞ্চানন বলিল—"মশাই, এখানে একটা 'ভায়া ব্রিজিসি' থাকলে কি মজাই হ'ত,—চায়না সি'তে (চীন সমুদ্র) প্রাণ হাতে ক'রে পাড়ি

যায়তে হ'ত না।" মজুমদার বলিল,—"এখানে 'ভারা'-টারার সম্পর্ক নেই পঞ্চানন, এই খুড়ো 'ক্লাইভ' (জাহাজই) বা করেন।"

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মহাসমুদ্রের সম্মুখীন হওয়া গেল। তাহাতে সোজাসুজি ঝাঁপ দিবার উপায় কাহারও নাই। মোহানার মুখেই একটি ছোটখাটো পাষাণ-স্তূপ বা পাহাড়, মাথা তুলিয়া পথটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বিরাজ করিতেছে। দেখিলেই বোধ হয় যেন—কোন্ এক অজ্ঞাত যুগে, মহাদেশ হইতে মহাদেশান্তরে শত্রু-প্রবেশের এই পথে, কোন এক দৈত্যকে প্রহরায় নিযুক্ত করা হইয়াছিল। পরে কোন এক অপরাধে অভিশপ্ত দৈত্য পাষাণে পরিণত হইয়া মুক্তির প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। অহোরাত্র অনবরত তরঙ্গাঘাতে সেই পাষাণ-পঞ্জরে কয়েকটি রন্ধ্রপথ ও একটি গহ্বর সৃষ্টি করিয়া তাহাতে উত্তাল তরঙ্গের তাণ্ডব লীলা চলিয়াছে। তাহারা রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিয়া গহ্বর-মুখ দিয়া খলখল মুখর হাস্যে মহাসাগরেই অনন্তকাল—

"তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমায়ত"

বলিতে বলিতে মহোল্লাসে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে! আনন্দময়ের এই আনন্দ-খেলার স্রষ্টাও যিনি, দ্রষ্টাও তিনি!

খানিক অগ্রসর হইয়াই মাটির জগৎ হারাইয়া ফেলিলাম! আবার সেই তরল বিশ্ব, সীমাহীন বিপুল জলরাশি। ভূগোল-পরিচয়েই পৃথিবীর পরিচয়টা পাই—তিনভাগ জল ও একভাগ স্থল। কিন্তু চক্ষে দেখিয়া মনে হয়—আমাদের পৃথিবীটি ইহার সমক্ষে বালকদের খেলিবার একটি বর্তুলের মত এবং তাহা সহজেই সমুদ্র-গর্ভে নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতে পারে। এইটিই নাকি প্রশান্ত মহাসাগরের প্রারম্ভ। শান্ত বটে, কিন্তু তাহা দেখিয়া উদরস্থ প্লীহা শুষ্ক হইয়া যায় ও চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে। তাহাতে বঙ্গোপসাগরের দুর্দান্ত

দাপট, লম্ফঝম্প—তাড়কাবৃত্তি নাই; কিন্তু তাহার গুরুগাম্ভীর্য্যই শোণিত শুষিয়া লয়। আমরা হলাম—বকুল-গন্ধামোদিত কোকিলডাকা ছায়াশীতল দেশের লোক,—আমাদের ফুরফুরে হাওয়া, ভুর্‌ভুরে গন্ধ, ফিন্‌ফিনে কাপড়, মিন্‌মিনে সুর, ফিক্‌ফিকে হাসি, ধুক্‌ধুকে বুক লইয়া কারবার; এ গাম্ভীর্য্য আমাদের মুহূর্ত্তেকে যেন চাপিয়া আড়ষ্ট করিয়া দেয়। এখানে প্রত্যেক তরঙ্গটি দীর্ঘে-প্রস্থে "উপেনের সেই দুই বিঘা!" কিন্তু কোনটিই মাথা উঁচু করিয়া চলে না, মহা বিনীত, পরম ভক্তের মত মেরুদণ্ড দেখাইয়া বেড়ায়। বোসজা দেখিয়া বলিলেন—"যেন সব অতিকায় কচ্ছপ ভাস্‌ছে।" পঞ্চানন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল—"যে-সে কচ্ছপ নয় বড় বাবু, বোধ হয় স্বয়ং কূর্ম্মাবতার এই পানিতেই ডিম্ ছেড়ে গিছ্‌লেন।" বাস্তবিক সেইরূপই বটে।

যাহা হউক, প্রশান্ত মহাসাগরের এই ভীম-গম্ভীর ভাব সত্যই প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার করিয়া আমাদের অশান্ত করিয়া তুলিতেছিল। মনে হইতেছিল, এই বিরাট ময়াল ক্ষুধা-ক্ষিপ্ত হইলে ব্রহ্মাণ্ড কবলিত করিতে পারেন। ভাবিলাম, এ-সব ভাবের মূলে আমার নার্ভস্‌নেস্‌ই (দুর্ব্বলতাই) কাজ করিতেছে! এমন সময় চাটুয্যে বলিয়া উঠিল—"বাঁড়ুয্যে মশাই, আপনার ভয় করচে না? এ সমুদ্দুরটার দিকে চাইতে ভয় করে।" আমি বলিলাম—"চেয়ে কাজ কি।" বোসজা বলিলেন,—"গাম্ভীর্য্যটাও যে এত বড় awful (ভয়ানক) জিনিষ তা জানতুম না।" আমি বলিলাম—"জান্‌তেন্ বই কি, মনে পড়ছে না।" বোসজা বলিলেন—"আপনাদের কথা বুঝতে দুনিয়া খুঁজতে হয়।"

এই সময় আহারের ঘণ্টা পড়িল, ক্রমে পেটেও কিছু পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বভাবের পরিবর্ত্তনও দেখা দিল। যত বিভীষিকার বীজ

এই পেটে; পেট খালি থাকিলে সে খেলাইবার স্থান পায়। স্বদেশী আমলের বড়লাট কর্জ্জন সাহেব তর্জ্জন করিয়া সার রাসবিহারী ঘোষ মহোদয়কে বলিয়াছিলেন—তোমাদের জন্য আমি এত করি, তবু দেশের লোক সন্তুষ্ট নয়! তাহাতে সার ঘোষ মহোদয় বলেন—**My Lord, hunger is the worst counsellor**—হুজুর পেটে যে অন্ন নেই! ক্ষুধাই কুমন্ত্রণা দেবার ভাঙ্গা-মঙ্গলচণ্ডী! দেখিলাম—পেটে কিছু পড়ায় প্রশান্ত মহাসাগরের বিভীষিকাময় প্রকোপ অনেকটা পাতলা হইয়া পড়িল। তখন অন্যান্য প্রসঙ্গ সহজেই পথ পাইল। দিনটা মামুলি ভাবেই কাটিয়া চলিল।

—১৭—

এই অবকাশে একটা অন্য বিষয় সারিয়া রাখি। এই যে Follower (ফলোয়ার) বা সহচর-শ্রমিক নামক জীবগুলি চীন-অভিযানের সঙ্গী হইয়াছে, ইহাদের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। সকলেই জানেন—ভৃত্যেরাই বড়লোকদের হাত-পা। একদিন যদি পাচক, চাকর, দাসী, কোচম্যান, খানসামা, কি মেথর না আসে, ত সংসার অচল, আর বাবুয়ানা কাণা হইয়া পড়ে। যুদ্ধাদি অভিযানক্ষেত্রে ফলোয়ারেরাই সেই হাত-পা। যুদ্ধ করাটি ছাড়া অফিসার্ ও গোরাদের আহারের আয়োজন হইতে আনুষঙ্গিক সকল ব্যবস্থাই ইহাদের অপেক্ষা করিয়া থাকে। ইহারা না থাকিলে গোরাদের হাতের হাতিয়ার অচল হইত। আমাদের গ্রামের জনৈক বিশিষ্ট বড় লোকের বাড়ীতে রোস্‌কে হাড়ী বলিয়া একজন মাইনে-করা মেথর নিযুক্ত ছিল। পান-দোষটা রসিকের বরাবরই অভ্যাস। একবার ঝোঁকের মাথায় সে তিন্ তিন্ দিন পানেই মত্ত থাকে। বড় লোকের বড়-সংসার—অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। কিন্তু

রসিক রসোন্মত্ত; দরোয়ানের ধমক্ তাহার চমক্ ভাঙ্গাইতে পারিল না। চতুর্থ দিন যথাসময়ে রসিক আসিয়া হাজির। বাবু চটিয়া এই মারেন ত এই মারেন। রসিক তখনো সরস; সে হাত জোড় করিয়া বলিল,—"রসিককে ছোঁয়া যার তার কাজ নয় প্রভু, এমন ভদ্রলোক ত দেখতে পাই না; কেন মিছে মাথন-খেগো মাথাটা গরম করচেন? আমি ত বারমাস তিরিশ দিন ময়লা সাফ করে আস্‌ছি, হুজুর দয়া করে তিনটে দিন আর চালিয়ে নিতে পারেননি! যান্ তামাক খানগে।—যার জোড়া মেলে না, তার কি অপরাধ নিতে আছে প্রভু,—বড়লাট একজনই থাকে!" গ্রামের মিউনিসিপালিটি তখনো এ জিনিষটি মাথায় করেন নাই।

ফলোয়ার্‌গুলিও, স্বভাবে ও সামর্থ্যে সেই রসিক। ইহাদের মধ্যে মেথর, মুচি, ধোপা, ছুতার, কামার, কসাই, বাবুর্চি, রুটিকার (বেকার), Muleteer (খচ্চর-সওয়ার), টেণ্ট্‌ লশকর্, ভিস্তি, মায় ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান। ইহাদের কাজকর্ম্ম বা জাতির কথাটাই বড় কথা নয়; বিশেষত্বটাই বলি। ইহাদের মধ্যে Permanent servant (পাকা চাকর) কেহই নয়; যুদ্ধের গন্ধ পাইলেই ইহারা হাজারে হাজারে আসিয়া জমায়েৎ হয়। কাজ পড়িলেই ইহাদের ডাক্ পড়ে; কারণ বারমাস এত কুপোষ্য পোষা সরকারের পক্ষে সহজ নয়। এ ছাড়া, Normal বা Peace condition-এর (শান্তির অবস্থার) বারমেসে লোকও আছে। এই যে জীবগুলি, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই Second Kabul War (দ্বিতীয় কাবুল অভিযান) হইতে, বংশাবলীক্রমে লড়ায়ের লোভে লালায়িত হইয়া আছে। তাহার কারণ, ইহাদের বাপ খুড়ারা সম্ভবতঃ নিজেদের পক্ষের হতাহতদের পকেট মারিয়া মানুষ হইয়া ফিরিয়াছিল। ডুলিবাহক, ষ্ট্রেচারবাহক ও ভিস্তিদের লড়াই-লাইনের খুব নিকটেই থাকিতে হয়। হতাহতদের তৎক্ষণাৎ সরানো বা হাঁসপাতালে লইয়া

যাওয়া এবং পিপাসিতদের জলখাওয়ানই ইহাদের কাজ। কোন কোন "কাহার"কে বা ডুলিবাহককে গল্প করিতে শুনিয়াছি—তাহার বাপ 'চিত্রাল' অভিযান হইতে আংটি, ঘড়ি, চেন, গিনি, টাকা ও নোটে দশ-বার সের লইয়া ফিরিয়াছিল। খুড়ো বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে সে আজ তালুকদার হইয়া বসিত। কেহ বলিতেছে—তাহার বাপ 'টিরা' অভিযানে গুলি লাগিয়া মারা যায়! মৃত্যুকালে সম্বন্ধী উপস্থিত ছিল; গলা হইতে গিনি-ভরা বটুয়া, আর কোমর হইতে আংটি আর চেন্ ভরা গেঁজে খুলিয়া তাহার হাতে দিয়া, আমাকে দিবার জন্য শপথ করাইয়া লয়। বেইমান আমাকে তিনখানি গিনি আর দুইটি আংটি মাত্র দিয়াছিল। তাহাদের সে ঝগড়া এখনো চলিতেছে; পঞ্চায়ৎ মিরাট হইতে বুদ্ধু-কাহারকে তলব করিয়াছে,—সে সে-সময় উপস্থিত ছিল; ইত্যাদি।

ফল কথা,—হতাহতদের পকেট পরিষ্কার আর লুটে লক্ষপতি হইবার পরোক্ষ প্রত্যাশা ছাড়া প্রত্যক্ষ লাভটাও ইহাদের পক্ষে কম লোভনীয় নহে। বিনা ব্যয়ে পর্য্যাপ্ত আহার, সরকারী উর্দ্দী (অর্থাৎ—কোট, কামিজ, পাজামা, পাগ্‌ড়ি টুপি, ওভারকোট, কম্ফটার, জুতা মোজা, দুখানা কম্বল, ইত্যাদি); তদ্ব্যতীত দেড়া মাইনে,—সেটা সম্পূর্ণই জমার খাতে থাকিবার কথা,—কারণ বাজার না থাকায় বাজে ব্যয়ের বালাই নাই। কাজের সময় খাটুনি আছে বটে, সেটা নিত্য নয়; অধিকাংশ সময়টা গান, গল্প, গুড়ুক আর সুবিধামত নেশা-ভাং!

কেহ বলিতে পারেন,—প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বস্তু আর কি আছে, সেই প্রাণইত সর্ব্বক্ষণ শমনকে উৎসর্গ করিয়া রাখিতে হয়। সে চিন্তাটা তাহাদের নাই বলিলেই হয়; তাহার তিনটি কারণ আছে। প্রথম, ফলোয়ারমাত্রকেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে হয় না; তাহাদের

অধিকাংশকেই পাঁচ সাত মাইল পশ্চাতে base-এ (প্রধান আড্ডায়) থাকিতে হয়। দ্বিতীয়, সৈন্য নির্ম্মূলান্তে সহচর-সাফাই, এমন সময় তাহাদের জ্ঞানে ইংরাজের আমলে ঘটে নাই; Doctor Brydon-(ডাক্তার ব্রাইডন্) মুখ-নিঃসৃত doleful (খেদাত্মক) কাহিনীও তাহারা ইতিহাসে পড়ে নাই। আর তৃতীয়, অভাবে স্বভাব নষ্ট; কি ঘটিবে না ঘটিবে, বা কি ঘটিতে পারে, সে-সব চিন্তা সম্বন্ধে তাহারা বেজায় বে-পরোয়া। তাহারা প্রত্যেকেই এক একটি অবতার বিশেষ, এমন মন্দ কাজ নাই, যাহা করিতে তাহারা পশ্চাৎপদ,—কেহ জেল-খালাসী, কেহ গাঁয়ের terror-(আতঙ্ক) স্বরূপ। সকলেই মোড়ল, সবাই সবজান্তা, প্রত্যেকেই ওস্তাদ্;—লড়ায়ে যাওয়াটা তাহাদের সখ বা নেশা এবং বড়ায়ের বস্তু।

অভিযান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনান্তে ইহারা দিনকতক ভাল খায়-দায়, কাঁসি বাজায়, আর মাতব্বরি করিয়া বেড়ায়; তখন বেশ দিল্-দরিয়া মেজাজ। ক্রমে প্রাপ্ত পোষাক পরিচ্ছদ বিক্রয়ান্তে ঋণগ্রস্ত হইয়া পুনর্মূষিক হয়। কিন্তু প্রাণটা ষোল আনাই লড়ায়ের প্রত্যাশায় পড়িয়া থাকে। শকুনীরা সুদূর আকাশ হইতে একবার ভাগাড়গুলা দেখিয়া লয়—কোথাও কিছু আছে কিনা; ইহারাও সেইরূপ সুদূর হইতে, প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার কোন cantonment-এর (সেনা-নিবাসের) আপিসে, লাইনে বা রেজিমেণ্টে সংবাদ লইতে আসে—কোথাও লড়ায়ের সম্ভাবনা আছে কিনা, অন্ততঃ কতদিনে সম্ভব! সামান্য একটু আশ্বাস পাইলে আনন্দের পরিসীমা থাকে না। নিজেরাই তখন বলে—"কোই না আওয়ে তো—রুশ তো জরুর আওয়েগা; জার্ম্মানী ভি তৈয়ার হো রহা হ্যায়। আরে ভাই,—আফ্রিদি জিতা রহে তো—জল্‌সা লাগাই রহেগা;"—ইত্যাদি।

ইহাদের মধ্যে এই আলোচনাই সর্ব্বক্ষণ চলিয়া থাকে এবং ইহাতেই পরম আত্মপ্রসাদ অনুভব করে।

হুজুগ্, রগড়্ আর মজায় মস্গুল্ থাকাই ইহাদের জীবনের চরম লক্ষ্য। পেটে অন্ন নাই, কিন্তু পাগ্ড়ির মধ্যে ও কানে সর্ব্বদাই রেড-ল্যাম্প্ সিগারেট্ গোঁজা আছে; তাহা নেশার ফাউ হিসাবে চলে! ইহাদের মধ্যে শতকরা পাঁচ-সাত জন মাত্র—সত্যই পেটের দায়ে, আর সংসার প্রতিপালনার্থ, যুদ্ধযাত্রার সঙ্গী হয়। তাহারা প্রায়ই নিরীহ ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য এবং তাহাদের লাঞ্ছনার অবধি থাকে না। সরকারী কাজ ছাড়া ঐ-সব জাল-ছেঁড়া পোলো-ভাঙ্গাদের খিজমত্ খাটিতে ও তাঁবেদারী করিতে, আর মন জোগাইয়া চলিতে তাহাদের প্রাণান্ত হয়। ফলোয়ার্-রূপী জীবগুলির পরিচয়—সংক্ষেপতঃ এই।

কিন্তু চীনযাত্রা সংস্রবে এবার তাহাদের বহু নূতনত্ব আছে; কারণ এবার লীলাক্ষেত্রটা ভারতের বাহিরে,—কাজেই তাহাদের প্রচুর সরঞ্জামে পা বাড়াইতে হইয়াছে। অন্যান্য ব্যবস্থার সহিত সরকার বাহাদুর কেবল মামুলি তামাকের ব্যবস্থাই করিয়াছেন,—চরস্, গাঁজা ও ভাংয়ের কথাটা সরকারী সুবুদ্ধিতে জোগায় নাই! ইহারা সে-ভুলটা সম্যক্রূপেই সুধরাইয়া চলিয়াছে। এবার—গাইয়ে, বাজিয়ে, নাচিয়ে, ভাঁড় (রহস্যকার), জমায়েতভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে! মন্দিরা, খঞ্জনি, ঢোলক্, তবলা, বাঁয়া, হুডুক্, ঘুমুর, সারেঙ্গী,—কিছুরই অসদ্ভাব দেখিলাম না,—রামরাজ্য বলিলে হয়!

জাহাজের নাবিক ও ভৃত্যদের মধ্যে চাট্গাঁয়ের মুসলমান ও গোয়ানিজ্ এই দুই জাতিই ছিল। দেখি—এই শ্রীমান্ ফলোয়ারেরা ডেক্-প্যাসেঞ্জার হইলেও এক আদ্ পাপ্ড়ি গাঁজা ছাড়িয়া সকল

সুবিধাই করিয়া লইয়াছে,—বরফ্ লিমনেড, এমন কি বিয়ারও চলিয়াছে। গাঁজার মহিমা অতলস্পর্শের বক্ষেও ফুটিয়া উঠিয়াছে!

সরকার-নিযুক্ত এই রণযাত্রার রংমহলের এক প্রকার প্রধান পাত্র ছিলেন "আবদুল্লা"; ইনি খাস্ লক্ষ্ণৌয়ের আমদানী—চতুর-চূড়ামণি, রহস্তরসিক ও অনুকরণ-বিদ্যা'-বিশারদ। আকার-প্রকার ভাবভঙ্গীতে, ছিপ্ ছিপে ও ছুঁচোলো—খাঁটি-রজার্-মেকার্! এক দিনেই সে একটা সহর-শুদ্ধ লোকের পরিচিত হইবার ক্ষমতা রাখে।

—১৮—

সন্ধ্যার পর আমাদের চায়ের বৈঠক্ বসিয়াছে, দত্তজাও উপস্থিত আছেন। তিনি যে কেবল বক্তৃতায় চা'পানের বিরোধী ছিলেন তাহাই নহে, বাড়ীতে চায়ের চিহ্নমাত্রও রাখিতেন না। পরের ধন বলিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক,—অধুনা জাহাজে ওটা আহার হিসাবেই গ্রহণ করেন—পরিমাণও ভোজনানুরূপ! (তখন দেশে—"চা পান করিলে হয় তৃষ্ণা নিবারণ" ইত্যাদি লিপ্‌টন্ সাহেবের চতুর্দ্দশপদীর পদার্পণ ঘটে নাই, নচেৎ দত্তজা কখনই বাড়ীতে সাহেবের কথার অবমাননা করিতে পারিতেন না।)—আমাদের চায়ের মজলিস্ চলিয়াছে, এমন সময় আবদুল্লা আসিয়া খুব আদব-কায়দা-দুরস্ত অভিনব অভিবাদন নিবেদন করিয়া বড়বাবুকে বলিল—"হুজুর কদরদান্ হাঁয়, গুস্তাকি মাফ কিজিয়ে—হুকুম্ হোয়ে তো আজ কুছ দেখায়েঁ—শুনায়েঁ।" আবদুল্লার উপর দত্তজার বিষদৃষ্টি ছিল। আবদুল্লার কথায় হাড়ে চটিয়া চাপা গলায় 'রাস্কেল্' বলিয়াই তিনি মুখ ফিরিয়া বসিলেন। আবদুল্লার এই অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে বোমজা বড়ই ফাঁপরে পড়িয়া তাড়াতাড়ি খুব মোলায়েম্ সুরে

বলিলেন—"আবদুল্লা, আজ আমার শরীর ভাল নেই, এখুনি শোব ভাবছি, আজকে থাক্ বাবা। তুমি দুঃখিত হয়োনা, চীনে পৌঁছে যত পার শুনিয়ো;—আমার এসব শোনবার খুব সখ আছে।" ইত্যাদি বলিয়া অবদুল্লার নিকট রেহাই পাইলেন ও তাহাকে বিদায় করিয়া বাঁচিলেন। বুঝিলাম—বোসজার যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। আমিও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলাম, বাঁচিলাম। বোসজা তখন হাসিয়া বলিলেন—"আমাকে আজ সকাল সকাল শুতেই হবে!" শুনিয়া দত্তজা উত্তেজিত ভাবে বলিলেন—"আপনি ঐ beastকে (পশুটাকে) ভয় করেন নাকি? বেটাকে হাঁকিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।" বোসজা বলিলেন—"শুধু আমরা নয় দত্ত, স্বয়ং যম ভয় করেন, ওদের ঘাঁটাতে নেই।"

যাহা হউক্ এই শ্রেণীর জীব বাংলা দেশে বিরল। গৌরব কি অগৌরবের কথা—ঠিক বলিতে পারি না,—কিন্তু বঙ্গদেশ হইতে আজিও কেহ ফলোয়ার্ বা কুলি হইয়া, কোন অভিযানের সহিত গিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। হইতে পারে—তাহাদের তেমন অন্ন-কষ্ট নাই; হইতে পারে—তাহারা তেমন adventurous (ডান্‌পিটে) নহে, বা অপেক্ষাকৃত ভীরু; হইতেও পারে—বঙ্গদেশের ইতর-সাধারণের আত্ম-সম্মান জ্ঞানটা একটু সজাগ, কারণ বাংলাদেশের মুটে-মজুরকেও ইহাদের "মেড়ো" বলিয়া উপেক্ষা ও উপহাস করিতে শুনিতে পাই। যে কারণেই হউক, বাংলার ইতর-সাধারণ ও শ্রমিকেরা আজিও অতটা চরিত্রহীন হইবার সুযোগ পায় নাই।—বাঙ্গালী-রেজিমেণ্ট থাকিলে সম্ভবতঃ ইহাদেরও ফলোয়াররূপে দেখিতে পাইতাম। উনপঞ্চাশের উমেদারি-উপসর্গটা উবিয়া গিয়া সে বালাই ঘুচিয়া গিয়াছে।*

---

* Dr. S. K. Mullick's No. 49 Bengali Regiment.

গত জর্ম্মান-যুদ্ধে উক্ত মূর্ত্তিমানেরা নিশ্চয়ই ফলোয়ার্‌রূপে গিয়া থকিবে। এই ফকড়েরা ফ্রান্সে যে কি ফার্স অভিনয় করিয়াছে, ও ভারতের কি পরিচয় রাখিয়া আসিয়াছে, তাহা অবশ্যই কেহ না কেহ লিপিবদ্ধ করিবেন। তবে এটা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, ফরাসী-ফলোয়ার্‌দের মধ্যে ইহারা অন্ততঃ দশ-বিশজনকেও গেঁজেল না বানাইয়া ফেরে নাই।

—১৯—

কখন্ যে সেই প্রলয়-পয়োধি—বিশ্বের বিরাট ঐশ্বর্য্য-প্রশান্ত মহাসাগর সরিয়া গিয়াছেন, তাহা জানিতেও পারি নাই! প্রাতে দেখি—ইনি ত তিনি নন্, এ-যে দেখি শ্যামা সুনীলবরণা! সে বিশ্বগ্রাসী বারিধির চিত্ত-বিহ্বলকারী গাম্ভীর্য্য কোথায়! এ-যে গায় পড়িয়া ঝগড়া করিতে আসে! তরঙ্গগুলি বঙ্গোপসাগরের অনুকরণেচ্ছু, কতকটা তাঁহারই cheap edition (সস্তা সংস্করণ);—ইনিই Chinese Sea বা চীন সমুদ্র।

আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার। অনুকূল বায়ু পাইয়া পাল তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বায়ু ও বাষ্প সাহায্যে জাহাজও দ্রুতবেগে চলিয়াছে, দুরন্ত তরঙ্গ তাহার গতিভঙ্গ করিতে পারিতেছে না। কলের জাহাজে (Steamship-এ) পাল তোলাটা নিত্য কর্ম্মের মধ্যে নহে, তাহা অনুকূল বায়ুর অপেক্ষা করে; এই ২২।২৩ দিনের মধ্যে ৫।৭ দিন মাত্র পালের সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

প্রকৃতির প্রভাব এত সুস্পষ্ট যে, আকাশটা স্বচ্ছ পাইয়া সকলের মনগুলাও আজ যেন স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় দিতেছে। ইউরেসিয়ান group (দল) শিস্ দিয়া বেড়াইতেছে; মাঝে মাঝে পেণ্টেলুনের পকেটে

হাত পুরিয়া ডিঙ্গি মারিয়া মোড় ফিরিতেছে—কেহ সুর তুলিয়া দু'পা নাচিয়াও ফেলিতেছে, সকলের মুখেই হাসি ফুটিয়াছে; অনেকেই গুণ্ গুণ্ রব তুলিয়াছে; জাহাজ যেন আজ মধুচক্র! আমাদের লক্ষ্ণৌয়ের আবদুল্লা ভৈরবী ধরিয়াছে—"মো-রি নেইয়া পা-রে লাগা"। সময় সুর ও ভাবের সম্মিলনে অনেকেরি কাণে ও প্রাণে টান পড়িয়াছে। এই—মেঘ বৃষ্টি, বজ্র বায়ু ও কুয়াসার রাজ্যে, বাস্তবিকই এমন দিন অল্পই আসে।

স্নানান্তে জলযোগ ও চা-পান সারিয়া উপরের ডেকে বসিয়া কথাবার্ত্তা চলিয়াছে; এমন সময় চাটুয্যে আসিয়া তাহার হাত দেখিবার জন্য মজুমদারকে ধরিয়া বসিল। মজুমদার বুঝিল, এ পঞ্চাননের কাণ্ড। সে কোনরূপ প্রশ্ন বা ইতস্ততঃ বা ওজর না করিয়া অতি সহজ-গম্ভীর ভাবেই বলিল,—"দেখ চাটুয্যে, যদি হাসি-তামাসার কথা না হয়—যথার্থই কিছু জানতে চাও ত বাঁড়ুয্যেকে হাত দেখাও। আমি ওঁরই কাছে দু'চারটে রেখা সম্বন্ধে কিছু শুনেছি মাত্র,—সে বিদ্যেতে কারুকে কিছু বলা চলেনা ভাই, উচিতও নয়।" কথাগুলি মজুমদার এমনভাবে বলিল যে তাহার উপর চাটুয্যেরও কথা চলে না, আমারও অব্যাহতি মেলে না, কাজেই অবস্থাটা অনুমান করিয়া লইয়া, চাটুয্যে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তাহার হাতটা টানিয়া লইয়া বলিলাম,—"দেখি"। চাটুয্যে মহা খুসী হইয়া বলিল—"বাঁড়ুয্যে মশাই জানেন—তবে আর কি!" পঞ্চানন বলিল—"কেন? উনি কি বলবেন—তুমি রাজা হবে!" চাটুয্যে বলিল—"না, তা কেন, তাহলে যখন তখন"—কথা শেষ করিতে না দিয়াই, পঞ্চানন বলিল—"হ্যাঁ, তা বটে, আয়েসার হাত কিনা, উনি যখন-তখন না-দেখে থাকতেই পারবেন না। 'হাত ত নয়'—কর-কুষ্টকমল, যেন এক ছড়া কাঁচ্‌কলা পোড়া!"

পঞ্চাননের জন্য মধ্যে মধ্যে সকলকেই মহা অশোভন অবস্থায় পড়িতে হইত, এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল,—বড়বাবু পর্য্যন্ত বেসামাল হইয়া পড়িলেন। চালা ঘরে আগুন লাগিলে বাঁশের গাঁটগুলো যেমন মাঝে মাঝে সশব্দে ফাটে, হাসিটাকে চাপিতে গিয়া সেটাও মধ্যে মধ্যে নানা স্বরে ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল। আমার অবস্থাটা বলিতে চেষ্টা করা অপেক্ষা বুঝিয়া লইতে বলাই ভাল। একটু ক্রুদ্ধভাবে পঞ্চাননকে বলিলাম—"তুমি উঠে যাও ত, সামুদ্রিকটা ঠাট্টা-তামাসার সামগ্রী নয়।" সে বলিল—"মাপ্ করুন্, আর আমি একটি কথাও কইব না।" পঞ্চাননের বিদ্রূপটা চাটুয্যেকে বড়ই বাজিয়াছিল, সে একটু চুপ্ করিয়া থাকিয়া বলিল—"উঃ, নিজে কি কাশ্মীরী কানাই!" চাটুয্যের মুখে এই অপ্রত্যাশিত পদটি পাইয়া আমরা সকলে আশ্চর্য্য ত হইলামই, পরন্তু, অবস্থাটা সামলাইয়া লইবার জন্য ততোধিক হাসিলাম ও বাহবা দিলাম এবং বলিলাম—"খুব বলেচ চাটুয্যে,—'বিলিতী বলরাম' বলতেও পার।" তাহাতে চাটুয্যের নির্ব্বাণোন্মুখ উৎসাহটাকে ফিরিয়া পাওয়া গেল; নচেৎ আমার সামুদ্রিক বিদ্যাটা আজিকার মত সমুদ্রেই ডুবিয়াছিল। আর অধিক বাড়াবাড়ির অবসর না দিয়া বলিলাম—"আহারের পর বারবেলা পড়ে যাবে, এখন অমৃত যোগ যাচ্ছে—তার গা ঘেঁশে রয়েছেন সুতহিবুক, শুক্রও গোচরে আছেন, এই সময় দেখাই ভাল।" চাটুয্যে তাড়াতাড়ি বাঁ-হাতটা বাড়াইয়া দিল! তার বহুভাগ্য যে পঞ্চানন সেটা লক্ষ্য করে নাই।

একটা কথা পূর্ব্বে বলা হয় নাই; মূর্ত্তিটা সম্পূর্ণ বিরোধী হইলেও, চাটুয্যের কথাবার্ত্তা ও স্বভাবে কতকটা মেয়েলিভাব ছিল। "ওমা!" —"কি হবে মা!" "মুখপোড়া", প্রভৃতি মহিলাসুলভ শব্দ সে সর্ব্বদাই

ব্যবহার করিত। আমি সত্বর তার ডান হাতটা টানিয়া লইয়া নিবিষ্ট হইয়া পড়িলাম। দেখার ত কোন প্রয়োজনই ছিলনা, প্রয়োজন ছিল নিজের ফাঁড়া কাটানোটা। চাটুয্যের 'চেটোর' প্রতি চাহিয়া, চক্ষু দেখিল—কোম্পানির আমলের সেই সিংহাদির আস্ফালিত লাঙ্গুল আর পদাদি পল্লবিত একটি ডবল পয়সার মক্স! জমিটা তাম্রবর্ণ, আর রেখাগুলি কৃষ্ণাভ। কখন একাগ্র, কখন তীব্র দৃষ্টির পর, ভ্রূদ্বয় কপালে তুলিয়া বলিলাম—"একি, মস্ত বড় জলে ডোবার ফাঁড়া যে! কেটে গেছে ত!" চাটুয্যে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"সে—পুনর্জ্জন্ম বল্লে হয়,—ঘোষালদের পুকুরের ওপারে একটা শজনেগাছ ঝুঁকে পড়েছিল; শজনে খাড়া পাড়তে গিয়ে ডাল ভেঙ্গে গভীর জলে একদম্ তলিয়ে গিছলুম। সাঁতার জানি না, একেবারে পাঁকে গিয়ে ঠেকি!" পঞ্চানন ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিল—"কেউ আবার তুল্লে নাকি?" শুনিয়া ভাবিলাম—আবার কি ঘটায়। চাটুয্যে কিন্তু সহজ ভাবেই উত্তর করিল,—"নিমে কাওড়ার বউ ভাগ্যিস্ দেখতে পেয়েছিল, সে ছুটে এসে অনেক কষ্টে তোলে।" এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই নিতান্ত নারাজ ভাবে "হা—রাম্-জাদি!" বলিয়াই পঞ্চানন উঠিয়া গেল। কথাটার ভাবগ্রহণে বাধা দিয়া আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম—"দেখে আমি বড় ভয় পেয়েছিলুম চাটুয্যে; ও মারাত্মক ফাঁড়াটা যদি পুকুরেই কাটিয়ে না আসতে, তা হলে সকলকেই আজ ফাঁশিয়েছিলে আর কি; এই অকূল সমুদ্রে ওটা সকলকেই মাথা পেতে নিতে হ'ত। সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মতে—সঙ্গের প্রভাব বড়ই প্রচণ্ড, ওতে 'সঞ্চারীগ্রহ সঙ্গম' অনিবার্য্য; তখন বিপদটার সঞ্চার সকলের মধ্যেই সমান ভাবে হয়। যেমন নিজে চুরি না করলেও, চোরের সঙ্গে থাকলেই সমান সাজা ভোগ করতে হয়,—যাক্ ভগবান রক্ষে করেছেন।" এই সময় মধ্যাহ্ন-ভোজনের ঘণ্টা পড়িল, আমি বাঁচিলাম।

কেবল চাটুয্যের প্রীত্যর্থে বলিলাম—"এসব বিষয়ের আলোচনা প্রাতে শুদ্ধচিত্তে করাই প্রশস্ত, পঞ্চাননের মত অবিশ্বাসীর সামনে একেবারেই নিষিদ্ধ। চীনে না পৌঁছুলে একান্ত হতে পারব না, সেই সময় দেখিও।" চাটুয্যে আমার বিদ্যাবত্তায় আশ্চর্য্য ত হইয়াইছিল, এখন সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—"সেই ভাল বাঁড়ুয্যে মশাই, ও অমামুকোর সামনে আর নয়।" বড়বাবু গম্ভীরভাবে কথাটা অনুমোদন করিয়া বলিলেন—"শাস্ত্রীয় বিষয়ে তা' করাও উচিত নয়।" তখনকার মত আসর ভাঙ্গিল। দত্ত কিন্তু আমাকে একান্তে পাইয়া বলিল—"তোমার যে Chiromancy জানা আছে তা জানতুম না—আমার হাতটাও একদিন দেখতে হবে, কারুর সামনে কিন্তু নয়। ও সায়েন্সটায় আমার বিশ্বাস আছে।" আমি একটু হাসিলাম মাত্র। দত্তর মত লোকের কাছে আমি এটা আদৌ আশা করি নাই।

—২০—

জাহাজে পদার্পণ করিয়া পর্য্যন্ত রাজনীতি চর্চ্চাটাও চলিয়াছিল; মধ্যাহ্ন-ভোজনান্তে ঘণ্টা দুই শয্যা লওয়া যাইত, আজও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বেলা তিনটার পর পঞ্চানন ব্যস্তভাবে আসিয়া সংবাদ দিল—"সুবিধে নয়, উঠে পড়ুন; আকাশ আর বাতাসের আয়োজন দেখে বোধ হচ্ছে একটা বড় রকম কিছু আসছে; ওপরে হৈ চৈ পড়ে গেছে।"

পঞ্চাননের কথায় হঠাৎ কেহ প্রত্যয় করিয়া ঠকিতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু চাহিয়া দেখি যেন সন্ধ্যা উপস্থিত; জাহাজও গা-নাড়ার রিহার্সেল্ আরম্ভ করিয়াছে। এই ভাবটা নিদ্রোত্থিতের প্রাণে সহসা ও সহজেই একটা ভয়ের ছায়াপাত করিল। সেই অসংযত অবস্থাতেই সকলে সত্বর উপরের ডেকে গিয়া উপস্থিত হইলাম। যাহা

দেখিলাম তাহাতে ত্রাসে তটস্থবৎ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মাথার উপর স্তরে স্তরে, স্তবকে স্তবকে

"দানবী এলায় তার মেঘময় বেণী।"

চপলা ছুটাছুটি করিয়া আকাশকে ফালা-ফালা করিয়া চিরিতেছে, আর মুহুর্মুহু গুরু গর্জ্জন! বায়ুর গতির মতিস্থির নাই, প্রবল ঘূর্ণীর মত এক একবার সাড়া ও নাড়া দিয়া যাইতেছে; বৃষ্টি আসন্ন। নীচে সমুদ্র রুদ্রমূর্ত্তিতে সাজিতেছেন। জাহাজের উপর মানুষের শিক্ষা ও সামর্থ্য মত সময়োচিত সাবধানতা অবলম্বিত হইতেছে। উপরের ক্যাম্বিসের ছাত তুলিয়া ফেলা হইয়াছে, কল-কব্জা ভাল করিয়া কসা হইতেছে, কোথাও শক্ত বাঁধন দেওয়া হইতেছে। ইঞ্জিনিয়ার্ সাহেব স্বয়ং পরীক্ষায় ও পরিদর্শনে ব্যস্ত।

সকালে স্বচ্ছ আকাশ ও অনুকূল বায়ু পাইয়া যে পাল তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিব, বৈকালে সহসা বিপৎসঙ্কুল প্রতিকূল বায়ুর আবির্ভাবে সত্বর সেই পাল গুটাইবার জন্য সকলেই শশব্যস্ত। এ-ত আর পান্সির পাল নয় যে, যে-কেহ তাহা একাই মাস্তল সমেত তুলিয়া সামলাইয়া নিশ্চিন্ত হইবে। যিনি যত বড়, তাঁর বিপদ আর ঝঞ্ঝাটও তত বড়। এঁরা একখানি যেন জটায়ুর ডানা। দেখি, সেই ঝড় ও আসন্ন বিপদের মুখে বোধ হয় বিশ জন লোক—কেহ দড়ির সিঁড়ি বাহিয়া, কেহ রশি ধরিয়া, সেই অভ্রভেদী মহাদ্রুমে যাত্রা করিয়াছে,—মহাযাত্রা বলিলেই ভাল হয়। এই সঙ্কটসঙ্কুল কাজটির জন্য boyএরাই (ছেলে ছোকরারাই) অধিক উপযোগী। "ডান্‌পিটে" আখ্যাটা এস্থলে পূরো প্রশংসাবাচক ও গৌরবাত্মক! জাহাজ ঘন ঘন পাশমোড়া লইতে আরম্ভ করিয়াছে; মাস্তলগুলি এক মুহূর্ত্তও আর যথারীতি সমকোণের উপর থাকিতেছে না,—স্থূল ও সূক্ষ্ম কোণই টানিতেছে। ভাব দেখিয়া

মনে হয়, ক্রমে সমুদ্র-চুম্বনের চেষ্টা পাইতে পারে। এই অবস্থায় নাবিকেরা কিন্তু মাস্তুলের বাহুর উপর উঠিয়া পা ঝুলাইয়া বসিয়াছে ও দড়ি টানিয়া ভাঁজে ভাঁজে সেই অতিকায় পালগুলিকে ধীরে ধীরে গুটাইয়া সংক্ষেপ করিয়া আনিতেছে! সন্নিকটে পাইবামাত্র সেই বাহুদণ্ডে বুক এবং শূন্যে হস্তপদ, এই অবস্থায় প্রবল ঝঞ্ঝার মধ্যে, জল হইতে ন্যূনাধিক ৬০ ফিট্ ঊর্দ্ধে, সেই ভীষণ পালগুলিকে,—যথাসম্ভব নয়, যথারীতি সুসংযত ও শোভন করিয়া গুটাইয়া বাঁধা আরম্ভ হইল! এই ব্যাপার অতিবড় সাহসীর পক্ষেও স্থিরচিত্তে দেখা সম্ভব নয়। এমন সময় "বেয়নেট চার্জ্জ" বা শর-নিক্ষেপের মত সবেগে বৃষ্টিধারা আসিয়া পড়িল। একে ত মাস্তুলের উপর মানুষগুলিকে মর্কট পরিমাণ দেখাইতেছিল, এখন বৃষ্টির মধ্যে তাহাদের লক্ষ্য করাই দুষ্কর হইল। ভাবিলাম, এ-ঝড়ে তাহারা স্খলিত ও স্থানচ্যুত হইবেই; যদি জলে পড়ে ত তুলিবার চেষ্টা চলিতেও পারে; জাহাজের উপর পাড়লে মাত্র পাজামাটির পাত্তা পাওয়া যাইবে। এই কথা মনে হইতেই মাথাটা বোঁ করিয়া উঠিল, ঊর্দ্ধে চাহিবার আর সামর্থ্য রহিল না। পঞ্চানন বলিল,—"বেটারা কি মুখ্যু, হুস্ ক'রে টেনে নিয়ে পুঁটুলি পাকিয়ে রেখে নেবে আয়না বাপু!"

আমরাও সামরিক বিভাগে কাজ করি, সে-বিভাগের আদেশ আর নিয়মানুবর্ত্তিতা যে কিরূপ কড়া তাহাও জানি; কিন্তু নৌ-বিভাগ নাকি এ-সম্বন্ধে অধিকতর সজাগ—"তেকার্ বাপ্।" শমনের সন্নি-কটবর্ত্তী এই মাস্তুল-মর্কটগুলির এমন ক্ষমতা বা সাহস নাই যে, পালগুলিকে রীতিমত সৌষ্ঠব-দুরস্ত চোস্ত ও শোভন করিয়া না-বাঁধিয়া নামিয়া আসে। এই আসন্ন মৃত্যুমুখেও পালের কোনখানে একটু কোঁচ্ বা ঝুল্ রাখিয়া অর্থাৎ অশোভন অবস্থায় রাখিয়া নামিবার যো নাই।

যে জাতের মৃতদেহ গোরস্থ করিবার পূর্ব্বে প্রসাধন অপরিহার্য্য, চুল ফেরানো চাই, কামিজের কক্‌কলার না মোচড় খায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা চাই, তাহাদেরি এই ভীষণ ভব্যতা সাজে;—ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। ক্লিওপেট্রা মৃত্যুমুহূর্ত্তেও তাঁহার মুকুট না তিল-মাত্র স্থানচ্যুত হয় বা বে-মানান ভাবে একচুল বাঁকে, সে-সম্বন্ধে সম্যক সজাগ ছিলেন। আর আমা:দের? পরম আত্মীয় ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়-তমই আমাদের শ্রীমুখে খড়ের নুড়ো জ্বালিয়া দিয়া এবং শ্মশান-পক্ক পিণ্ড, (যাহা বোধ হয় কুক্কুরেরও অভক্ষ্য) তাহাই বদনে দিয়া বিদায় করে। নিশ্চয়ই ইহার শাস্ত্রীয় তাৎপর্য্যের এবং তারিফের অভাব নাই—তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও থাকিতে পারে। মিথ্যা স্বপ্নের আবার এত রোশনাই, এত সৌষ্ঠবসাধন কেন? কিন্তু "পোড়ার-মুখো দেবতার ঘুঁটের ছাই নৈবিদ্যিই শোভন,"—এই প্রবচনটাই বোধ হয় সুপ্রয়োগ। ক্ষমা করবেন,—না হয় একটা সত্য ঘটনা শুনুন:—

—২১—

জমিদার বাড়ীর সম্মুখ প্রাঙ্গণে মতি রায়ের যাত্রা। ক্ষুদ্র গ্রামখানি আনন্দান্দোলিত। আসর দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। সুন্দর সামিয়ানা-মোড়া ম্যারাপ, ম্যারাপের থামগুলিতে সালুর উপর দেবদারু পাতার বেড়্, তাহাতে জোড়া-সেজের দেলগিরি,—তন্নিম্নে পুষ্পমাল্য বেষ্টনে সুন্দর চিত্র সকল। আসরের মধ্যে ষোলটি ঝাড়্ ও তাহাদের ফাঁকে ফাঁকে বিবিধ বর্ণের বেল্‌লাণ্ঠান। মাথার উপর বেল-ফুলের মালার জাল (net-work)। নীচে মেজেয় ৪·৫ মণ ওজনের প্রকাণ্ড একখানি মূল্যবান গালিচা পাতা। গ্রামস্থ ইতর ভদ্রেরা খুবই হাম্‌রাই;—পান

শুছুক্ আতর গোলাপের ছড়াছড়ি। চারিদিকেই প্রফুল্লতা, কেবল গ্রামের দেবদারুগাছগুলি যেন প্রয়াগে মাথা মুড়াইয়া ফিরিয়াছে।

অভিনয়—"রাবণবধ"। অনিন্দ্যসুন্দর আসর আর সমঝদার শ্রোতা পাইয়া, মতি রায় মহাখুসী হইয়া অষ্টাদশ পুরানের কোন কথাই বাদ দিলেন না! লম্বা লম্বা উপদেশ ও 'সার্মনে' যুবকদের ঘুমরাইয়া বৃদ্ধদের কাঁদাইয়া, বালকদের বিরক্ত করিয়া, বাহবা আর বায়নার টাকা লইয়া বিদায় হইলেন।

কোন বিষয়ে দৃষ্টি রাখা, বা কোন কাজের কথা কওয়া বা শোনা, জমিদারদের রীতি নহে; তাহা লজ্জার কথা, তাহাতে সম্মান সম্ভ্রম খাটো হয়। তিনি সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া উঠিয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যখন জরিজড়ানো বৃহল্লাঙ্গুল সদৃশ ফুরশির নল লোকের দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেল, আসরে তখন বেলফুলের মালা ছেঁড়াছেঁড়ি ও কাড়াকাড়ি আরম্ভ হইল। তাহাতে দু'তিনটা ঝাড়ের অঙ্গহানি ঘটিল, কয়েকটা লাণ্ঠান ভাঙ্গিল, দু'চারখানা ছবি অন্তর্হিত হইল। পরে পাইক, ভৃত্য, ইতর ভদ্র অন্যূন পঞ্চাশ জন মিলিয়া যে-যেথানে পাইল, সেই মহা-গালিচাখানি ধরিয়া একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ে-পিণ্ড পাকাইয়া ফেলিল, এবং হৈ হৈ শব্দে তাহাকে টানিয়া আসর-সংলগ্ন নহবৎখানার নীচে তাহার মহাযাত্রা সমাধা করিল। সদ্‌গতির উপায়গুলি তাহার মধ্যেই রহিয়া গেল, যথা, ছেঁড়া মালা, টাক্‌পড়া ফুলের তোড়া, সশাখা দেবদারু পত্র, গুড়ুকের গুল্, টিকের ছাই, আর সহস্রাধিক লোকের জাতি-সমন্বয়ানুকূল পদ-রজ, ইত্যাদি ইত্যাদি। ফরাশেরা ঝাড়-লণ্ঠান প্রভৃতি খুলিয়া গুদামে পুরিল,—বিকলাঙ্গগুলির কোন ব্যবস্থাই হইল না,—কখন হইবার আশাও নাই, কারণ তাহা বাতিল হওয়াই গৌরবাত্মক। সপ্তাহখানেক রোদবৃষ্টি হিমে পাকিবার পর দশভূতে

টানাটানি করিয়া, সামিয়ানাখানায় লম্বা লম্বা ফালা দিয়া নামাইয়া সেই মহৎখানার নিম্নতলেই সমাধি দিয়া আসিল।

গ্রামের লোকের ক্রিয়াকর্ম্মে জমিদার বাড়ীর জিনিষপত্রই আসিত; এ-সম্বন্ধে তাঁহাদের ঢালা হুকুম ছিল। মাস পাঁচছয় পরে একটা বিবাহ উপলক্ষে আবশ্যক হওয়ায়, গালিচা ও সামিয়ানার খোঁজ পড়িল। কবর হইতে টানিয়া বাহির করিবার পর, (resurrection- এ) দেখা গেল, উভয়েরি প্রায় তৃতীয়াংশ উইএর উদরস্থ হইয়াছে। তদুপরি ফালার লম্বা লম্বা দৌড় দেখিয়া, সামিয়ানাখানিকে ফাজিল গুদামে ফেলিবার হুকুম হইল। গালিচাখানির গর্ভে উনিশ অক্ষৌহিণী উই; পদ-রজ ও উইমাটিতে মণদেড়েক্; আদমণটাক্ জঞ্জাল; সর্ব্বোপরি রাজজোটক —একটি আস্ত সচর্ম্মক কুকুর-কঙ্কাল পাওয়া গেল। মতি রায়ের যাত্রায় মুগ্ধ হইয়া কুকুরটি বোধ হয় গালিচার উপরই গা-ঢালিয়া দিয়াছিল। সেখানি গুটাইবার সময় কোন হাম্‌রাই রসিক একটা মস্ত মজা হিসাবে সেই ভীম-গালিচার কতকটা বোধ করি তাহার উপর চাপা দেয়, অন্যান্য রথীরাও সত্বর এই পুণ্যকার্য্যে যোগদান করিয়া নিজ নিজ অঞ্জলি দিয়া থাকিবেন। অসহায় নিরপরাধ জীবটি তাহার মধ্যেই জীবলীলা সমাপ্ত করিতে বাধ্য হয়;—তাহার কাতর নিবেদন সেই ইরাণী-ব্যূহ ভেদ করিয়া বিজয়ী বীরগণের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে অপর কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই।

এই বীভৎস দৃশ্য প্রকাশ হওয়ায় অশিক্ষিতে 'আহা'ও বলিল, 'ছি-ছি'ও করিল। শুনিয়া একজন ভদ্রপণ্ডিত বলিলেন—"ভগবানের কার্য্যকলাপ মনুষ্যবুদ্ধির অনধিগম্য; হইতে পারে—পরস্ত্রী-হরণরূপ মহাপাতকের জন্য রাবণ কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হইয়া বিচরণ করিতে করিতে এখানে উপস্থিত হইয়াছিল। মহাভক্ত মতি রায় তাহা জানিতে পারিয়া

রাবণ-বধের ছলে এই কুক্কুরটি বধের পথ করিয়া দিয়া রাবণের উদ্ধারোপায় করিয়া গিয়াছিলেন”—ইত্যাদি। যাহা হউক, পরিশেষে গালিচাখানি গো-শকটারোহণে যাত্রা করিয়া গঙ্গাগর্ভে সদ্‌গতিলাভ করে। মহতের সঙ্গে থাকায় কুক্কুরটিও যে অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে হিন্দু মাত্রেরই সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারেনা।

শূন্যে প্রবল ঝঞ্ঝামুখে, মৃত্যুদোলায়, নাবিকদের পাল গুটাইবার পারিপাট্য, আর ভূপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া আমাদের গালিচা গুটাইবার দুর্দ্দশাটা আমাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার অনুমান সৌকর্য্যার্থে পাশাপাশিই দিলাম। এটা আমাদের অসীম ঔদাস্য, কি অযোগ্যতা ও অক্ষমতা, বা প্রকৃতির পরিচয় তাহা পণ্ডিতেরাই বলিতে পারেন।

যাহা হউক, এসব কথা সে-সময় মনে আসে নাই। বিপদটাও সারা বুকটা অধিকার করিয়া বসিবার সুযোগ পায় নাই; আমি কেবলই ভাবিতেছিলাম—“এরা নেবে এলে বাঁচি”। ইতিমধ্যে ঝড়বৃষ্টি এতই প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ও সমুদ্র এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, চাটুয্যেকে সামলাইয়া লইয়া বোসজা ও মজুমদার নীচে চলিয়া গিয়াছেন। বিশেষ কোন উৎসব-রজনীর মত, বৈদ্যুতিক আলোগুলিকে উজ্জ্বলতর ও সংখ্যায় অধিক করা হইয়াছে। চিফ্ সাহেব ও কাপ্তেন সাহেবের সহকারী যুবকদ্বয় হাঁটুর উপর পেণ্টালুন গুটাইয়া খালি-পায়ে ছুটাছুটি করিতেছেন। ঝড় ও বৃষ্টির সমগ্র বেগটা তাঁহাদের শরীরের উপর দিয়া যাইতেছে, ভ্রূক্ষেপও নাই। পঞ্চানন ছুটিয়া আসিয়া এইরূপ জানাইল—কাপ্তেন সাহেব এতক্ষণ নিজেকে লোহার খুঁটির সহিত, চামড়ার বেল্ট্ দিয়া বাঁধিয়া এই ঝঞ্ঝার মধ্যে “টাওয়ারে” দাঁড়াইয়া দূরবীণ কসিতেছিলেন ও মধ্যে মধ্যে

ড্রম-পাইপে মুখ দিয়া সহকারীদের কি বলিতেছিলেন। দূরবীক্ষণ আর কাজ করিল না, সার্চ্‌লাইটের অর্ডার দিয়া যে কোথায় গেলেন, দেখিতে পাইতেছি না। চিফ্‌সাহেবও দেখিতেছি মাস্তলের উপর হইতে মাল্লাদের সত্বর কাজ সারিয়া নামিয়া আসিবার জন্য ঘন ঘন বলিতেছেন।

ঠিক এই সময় মাল্লারা আধমরার মত অবস্থায় নামিয়া আসিল; চিফ্‌ সাহেব তাহাদের সঙ্গে লইয়া নীচে গেলেন। আমার বুকের উপর হইতে যেন একখানা পাথর সরিয়া গেল; চমক্‌ ভাঙিয়া পরমুহূর্তেই সমস্ত দৃশ্যটা আপাদমস্তক কাঁপাইয়া দিল, আর দাঁড়াইতে পারিলাম না। সঙ্গীদের সান্নিধ্য পাইবার জন্য প্রাণটা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। লোকে বিপদের সময় আপনজন খোঁজে; এই স্বজনহীন সুদূর সমুদ্রবক্ষে সঙ্গীরাই পরমাত্মীয়। লোকে যখন তখন বলিয়া থাকে, "আমরা কি জলে প'ড়ে আছি?" হায় রে মানুষের দর্প! সেদিন আমরা যে কতখানি জলে পড়িয়াছিলাম, তাহা অন্যের অনুমানের বহু ঊর্দ্ধে। আমার নিজের স্মৃতিই আজ তাহা ভুলিয়া গিয়াছে।

—২২—

তখন আর কাহারো ওঠা-নামার সাধ্য ছিল না; বহু কষ্টে সিঁড়ির রেলিং ধরিয়া নীচে নামিলাম, পঞ্চানন আমার আগেই নামিয়া গেল। সিঁড়ির নীচেই একজন নাবিককে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি রকম বুঝচো,—এটা গোলমেলে ঝড় নয় ত?" উত্তর পাইলাম,—"এই ত আসল টাইফুন, চীন সমুদ্র ত এই তুষমনের জন্যেই মসুর; এখানে টাইফুন্‌ হামেশাই লেগে আছে। জানের মায়া রেখে এ-সব দরিয়ায় আসা চলে না।" আমাকে পশ্চাতে না পাইয়া এই সময়

পঞ্চানন ফিরিয়া আসিল। সে ফিরিবার সময় দেখিয়াছিল,—আমাদের কথা হইতেছে; তাই আসিয়াই বলিল—"কি আপদ, করেছেন কি? পালিয়ে আসুন—পালিয়ে আসুন; এ যে সেই আপনার হংকং-এর কলম্বস্!" লোকটা পঞ্চাননের কথা বুঝিতে পারে নাই; আলো-আঁধারে লাগায় আমিও লোকটাকে প্রথমে চিনিতে পারি নাই। যাহা হউক, এবার মিঞা নিজেই বলিয়া চলিল,—"আমাদের কাপ্তেন সাহেব খুব পাকা লোক, এই 'ক্লাইভ'কে তিন-তিনবার সাংঘাতিক ঝড় থেকে বাঁচিয়েছেন, সে-সব ঝড়ের একটা আওয়াজেই লোক অজ্ঞান হয়ে যায়। 'ক্লাইভ' নিজেও খুব লক্ষ্মীমন্ত—ডুবতে জানে না; তানা ত আজ ৪।৫ বছর আগে আরব-দরিয়ায় যে ঝড় থেকে বেঁচে এসেছে, সে এক আজব কথা। সে-দিনের কথা মনে হ'লে আজো বুকের পাঁজর কেঁপে উঠে।"

এই সময় একটা ঝাপ্‌টায়, রেলিং ধরিয়া কোন প্রকারে সাম-লইয়া গেলাম, পঞ্চানন পড়িয়া গেল। সারেংজি থামিল না, বলিল—"ঝড়টা মামুলী রকমের হ'লে এ-সময় কাপ্তেন সাহেব গির্জ্জাঘরে ঢুকতেন না, এটা আমরা বরাবরই লক্ষ্য ক'রে আস্‌ছি।" পুনরায় একটা গোঁ গোঁ শব্দে জাহাজকে মিনিট দুই একপেশে করিয়া রাখিল, আমরা কাঠ হইয়া রহিলাম; জাহাজ সোজা হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস পড়িল! সারেংজি গম্ভীরভাবে বলিল—"হুঁ, সেই জাতেরই বটে।" পঞ্চানন আমাকে আর দাঁড়াইতে দিল না, যাইতে যাইতে বলিল,—"যত দাঁড়াবেন, ও বুড়ো ততই অন্তরটিপুনী দেবে, ওর স্বভাবই ঐ। আমি ওর কথায় বিশ্বাস করি না; সে-দিন ও-ই না বলেছিল—ঝড়ের সময় বন্দরে থাকাটাই বেশী বিপজ্জনক! বেটা জাহাজী দুর্ব্বাসা!" ভয় পাইলেও পঞ্চানন তখন তার ভাষা বদলায় নাই।

আত্মীয়ের আসন্নকাল উপস্থিত হইলে যেমন তাহাকে ঘরের বাহির করিয়া দালানে বা রোয়াকে আনা এবং সকলে বিমর্ষমুখে ঘিরিয়া বসাটাই নির্ব্বাণ-পর্ব্বের প্রথম চ্যাপ্‌টার, নীচে আসিয়া দেখি, আমার সঙ্গীরা চাটুয্যেকে ঘিরিয়া কেবিনের বাহিরে সেইভাবে জমায়েত্‌! আমরা উপস্থিত হইতেই, সকলে যেন একটু সাহস পাইলেন; আমিও দল পাইয়া বল পাইলাম। বোসজা বলিলেন,—"খুব যাহোক্, চাটুয্যেকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে কোথায় ছিলেন বলুন দিকি? এখন নিন্ আপনার Charge,—কেঁদেই অস্থির, বলে—আমার যে পাঁচটি মেয়ে! হরিপদ সবার ছোট, সেও স্থির রয়েছে। বিপদ ত অস্বীকার করবার যো নেই, কিন্তু কেঁদে কি কোরব।"

আমার অপেক্ষা ভীতুলোক এক চাটুয্যে ছাড়া জাহাজে আর কেহ ছিল কি না জানি না। লোকের অন্তরের কথা অনুমান করিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই; হইতে পারে চাটুয্যেও আমার চেয়ে সাহসী Strong nerve-এর লোক। যাহা হউক, অবস্থাটা অনুমান করিয়া লইয়া বোসজাকে বলিলাম,—"বিপদ, কে বল্লে? ঝড়জল্ ত সমুদ্রে লেগে থাকবারই কথা, চিরকাল লেগেও আছে,—সেটাকে বিপদ বলে বোঝা নিজের নিজের দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। মন তাকে যতবড় ইচ্ছে ভাব্‌তে পারে, আবার কিছুই নয় বলে অগ্রাহ্যও করতে পারে। সমুদ্রের চরম বিপদ ত কেবল একটা, ডাঙ্গায় যে আমরা সহস্র বিপদের মধ্যে বাস কোরে থাকি! সেগুলো ভাবি না বলে কি বিপদ নয়? ভূমিকম্প, ঝড়, বন্যা, বাড়ীচাপা, প্লেগ, কলেরা, দুর্ভিক্ষ, দস্যু, সাপ, বাঘ, ভালুক, চোর, ডাকাত, বরের বাপ— ইত্যাদি ইত্যাদি কোন্‌টা বিপদ নয়! যাক্—আমিও খুব ভয় পেয়েছিলুম, কাপ্তেন সাহেবকে না জিজ্ঞাসা কোরে স্থির হ'তে

পারছিলুমনা, তাই তাঁর অপেক্ষা কোরে দাঁড়িয়ে ছিলুম।" আমার প্রশ্ন শুনে তিনি হেসে বল্লেন—"ভয়ের কথা তোমাকে কে বল্লে? এসব ঝড় কেবল খানিকক্ষণ জ্বালাতন কোরে চ'লে যায়;—যাও, এক পেগ্ হুইস্কী, না হয় এক কাপ চা খেয়ে শুয়ে থাক'গে।" এই বলে চলে গেলেন; আমি তাঁর সপ্রশান্ত ভাব দেখে আর সহজ কথা শুনে নিজেকে যেন ফিরে পেলুম। আমার বক্তৃতাটা সকলকেই একটু সজীব করিয়া দিল। ভাবিলাম হায়রে "মিথ্যা কথা" তুমি না থাকিলে সংসার, সমাজ, এমন কি শাসনযন্ত্র অচল হইত;—কিন্তু শেষরক্ষার তুমি কেহ নও। চাটুয্যে কাতরকণ্ঠে বলিল—"তা হলে কোন ভয় নেই বাঁড়ুয্যে মশাই?" আমি বলিলাম—"কাপ্তেনের চেয়ে আর এ-সব বিষয় কে বেশী বোঝে।" যখন এই সব কথা হইতেছিল, তখন বাহিরের গোঁ গোঁ শব্দে আমার নিজেরি প্রাণটা বুকের মধ্যে বোঁ বোঁ শব্দে ছুটাছুটি করিয়া নিরাপদ স্থান খুঁজিতেছিল।

কাপড় জামা সবই ভিজিয়া গিয়াছিল, পরিবর্ত্তন করিতে গেলাম, পঞ্চাননও সঙ্গে আসিল। সে এত ভিজিয়াছিল যেন অবগাহন করিয়া আসিয়াছে, ভয়ে বা ঠাণ্ডায় কাঁপিতেছিল। সে বলিল—"ওঁদের ত যা হয় বুঝিয়ে এলেন, কিন্তু ও-কথায় আমার প্রাণ ত বুঝবে না।" আমি বলিলাম—"আমারি কি বুঝেছে পঞ্চানন? তা ছাড়া, ও বোঝার ফল কি? প্রাণ যে সত্যটা প্রতিপলেই অনুভব করচে। সেবার সারেংজিই সার কথাটা শুনিয়েছিল—'খোদা মালিক।' এই প্রলয়ের মুখে, এই কূলহীন বিপুল সমুদ্রে, একমাত্র সেই অসহায়ের সহায়, সদাজাগ্রত ভগবানেই ভরসা। এ-সময়ে কোন নেল্‌সনই হালে পানি পান না।" পঞ্চানন একটু নীরব থাকিয়া বলিল—"এমন জানলে কল্‌কেতায় কুলপীর বরফ বেচতুম, না হয় চায়ের দোকান খুলতুম;

কি ভুলই করেচি!" বুঝিলাম, এতক্ষণে পঞ্চানন পেছিয়েছে, কিন্তু ভাষা বদলায়নি। বলিলাম—"ভয় কিহে, সত্যই কি এতগুলো লোকের ভাগ্য এক কলমে লেখা! সেখানে আজ ফাউন্টেনপেন্ পৌছয়নি;—ও-সব ভাবতে নেই, চল।" চলিব কি, জাহাজ তখন মত্ত মাতঙ্গের চাল ধরিয়াছে, শব্দে প্রাণ স্তব্ধ হইয়া যাইতেছে; প্রভঞ্জনও মধ্যে মধ্যে ভীষণ হুঙ্কারে জাহাজকে উৎক্ষিপ্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। সেই দু'এক মিনিট সকলকে তটস্থ করিয়া রাখিতেছে; সকলেই "অটো-মেটিকেলি" কলের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া উঠিতেছে। সে সময়টা কাহারো নিশ্বাস পড়িতেছে না!

এই অবস্থায় ২।৩ জন লোক 'Cooper' যন্ত্রাদি লইয়া আসিয়া জাহাজের গবাক্ষগুলি আরোহীরা কেহ না খুলিতে পারে এমন অভাবে আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া গেল। আবার তাহাদের উপরে যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সিঁড়ির পথ বা ফাঁক, উপরের ডেকের মেজের সঙ্গে এক হইয়া বন্ধ হইয়া গেল! অর্থাৎ আমাদের বেশ মোড়ষা করিয়া (Hermetically sealed) মোড়া হইল। কোন ছিদ্রান্বেষীর জন্য আর অবকাশ মাত্র রহিল না, কেবল উপর হইতে নিম্নতল পর্য্যন্ত প্রলম্ব বায়ুনালি (Ventilator)গুলির কণ্ঠরোধ করা হইল না; আলোটাকেও কালো করা হইল না। আমরা বাঁধা-রোশনায়ের মধ্যে বন্ধ হইলেও যেন ফাঁসীর আসামীর মত বোধ করিতে লাগিলাম। আলিবাবার গল্পের গুহায় একটা "Open Sesame" বলিয়া উপায় ছিল, এখানে শত "সিসেমেও" সাড়া পাইবার সম্ভাবনা রহিল না। এইবার প্রকৃতই একটা ভীতির সুস্পষ্ট ছায়া সকলের মুখেই দেখা দিল; সকল সম্প্রদায় মধ্যেই হৈ চৈ পড়িয়া গেল, পড়িবারই কথা। স্বাধীন ভাবটা আমাদের বহুদিন হইতেই অসাড় ও অর্থহীন, তথাপি এই বন্ধন দশায়

প্রাণটা একটু ফাঁক পাইবার জন্য আঁকু-পাঁকু করিতে লাগিল। কিন্তু ইউক্রেটিসের এপারের জন্ম-পাট্টাধারী ইউরেসিয়ানরা অনেকেই পুরো স্বাধীনতার স্বাদ না জানিয়াও, ফ্রিডমের্ ফয়তা দিতে Forward (তৎপর); তাঁহাদের এই বন্দী অবস্থার অপমান অসহ্য হইয়া উঠিল এবং অভিমানটা অনবরত আঘাত করিয়া তাঁহাদের উন্মত্ত করিয়া তুলিল। আমার পরিচিত মিস্টারটি রাগে মেটে-সিঁদুর হইয়া আমাদের শুনাইয়া বলিলেন—I must walk up with impunity (কার সাধ্য রোধে মোর গতি); কিন্তু অগ্রসর হইয়া সিঁড়ি আর খুঁজিয়া পান না; তাহা উপরের ছাদের সহিত শয়ান অবস্থায় সংলগ্ন হইয়া গিয়াছিল! সুতরাং দুই চারিবার হাঁক্‌ডাক্ করিয়া গালিবর্ষণ করিতে করিতে ও শাসাইতে শাসাইতে ফিরিলেন।

উঃ, প্রাণটা কি প্রিয় বস্তু, এবং আসন্ন অপঘাত মৃত্যুর অপেক্ষা করাটা কি ভীষণ! চাটুয্যে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বলিল,—বাঁড়ুয্যে মশাই, সব বন্ধ ক'রে দিলে কেন?" উঃ, সে কি কাতর দৃষ্টি! তাহা যেন আমার বক্ষ ভেদ করিয়া মর্ম্মে গিয়া আশ্রয় খুঁজিল। আমি তখন নিজে যে কোথায় তাহা জানি না,—কিন্তু সে-দৃষ্টি আমাকে মুহূর্ত্তের জন্য টানিয়া আনিল; বোধ হয় বলিলাম—"বন্ধ করাই ত উচিত, তানা ত এতক্ষণ জলে যে জাহাজ ভরে যেত। এ-সময় অপার ডেকের উপরেও এক একটা ঢেউ উঠে পড়ে, উপরে গেলে হঠাৎ ভাসিয়ে নে' যেতে পারে;" ইত্যাদি কি যে বলিয়াছিলাম নিজের কাণ তাহা শোনে নাই। সকলেরি তখন এক অবস্থা; বড় বাবু বলিলেন—"সুবিধে পেলে একটা (Sleeping draught) নিদ্রাকর্ষক ঔষধ খেয়ে ফেলি, না হয় Morphia injection নি।"

এখন রাত্রি বোধ হয় দশটা, ঝড়েরও রুদ্রাবস্থা। এই সময় হঠাৎ "Sir-John-Lawrence" জাহাজের কথা আমার মাথায় ঢুকিয়া বসিল। প্রায় ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত "সার-জন্-লরেন্সের" আট শত আরোহী এইরূপ বদ্ধাবস্থায় বঙ্গোপসাগর-তলে অন্তিম-শয্যা লইতে বাধ্য হইয়াছিল। এই বিপদের সময়, আমার মাথার মধ্যে কবি-সুলভ কল্পনাস্রোত বিদ্যুদ্বেগে সেই আটশত নরনারীর অসহায় অবস্থা—চাঞ্চল্য, কম্পন, ক্রন্দনরোল, ছুটাছুটি, জননী-অঙ্কে শিশু, কণ্ঠ-সংলগ্ন স্বামী-স্ত্রী, প্রভৃতি নিদারুণ চিত্র সকল (Panoramaর মত) প্রকট করিতে লাগিল। সর্ব্বশরীর শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কিছু পূর্ব্বে পঞ্চাননকে বলিয়াছিলাম—"সকলের ভাগ্যই কি ভগবান এক কলমে লিখেছেন!" এরি মধ্যেই "Sir-John-Lawrence" বিকট পরিহাস করিয়া গেল!

ফলোয়ারদের দৃশ্য অন্যরূপ। দেখি তাহাদের কেহ বমন করিতেছে, একজন ব্রাহ্মণ "আরে রামজি বাচাও" বলিয়া বালকের মত কাঁদিতেছে। আবদুল্লা এক ছিলিম তয়েরি গাঁজা লইয়া তাহাকে বলিতেছে—"লেঃ—পি-লে, ক্যা তুহি একেলা মরেগা? আল্লা মালিক;—লেঃ, খিঁচ্ কে পি-লে।" সকলেই জড়সড়; তবু তাহাদের মণ্ডলী মধ্যে তিন-চার ছিলিম গাঁজা, মাঝে মাঝে দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে! তাহাদের লোটা বালতি লইয়া জাহাজ যেন ভাঁটা খেলিতেছে; rolling এর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি জাহাজের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে সশব্দে যাতায়াত করিতেছে। প্রথম প্রথম সকলেই তাহাদের ধরিবার ও সামলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল; বাড়াবাড়ি আরম্ভ হওয়ায়—"যাঃ শরো,—জান্ বচে তো দেখা জায়গা" বলিয়া তাহাদের ছাড়িয়া নিজেরা গাঁজা লইয়া পড়িয়াছে।

ক্রমে বোধ হইতে লাগিল,—এই অসম সময়ে, জাহাজ আর যেন যুঝিতে পারিতেছে না,—অথম হইয়া পড়িয়াছে। মহিষাসুর বধের সময় মহামায়া যেমন—"তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণং মূঢ় যাবন্মধু পিবাম্যহম্" বলিয়া ক্ষণকাল বিরত ছিলেন, প্রভঞ্জনও সেইরূপ শাসাইয়া, যেন এক একবার সরিয়া যায়, পরে দ্বিগুণ বেগে আসিয়া আক্রমণ করে। ঐ সময়টুকু জাহাজ থরথর করিয়া সুস্পষ্টই কাঁপিতে থাকে। আমাদেরও ক্ষণে ক্ষণে শিহরণ হইতে ক্রমশঃ বক্ষ কম্পন আরম্ভ হইয়াছিল, এখন সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। হস্ত-পদ অধর-ওষ্ঠ শীতল, কপাল স্বেদ-সিক্ত, বদন বিবর্ণ হইয়া উঠিল। কাহারো মুখে কথা ত ছিলই না; কেহ কহিলেও তাহা জড়তাপূর্ণ, কাণেও পৌঁছায় না। মৃত্যুর ছায়া ভিন্ন চক্ষের সম্মুখে তখন কিছুই স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছিল না। সে ছায়া নীলাভ, হইতে পীতাভ, পরেই ধূম্র, এইভাবে আসে-যায়। এইটাই আমাদের জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণ ছিল।

নানা নামে ভগবানকে সকলেই ডাকিতেছিলাম, শরণ লইবার সামর্থ্য ছিল না, কারণ মন ভয়ের কাছেই বন্দী ছিল। বোধ হয় ডাকিতে ডাকিতে না কাঁদিলে একাগ্রতা আসেনা সমর্পণও সম্পূর্ণ হয় না। সকলেই কাঁদিলাম, বুঝিয়া নয়,—ভয়ে, প্রাণের জন্য; তবে তাঁহার নাম করিয়া ও তাঁহার নিকট বটে। তাহাই যথেষ্ট হইল! যাহার কিছুরই অভাব নাই, যিনি স্বয়ং ষড়ৈশ্বর্য্যপতি ত্রিভুবনেশ, তাঁহাকে মানুষ আবার কি দিবে? কিন্তু যিনি পূর্ণ, তাঁহাতে "চাওয়াটা"ও থাকা চাই, নচেৎ তাঁহাতে অভাব থাকিয়া যায়। সেইটুকু পূরণের জন্যই বোধ হয় এই অশ্রুটুকুই তিনি চান। কিন্তু এ অশ্রু মেলা বড় কঠিন, তাই তাঁহাকে এত অল্পেই তুষ্ট হইতে হয়, (Beggars have no choice) ভিক্ষুকের ভালমন্দ বা কম-বেশী বলিবার অধিকার নাই।

হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত হাসির শব্দ সকলকে সেইদিকে আকৃষ্ট করিল। চাহিয়া দেখি,—ইউরেসিয়ান দলের একজন উদ্ভট নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে, মধ্যে মধ্যে অদ্ভুত হাস্য;—বাহিরে যেমন উন্মত্ত ঊর্ম্মি, তাহারও তেমনি উন্মাদ নৃত্য! পড়িতেছে, উঠিতেছে, কিন্তু কামাই নাই,—সুর বজায় আছে। আবার গাহিতে গাহিতে নানা ভঙ্গিতে সঙ্গীদের মুখের কাছে হাত নাড়িতে নাড়িতে যেন আরতি করিতেছে। সঙ্গীরা যতই রুষ্ট হইতেছে ও বিরক্ত হইয়া পিছাইতেছে, সে ততই তাহাদের ঘিরিতেছে—ততই উৎসাহে সুর চড়াইতেছে। ঘন ঘন আছাড় খাইতেছে, কিন্তু তাহার আনন্দের বিরাম নাই। কখন পোল্কা, কখন ওয়াল্ট্জ্—অর্থাৎ সবটাই ওলট্ পালট্! ভাবিয়াছিলাম "হিস্টিরিয়া" (Hysteria); কিন্তু বেহুঁশ্ নয়, গানের অর্থেই সেটা ধরা পড়ে। ভাবটা এইরূপ :—

কেঁদনা আমার শিষ্টু ছেলে,—
খাও টানো মজা করে নাও,
কি লাভ আর ট্রঙ্কে রেখে,
বোতলটা বার করে দাও।
হাঙ্গরে তার স্বাদ বোঝে না,
না বোঝে তা মাছে,
সদ্ব্যবহার করে' ফ্যালো—
যার যা পুঁজি আছে।
যেতেই যখন হবে দেখচি,
করতে নেই তার অপমান,
খাঁটি মাল্‌টা পেটে পূরে
লোনা জলের কমাও স্থান!

এই বাদামী রংয়ের যুবা ইউরেসিয়ানটিকে নিত্যই দেখিতাম, এটি একটি সিলোনী ক্রিস্টান্; সঙ্গীরা ইহাকে মিস্টার সিঙ্গালী (সিংহলী) বলিয়া ডাকিত। দুর্ব্বল্ ফ্যাকাশে রুগ্ন বলিয়াই মনে হইত। তাহাকে লইয়া দলের সকলেই রহস্য করিত, সে নিজেও রঙ্গ-রহস্য লইয়া থাকিতে ভালবাসিত। ইতিপূর্ব্বে আমাদের মধ্যে এমন কথাও হইয়াছে, "ওটি ওদের দলের পঞ্চানন"। আজ তাহার বেপরোয়া ভাব দেখিয়া, ও Strong nerve-এর পরিচয় পাইয়া, অবাক্ হইয়া গেলাম। যে-ঝড়ের এক ঝাপ্টায় বেহুঁশ মাতালের নেশা ছুটিয়া যায়, সেই ঝড়ের প্রচণ্ডতাই যেন ইহাকে উৎসাহ জোগাইতেছিল! এই অবরুদ্ধ মরণ-মন্দিরে আসন্ন অপঘাতের মুখে, তাহার এই আনন্দাভিনয়, অন্যূন অর্দ্ধঘণ্টাকাল, আমাদের আকৃষ্ট ও অন্যমনস্ক করিয়া রাখিয়াছিল। ইতিমধ্যে প্রভঞ্জনের সেই প্রচণ্ড তাড়না ও ভৈরব হুঙ্কার যে কোন্ ঐন্দ্রজালিকের ইঙ্গিতে কখন্ কমিয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতেই পারি নাই, কেবল সমুদ্রের আস্ফালন ও ভীম জলকল্লোল মাত্র অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে! জাহাজ এখন যে হাঁপাইতেছে আর সামলাইতেছে।

রাত্রি দুইটা আন্দাজ অনেকটা সাম্যভাব আসিল। অত বড় প্রলয়-তাণ্ডবের পর সকলে সহজেই সেটা লক্ষ্য করিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইল; দু'একটা কথা ফুটিল,—ভগবান রক্ষা করিলেন। ঐ যে মিস্টার সিঙ্গালীর অভিনয়, আমার আজিও দৃঢ়:বিশ্বাস—সেই সন্ধিক্ষণে আমাদের ত্রাসিত মুমূর্ষু চিত্তকে তদ্দ্বারা সত্বর ভাবান্তরে আকৃষ্ট করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল; নচেৎ একটা বিষম অনর্থপাত হইত, এবং আমরা ঠিক তাহার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে উপস্থিতও হইয়াছিলাম। মান্দ্রাজীদের মধ্যে একজন অজ্ঞান হইয়া যায়, আমাদের চাটুয্যের ফিটের মত হয়।

—২৩—

আমাদের গোয়ানিজ্ স্টুয়ার্ডটি বড় ভদ্রলোক ছিলেন; ঝড় থামিতেই আসিয়া বলিলেন—"আজ সব কি খাবেন, রান্নার ত সুবিধা হয় নাই।" আমরা বলিলাম—"যা ধাক্কা খেয়েছি আজ আর কিছুরই আবশ্যক নেই।" তিনি হাসিয়া বলিলেন—"এ ধাক্কা অনুমান কাল রাত্রে থামতো; মনে করবেন না ঝড় থেমেছে। কাপ্তেন সাহেব প্রায় ৭।৮ ঘণ্টা জাহাজকে পিছু হ'াটিয়ে Safe waterএ (নিরাপদ জলে) এনে ফেলেছেন। তিনি বলছিলেন—তাঁর ধারণা ছিল, স্থির সমুদ্র পেতে রাত তিনটে বেজে যাবে, কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবেই এত সত্বর পাওয়া গেছে। ঝড়টা বাঁকা গোছেরই ছিল। যাক্ তাকে ত এড়ানো গেছে, এখন দু'চার স্লাইস্ (টুক্‌রা) রুটী কি খান-কতক বিস্কুট আর এক কাপ্ করে চা খেয়ে শুয়ে পড়ুন। নিশ্চয়ই শরীর মন দুইই অবসন্ন হ'য়ে থাকবে, এক বোতল ক'রে বীয়ারেও (Beer) খুব উপকার পাবেন,—নিদ্রাও ভাল হবে, কি বলেন?" আমরা এক কাপের স্থলে দু'কাপ করে চা'টাই চাইলুম। রাত্রে এক বোতল করিয়া বীয়ার আমাদের প্রত্যেকের প্রাপ্যের মধ্যেই ছিল,—পরিবর্ত্তে সোডা। বীয়ারটাই লইতাম, তাহাতে বহু উপকার ছিল;—ম্যাথর ও ফলোয়াররা তাহার জন্য ও তাহার প্রত্যাশায় বিশেষ বাধ্য ছিল, অনেক কাজ পাইতাম।

সকলেই আধ-মরা হইয়া পড়িয়াছিলাম, চা-পানান্তে সত্যই যেন শরীরটা ফিরিয়া পাইলাম। রাত্রি সাড়ে তিনটা আন্দাজ সকলে শয্যা লইলাম। ঘটনাগুলো তখনো মাথায় ঘুরিতেছিল, কিছুতেই নিদ্রা আর আসে না। সারেংজির সেই 'খোদা মালিক' কথাটাই বারবার

স্মরণ হইতে লাগিল, ঐ সঙ্গে তাহার সেই সার্থক উক্তি "ক্লাইভ" খুব লক্ষ্মীমন্ত—ডুব্‌তে জানে না" মনে পড়িল। "ক্লাইভ যে লক্ষ্মীমন্ত—ডুবতে জানে না"—সেটা আমাদের কাছে নূতন কথা নয়; কিন্তু দুই শতাব্দী পরে, লৌহ-পরিচ্ছদে কাষ্ঠের ক্লাইভ যে আজ এতটা মেহেরবানী করিবেন তাহা ভাবিতে পারি নাই; কারণ অনেকেই নিজে ডুবিতে জানে না,—কিন্তু ডোবাতে মজবুৎ। তাহার পর মনে হইল স্টুয়ার্ড্ বলিতেছিলেন, জাহাজ ৭.৮ ঘণ্টা পাছু হাঁটিয়া জান্ বাঁচাইয়াছে;—এটা আমরা বদ্ধাবস্থায় বুঝিতেই পারি নাই। সে বিশাল বারিবেষ্টনের মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ বুঝিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা; সেখানে এগুলেও যা, পেছুলেও তাই। জমি নাই,—আছে কেবল জল আর জাহাজ!

নস্য লইবার জন্য উঠিলাম। পঞ্চানন বলিল—"আমারো ঘুম হচ্চেনা মশাই; পুনর্জন্মের পর যেন কেমন ভোম্‌লা মেরে গিছি! চাকরীতে নমস্কার মশাই; ডাঙ্গা দিয়ে পথ থাকে ত পায়ে পায়ে ফিরি!" আমি বলিলাম—"এ রকম ঝড় ত নিত্য লেগে নেই, আমাদের পৌঁছুতে আর ৪.৫টা দিন,—কোন রকমে কেটেই যাবে!" পঞ্চানন পুনরায় বলিল—"এদিকে যে চার মিনিটে চৌঘুড়ি মাৎ হয়ে যায় মশাই! কি ভুলই করেছি, এ-পথে যে আবার ফিরতে পারি এমন ত বোধ হয় না।" আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম,—"যত সাবধানই হই আর যে পথেই যাই, মানুষ ভগবানকে ঠকাতে পারে না; ভয় কি! তাঁর জিনিস তিনিই আগ্‌লাবেন, যাঁর মাল তিনিই সাম্‌লাবেন; এখন ঘুমিয়ে পড়—কাল আর্ এ ভাব থাক্‌বেনা।" সে আর কথা না কহিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল, আর সাড়া-শব্দ পাইলাম না। আমার একই অবস্থা পাঁচটা পর্য্যন্ত চলিয়াছিল; যখন উঠিলাম তখন আটটা বাজিয়া গিয়াছে, মজুমদার ভায়া তখনো নিদ্রিত।

উপরে গিয়া দেখি, সবই পূর্ব্ববৎ মামুলিভাবেই চলিয়াছে; বেশীর মধ্যে মাঝে মাঝে এক একবার horrible, terrible, awful; কোথাও ভীষণ, ভয়ঙ্কর, ভৈরব প্রভৃতি শব্দ কাণে আসিতেছে মাত্র। অভিধান তাহার অধিক আয়োজন রাখেন না। স্নানাহারের পর সেটাও থামিয়া গেল, অনেকেই শয্যা লইল। চাটুয্যে ও পঞ্চানন কিন্তু তখনো অন্যমনস্ক। আমরা পাকা খাতায় নাম-লেখানো নকোর, আমাদের আড়াই পা অন্তর, বিভীষিকাগুলা ভুলিয়া যাওয়াই আদত (অভ্যাস), কারণ উপায়ান্তর নাই। বাল্যকালে ভূতের ভয়টাই জানিতাম; বয়সে সাপের ভয়ে বাঘের ভয়ে সাবধান হইতে শিখাইয়াছে; কিন্তু সংসারে অনটন ভয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যেখানে আশ্রয় লইয়াছি সে-ই যথার্থ ভয় (dread) কাহাকে বলে তাহা শিখাইয়াছে,—ভয়ের প্রকট মূর্ত্তি সেইখানেই দেখিয়াছি। তাহাতে এই ধারণাই দৃঢ় হইয়াছে—কোন ভয়ই এত ভয়ঙ্কর নয়,—বোধ করি মৃত্যু-ভয়ও নয়। লোকবিশেষে ও প্রবৃত্তিবিশেষে—চাকুরী অপেক্ষা বড়ও কিছু নাই, ওর চেয়ে ভয়েরও কিছু নাই, ছোট কাজও কিছু নাই,—ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

আমাদের এই জাহাজী জীবন-সঙ্কটটার দশ বৎসর পরে সুবিখ্যাত "White Star Line" কোম্পানীর অভিনব সৃষ্টি, একাধারে দুর্গ ও প্রাসাদ,—সুদৃঢ়, দুর্ভেদ্য, বিপুলকায়, অদ্বিতীয় ও অমর আখ্যাপ্রাপ্ত, স্বনামখ্যাত Titanic (টাইটানিক্) জাহাজ, প্রায় তিনকোটি টাকায় তৈয়ার হইয়া, বিপুল সোর্-সমারোহে সমুদ্রবক্ষ আলোকিত করিয়া ভাসে, এবং সাউদাম্‌টন্ বন্দর হইতে নিউইয়র্ক অভিমুখে যাত্রা করে। জগতের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞ ও মাতব্বরেরা সার্টিফিকেট্ দিলেন,—ইহা জলে ডুবিবে না, আগুনে পুড়িবে না, অর্থাৎ বৃত্রাসুর বা হিরণ্যকশিপুর একজন! সপ্তম দিবসের রাত্রে, এই তার

প্রথম সফরেই,—পাষাণ নয়, তুষার-শৈলের সংঘর্ষে পড়িয়া, অতগুলি বিশেষণের বোঝা আর ২১৯৬টি নরনারী লইয়া, তিন ঘণ্টার ভিতরেই আট্‌লান্টিক্ মহাসাগর মধ্যে আত্মসমর্পণ করে। মানুষের গর্ব্বের মূল্য এই! শুনিতে পাই যখন আর প্রাণরক্ষার কোন পথই ছিল না তখন কেহ কেহ নিজেকে নিজেই গুলি করিয়া আত্মহত্যা করেন। এটার অর্থ বুঝিতে পারি। কিন্তু, বাকি সব নাকি নিরুদ্বেগে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন,—এটা বোঝা কঠিন। আবার কাপ্তেন স্মিথ্ শেষ মুহূর্ত্তে সকলের সহিত অপার ডেকে দাঁড়াইয়া ব্যাণ্ডের সুরে সুর মিলাইয়া "Nearer to Thee O God" গাহিতে গাহিতে একত্রেই নাকি ইহ জগতের শেষ অবলম্বন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ইহা যেমনি করুণ, তেমনি বীরোচিত ও তু'শো বাহবার জিনিষ।

দশ বৎসর পরে ভাবিয়া দেখিলাম, ঐরূপ স্থলে processটা (পদ্ধতিটা) এক না হইলেও আমাদেরও শেষ ফলটা সমানই দাঁড়াইত,—অর্থাৎ—মরা। অবশ্য process-এর জন্য কিছু নম্বর কাটা যাইত বটে। কারণ ব্যাণ্ডও ভাল লাগিত না, বিদ্রূপের মত বোধ হইত। ভূপালী ভাঁজিতেও পারিতাম না, স্বর বন্ধ হইয়া যাইত। যাহা হউক, সে-সময় উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের প্রধানতম চিত্রশিল্পী যিনি কল্পনাকে যথাসম্ভব রূপ দেন, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর C. I. E. মহাশয় "প্রবাসী"তে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই ঢেরাসই রহিল।

বৈকালিক চায়ের মজ্‌লিসে বোঝা গেল, সকলের ঝড়ের ঝোঁক্ কাটিয়া গিয়াছে—স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে—সকলেই পূর্ব্ববৎ কথাবার্ত্তায় ও হাস্যপরিহাসে যোগ দিয়াছে।

মজুমদার-ভায়া কি কারণে নীচে গিয়াছিল, উপরে আসিয়াই বলিল—হরিপদর এমন গলা, তা'ত জানতাম না! নীচে এমন গান

লাগিয়েছে—লোক জমা হয়ে গেছে;—দেখছি—এদের দু'টিকে (পঞ্চানন ও হরিপদকে) পেয়ে রত্নলাভ করা গেছে।"

আমাদের বড়বাবু (বোসজা) বড়-জোর তিন চার বৎসর হইবে—চল্লিশ পার হইয়া থাকিবেন,—সুতরাং সকল সখই বর্ত্তমান,—আবার নিজে গাইয়ে। "তবে চল হে একটু শুনে আসা যাক্,"—বলিয়াই তিনি উঠিয়া পড়িলেন;—আমরা ত প্রস্তুতই ছিলাম। কেবল আমাদের প্রোজেইক্-প্রবর দত্তজা উঠিল না।

মজুমদার বলিল,—"সিঁড়ির নীচে থেকেই শুনতে হবে,—হরিপদ আমাদের দেখতে পেলেই থেমে যাবে।" তাহাই করা হইল,—উঁকি মারিয়া দেখি—মজ্‌লিস্ বটে! প্রায় পঞ্চাশজন উপস্থিত,—মধ্যস্থলে হরিপদ, পঞ্চানন ও চাটুয্যে; আর সকলে তাহাদের ঘিরিয়া বসিয়াছে। আবদুল্লা সহাস্যবদনে ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া সারেঙ্গী বাজাইতেছে; খুব মৃদু ঠেকাও চলিয়াছে। গত রজনীর ঝড়ের উপযুক্ত retort (পাল্টা জবাব) বটে। গান এমন জমিয়াছে যে, কাহারও মুখে টুঁ-শব্দটি নাই। ধাতুময়-বস্তু-বহুল জাহাজের মধ্যে,—হরিপদর সুকণ্ঠে,—ভানুসিংহের—"কো তুঁহু বোলবি মোয়্"; —এমন সুমধুর লাগিল যে, আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। কলোয়ার্‌দের সঙ্গে বসিয়া এরূপভাবে ভদ্র সন্তানের গান গাওয়াটা যে কতটা অভব্য ও অশোভন, তাহা ভাবিবার অবকাশই রহিল না। কিছুক্ষণ পরে "বাঃ বাঃ, বাহবা বাহবা, আর—ওহো—ওহো"-র মধ্যে সঙ্গীত শেষ হইল। গীতটির সুন্দর ভাব ও ভাষা, সকল শ্রেণীর শ্রোতারই সম্যক উপলব্ধি হওয়ায় উপভোগে কাহারও বাধে নাই। "আহারের সময় সন্নিকট,—বড় বাবু এখনি নীচে আসিবেন,"—এই বলিয়া হরিপদ নীরব হইল। সকলেই অনিচ্ছায় উঠিল ও তারিফ করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে চলিল। আবদুল্লা

জোর্-সেলাম ঠুকিয়া—"আচ্ছা বাবু চীন পহুঁছ্‌কে ছোড়েঙ্গে নেহি," বলিয়া গেল।

আমরা সিঁড়িতে উঠিতেছি, পশ্চাৎ হইতে পঞ্চানন ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"এই-যে, আপনারাও এসেছিলেন দেখচি! ফার্স্ না দেখে ফিরবেন না,—চাটুয্যেকে অনেক ক'রে গাইতে রাজি করেছি। হরিপদ না গাইলে সে গাইবে না, তাই হরিপদকে গাইতে হ'ল। গান্‌টা হিন্দি-ঘেঁশা ব'লে ভিড় হয়ে পড়েছিল। যা হ'ক তাদের তাড়ানো গেছে, এইবার চাটুয্যের পালা। আপনাদের কিন্তু শুনতেই হবে, আমি চল্লুম, একটু গা-ঢাকা থাকবেন।" এই বলিয়া পঞ্চানন দ্রুত চলিয়া গেল। এ ব্যাপারটা শুধু শুনিবার নয়—দেখিবারও জিনিষ; তাই আমরা যতটা সম্ভব অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলাম।

পঞ্চাননের অনেক সাধ্য-সাধনায় এবং হরিপদ যখন স্মরণ করাইয়া দিল—"এই বড় গঙ্গার উপর কথাটা স্বীকার করেছেন,—একটা যা হয় গেয়ে সেরে দিন,"—চাটুয্যে মহাসঙ্কটে পড়িল। পঞ্চানন পুনরায় বলিল—"উনি একটা ঠাকরুণ-বিষয় গাইবেন বলেচেন।" রেহাই কোন প্রকারেই নাই দেখিয়া চাটুয্যে তখন কয়েকবার কাসিয়া—"কার্ সাধ্য"; হুঁ "কার্ সাধ্য", দু' চার বার বলিতেই, পঞ্চানন বলিল—"ও কি কথা! কার্ সাধ্য আবার কি! যখন বলেচেন,—একটা গাইতেই হবে। আপনার কথায় হরিপদ আধঘণ্টা কষ্ট ক'রেচে;—এখন 'কার্ সাধ্য'—কি রকম কথা?" চাটুয্যে বলিল—"কলকেতার ম্যাড়া কিনা,—গান বোঝ না কথা কও;—আমি ত গান আরম্ভই করে দিছি" এই বলিয়া পুনরায়—"কার্ সাধ্য" হুঁ—"কার্ সাধ্য ও মা" হুঁ "কার্ সাধ্য ও মা সীতে" হুঁ—"তব রন্ধন দুষিতে"—হুঁ—হুঁ, ইত্যাদি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি চাটুয্যে একটু লাজুক—মেয়েলি ভাবাপন্ন মানুষ; তাহার

সহিত কাসি ঘড়্ঘড়ানি ও হরদম্ হুঁ মিশিয়া, একদম্ চমৎকার চচ্চড়ি দাঁড়াইয়া গেল। পঞ্চানন উৎসাহ দিবার জন্য প্রথম দু'চার বার "বাঃ বেশ্" বলিয়াছিল,—শেষ থামাইতে পারিলে বাঁচে,—বিশেষ করিয়া নিজের হাসিটা। সেটা যেরূপ রুকিয়া আসিতেছিল, তাহাকে না রুখিলে, একটা রপ্চারের সম্ভাবনা। তাই নিজেকে সামলাইবার জন্য পঞ্চানন উত্তেজিতভাবে বলিল—"এই বুঝি আপনার ঠাকরুণ-বিষয়?" চাটুয্যেও খুব উত্তেজিত হইয়া বলিল—"আইরিটোলার আহাম্মুক কিনা, বোঝ না আবার গান শুন্তে চাও! এর চেয়ে একটা খাঁটি ঠাকরুণ-বিষয় শোনাতে পার ত নাক্ কেটে ফেলে দেব। দাশুরায় রন্ধনের কথাটি পর্য্যন্ত খুলেই ব'লে দিয়েছেন,—যাতে মুখ্খুতেও বুঝতে পারে।" পঞ্চানন বলিল—"রন্ধনের কথা বলেচেন ত কি হয়েছে! তা'হলেই বুঝি ঠাকরুণ-বিষয় হ'ল?" চাটুয্যে এইবার রাগ করিয়াই বলিল—"ঠাকরুণদের কাজটা তবে কি শুনি? লোকে তাদের কি করতে রাখে? কলকেতার মুখ্খু কিনা—সকল কথাতেই ঠোকর্ মারতে আসেন!"

ঠাকরুণ-বিষয়ের এই গভীর গূঢ়তত্ত্বের মধ্যে আমরা কেহই ঢুকিতে পারি নাই,—শুনিয়াই যাইতেছিলাম। এতক্ষণে মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হইল,—এখন অর্থটা সকলের কাছেই হাত-পা বার ক'রে দেখা দিলে! ভিতরে পঞ্চানন ও বাহিরে মজুমদার—এক সঙ্গেই,—"ওরে বাবা রে!" বলিয়া হাসির ফোয়ারা ছাড়িয়া দিল। পরে মজুমদার ভায়া হাঁকিয়া বলিল—"পঞ্চানন পালিয়ে এস,—পালিয়ে এস। ইনিই সেই ভারবী, —মরেননি,—আমাদেরই মারতে এসেছেন!" পঞ্চানন বলিল—"না মশাই,—ইনিই সেই আমাদের হাতীবাগানের পণ্ডিত মশাই;—তিনি সহজ আর সোজাসুজি অর্থই করতেন। 'সিংহনাদ' মানে বলে

দিয়েছিলেন—'সিংহের মল্' ,—যেমন হাতীর নাদ, ষাঁড়ের নাদ, অর্থাৎ বড় বড়দের মল্‌কে 'নাদ' বলে।"

মজলিস্ ভাঙ্গিয়া চার টুকরা হইয়া গেল; হরিপদ হাসিতে হাসিতে গিয়া শয্যা লইল। পঞ্চানন—চাটুয্যের পদধূলি লইয়া পলাইল! চাটুয্যে বসিয়া বসিয়া "যত সব চ্যাংড়ার দল্",—এই পাঠ আবৃত্তি করিতে লাগিল। আমি জাহাজের এক প্রান্তে গিয়া "ঠাকরুণ-বিষয়ের" অর্থ-গৌরবটা উপভোগ করিতে লাগিলাম। কেবল বড়বাবু ধীরে ধীরে উপরে গিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন।

—২৪—

রাত্রে গরম বোধ হওয়ায় অপার ডেকে গিয়া একখানা ছোট সতরঞ্চি পাতিয়া শুইলাম,—তখন রাত দুইটা। ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি—উষার উন্মেষ;—জাহাজ তখন একটি সুন্দর দ্বীপের নিকট দিয়া চলিয়াছে। আমরা দ্বীপটি হইতে আন্দাজ পনের গজ দূরে। সমুদ্রবক্ষে অন্যান্য ক্ষুদ্র দ্বীপ বা পাহাড়,—পাথর আর গুল্মাদি লইয়া মাঝে মাঝে দেখা দিয়াছে। এটি যেন বড় লোকের একটি সখের (tastefully) সাজানো বাগান;—বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, নানা বর্ণের পুষ্পে ও ফলে, এবং মনোমুগ্ধকর পারিপাট্যে পরিশোভিত। উষার রঙ্গিন আভা তাহার উপর এক অপূর্ব্ব আলোকপাত করিয়াছে। উঠিয়া বসিলাম;—সে কি অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য! মনে হইতে লাগিল—এ সেই রূপ-কথার রাজ্য! কিন্তু সূর্য্যোদয়ে কুয়াশার মত, অরুণালোকের আভাস মাত্রেই—তাহা নভে বিলীন হইয়া গেল! আমি অবাক্ হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম; সমস্তটা স্বপ্নের মত বোধ হইতে লাগিল। জাগ্রত অবস্থায়

দেখা, এতটা শৃঙ্খলাময় সুস্পষ্ট দৃশ্য যে অলীক, তাহা আজিও মনকে বুঝাইতে পারি নাই।

সেই দিনই সন্ধ্যার প্রাক্কালে অপর একটি ঘটনায় সন্দেহটা বাড়াইয়া দিয়া গেল। তখন একটি জনপদের নিকট দিয়া চলিয়াছি। এটিও একটি দ্বীপ। তটভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া বিস্তৃত সুন্দর সুহরিৎ ক্ষেত্র, মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর; কিনারায় ছোট ছোট ডিঙ্গি। কৃষক ও ধীবর জাতীয় লোকই এ ক্ষুদ্র দ্বীপটির অধিবাসী বলিয়া বোধ হইল। সান্ধ্য-গাম্ভীর্য্যে স্থানটি আমার নিকট ক্রমেই ভাবময় হইয়া উঠিতেছিল,—আমি কেবিনে বসিয়া তন্ময় হইয়া দেখিতেছিলাম। এমন সময় দেখি—সহযাত্রীরা দ্রুতপদে উপরের ডেকে ছুটিয়াছে। ব্যাপারটা কি তাহা জানিবার জন্য আমিও উপরে গেলাম। দেখি—জাহাজের স্থানে স্থানে কে-যেন হিঙ্গুল ছড়াইয়া দিয়াছে। সকলেই দেখি, পশ্চিমের ডেকে দাঁড়াইয়া আকাশের পানে চাহিয়া আছে। আমিও চাহিলাম,—যাহা দেখিলাম তাহা কখন ভুলিতে পারিব না; সে এক বর্ণনাতীত দৃশ্য! সমুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ ক্রমোচ্চ পার্ব্বতীয় জনপদটি যেন সোপানের মত উঠিয়া গগন স্পর্শ করিয়াছে! উপরে—ঠিক তাহার দুই পার্শ্বে উচ্চ অট্টালিকা সকল (দেব-ভবন সকল) নানা বর্ণে ও স্বর্ণচ্ছটায় শোভা পাইতেছে। আবার দুই পার্শ্বের অট্টালিকাগুলির পাদদেশ হইতে দুইটি প্রশস্ত পথ সমরেখায় নামিয়া আসিয়া সমুদ্র স্পর্শ করিয়াছে। পথ দুইটিতে আবিরের ছড়াছড়ি,—দেবাঙ্গনারা এই মাত্র যেন 'হোলি' খেলিয়া গিয়াছেন! তাঁহারই আভা—জলে ও জাহাজে প্রতিবিম্বিত হইতেছে।

যিনি এদৃশ্য না দেখিয়াছেন, তিনি যেন সহজেই বলিবেন—"ওটা মেঘের মেলা।" যিনি দেখিয়াছেন, এমন কেহ ও-কথাটা বলিলে—

শ্রুত-সংস্কার যথেষ্ট বিজ্ঞতাটা করিবেন। কিন্তু আমি তাহা পারিতেছি কই! আমরা যে এই দৃশ্যটা প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া দেখিয়াছি; আর এই দীর্ঘ সময়-মধ্যে তাহার তিলমাত্র পরিবর্ত্তনও ঘটিতে দেখি নাই; তাই এই নিখুঁত সুশৃঙ্খল ব্যাপারটা প্রহেলিকার মতই রহিয়া গিয়াছে। নিসর্গলীলা ত বটেই, অথচ হাসির কথা হইবে যদি বলি,—বোধ হয় গগনের স্বচ্ছ আবরণ ভেদ করিয়া, এই নিভৃত নিকুঞ্জে, দেব-সম্পদের কণামাত্র আভাস দেখা দিয়াছিল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেক কথাই ত আড্ডার আবিষ্কার বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি;—পরে যখন অচেতন গ্রামোফোন্ গান শুনাইল, টেলিফোনে বাক্য-বিনিময় চলিল, বে-তার্ বার্ত্তাবহ সংবাদ বহন করিল, মানুষ আকাশে উড়িল,—তখন আবার অবনত মস্তকে সে-সব স্বীকার করিয়া লইতেও বিলম্ব হয় নাই। যাহা হউক, যে-দেশে "ব্রিটিশ্" ছাপ্ মারা—পায়ের জিনিষটাও ষোল আনা সম্মান পায়, সে-দেশে একজন ব্রিটিশ বিদুষীর কথা, অসম্মান না পাওয়াই সম্ভব। তাই একটু উদ্ধৃত করিলাম;—

" ... You, absorbed in the gathering together of such perishable trash as you conceive good for your self on this planet, you dare, in the puny reach of your mortal intelligence to dispute and question the everlasting things invisible! You, by the Creator's will are permitted to see the Natural Universe,—but in mercy to you the vail is drawn across the Supernatural! For such things as exist there, would break your puny earth brain as a frail shell is broken by passing wheel —and because you cannot see, you doubt! ..."

পঞ্চানন আসিয়া বলিল—"কি বলুন দিকি মশাই?" আমি অন্যমনস্কভাবেই বলিলাম—"তোমার কি বোধ হয়।" পঞ্চানন উত্তর করিল—"এই অকূল সমুদ্রের মাঝখানে পরীর-দেশ নয় ত?" আমি হাসিয়া বলিলাম—"ঐরূপই কিছু হবে,—চাটুয্যেকে সাবধান!" ভাবিলাম,—কেবল আমারই নয়,—দৃশ্যটা সকলেরই মনে প্রশ্ন তুলেছে।

এক জাতের কথাগুলা এক জায়গায় শেষ করাই ভাল। কলিকাতা ছাড়িয়া ক্রমে সাত-সমুদ্রের জল দেখিলাম। কখন বাদামী, কখন ফিকে নীল, কখন গাঢ় নীল—পরেই কালো, আবার আশমানী,—কখন সবুজ, কখন গৈরিক! আশ্চর্য্য এই—যখনি যখনি জলের রং বদল হইয়াছে, তখনি লক্ষ্য করিয়াছি—এক জল অন্য জলের সীমা-রেখা কোথাও এক চুল অতিক্রম করে নাই! যতদূর দৃষ্টি চলে, দেখিয়াছি সেই সুদীর্ঘ বিভাগ, সদা-চঞ্চল উত্তাল-তরঙ্গ-তাড়নে কোথাও বাঁকে না; এত যুদ্ধেও কেহ কাহাকে আপনার সূচ্যগ্র অংশ ছাড়ে না! যখনি কেহ কাহারও উপর চড়াও হইয়াছে, অমনি trespasser-কে (অনধিকার প্রবেশকারীকে) অপরটির রংয়ে পরিণত হইতে হইয়াছে, মুহূর্ত্তের জন্যও সীমারেখার নড়্‌চড়্‌ হয় নাই। সে যেন রুল্‌টানা লাইন বা আইন। দেখিলে বড় বড় বিস্‌মার্কের বাক্‌রোধ হয়।

সে-দিনকার সন্ধ্যাটা ঐ-সব কথা লইয়াই কাটিল।

—২৫—

পাড়িটা খুব লম্বা হ'লেও হংকং ছাড়ার পর আমাদের সরাসরি উত্তর চীনে—অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট মোকামে পৌঁছিবার কথা ছিল। টাইফুন্‌—মাঝে পড়িয়া প্রাণটা লইল না বটে, কিন্তু ১০।১২ ঘণ্টার কয়লা

লইয়া যায়;—জান্ বাঁচিল, কিন্তু হিসাবের কয়লায় টান্ ধরিল। কাজেই তাহার জন্য জাহাজকে চীফু বন্দরে যাইয়া নঙ্গর করিতে হইল। বন্দরটি সহরে সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্যের বেড়া দিয়া ঘেরা নয়; জাহাজের ভিড় কম। Battle-ship-এর বালাই নাই man-of-war-এর মোড়লীও দেখিলাম না। যেন একটি শান্ত পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সময়টাও সন্ধ্যার প্রাক্কাল ছিল,—বেশ উপভোগ্য বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল।

কয়েকখানি ছোট গরিবী হালের ডিঙ্গী, আর দু'একখানি ছোট লঞ্চ্, আমাদের জাহাজের চারিদিকে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডিঙ্গি-গুলিতে বালক ও যুবকেরা পিচ্, অ্যাপেল্, আঙ্গুর, চীনের-বাদাম প্রভৃতি ফল আর দেশী মদ বেচিয়া বেড়াইতে লাগিল। পিচ্‌গুলি ভারতের পিচ অপেক্ষা তিনগুণ বড়, বর্ণও চিত্তাকর্ষক। অ্যাপেলগুলি ছোট—টক্‌টকে লাল, যেন মোমের খেল্‌না, স্বাদু ও সুমিষ্ট। দশ পয়সায় (ten cent) পঁচিশটি হিসাবে অনেকেই কিনিল। দিশী-মদ দশ পয়সায় এক বোতল (pint)—আবদুল্লার দল ঝুঁকিয়া পড়িল! চীফ্ সাহেব হুকুম দিলেন—কেহ এক বোতলের বেশী কিনিতে পারিবে না। আবদুল্লা বিনীতভাবে তথাস্তু বলিল এবং যাহারা মদ ছোঁয়না এমন সব I, thou, he, she, it, খাড়া করিয়া খরিদ আরম্ভ করিয়া দিল ও যজ্ঞের আয়োজন জড় করিয়া ফেলিল।

বিক্রেতারা সমুদ্রকুলবর্ত্তী জঙ্গ্‌লী বা অসভ্য চীনে বলিয়াই বোধ হইল,—তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই উলঙ্গ, কাহারো কাহারো নাম মাত্র লেংটি আছে। মাল বেচা শেষ হইলে তাহারা ইঙ্গিত করিয়া বলিতে লাগিল—"সমুদ্রে টাকা পয়সা ফ্যালো,—আমরা তোমাদের সাক্ষাতেই ডুব মারিয়া তাহা তুলিয়া দেখাইতেছি, অর্থাৎ তুলিয়া লইতেছি।"

তামাসা দেখিবার জন্য অনেকেই কিছু কিছু ফেলিতে লাগিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও ডুব মারিয়া তাহা তুলিয়া দেখাইতে লাগিল ও নিজের নিজের ডিঙ্গিতে সেগুলি ফেলিতে লাগিল। হায়-রে পয়সা! যাহার জন্য আজ আমরা সমুদ্রে ভাসিতেছি, তাহারই জন্য এই বালকেরা সমুদ্রে ঝাঁপ দিতেছে! জগতে সর্ব্বত্রই তোমার জয়। অন্যান্য বন্দরেও এই পয়সা তোলার অভিনয় ছিল; কিন্তু সহর দেখা আর পত্র পোস্ট করার ঝোঁকটা মাত্রায় বেশী থাকায়, এটা দেখার তেমন অবসর হয় নাই। আশ্চর্য্য বটে—ক্ষুদ্র দুয়ানিটি পর্য্যন্ত তাহাদের এড়াইয়া যাইতে পারে না।

যাহারা লঞ্চে আসিয়াছিল, তাহারা চীনের সওদাগর শ্রেণীর লোক,—বেশ সভ্য, তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদও সুন্দর। লঞ্চে বিবিধ বিলাস-সামগ্রী—সাবান, বাতি, ছবি, সিগারেট, চা, চীনামাটির বাসন, চায়ের Set প্রভৃতি ত ছিলই,—কিন্তু তাহাদের পণ্যের মধ্যে রেশমী বস্ত্রই প্রধান;—নানা রংয়ের রেশমের থান, রুমাল, সুন্দর কারুকার্য্য-করা টেবিল দর্পণ প্রভৃতির আচ্ছাদন, ইত্যাদি ইত্যাদি। সস্তাও বেশ;—যে রুমাল কলিকাতায় পাঁচ সিকে দেড় টাকা, এখানে অনেকেই তাহা চার পাঁচ আনা করিয়া কিনিলেন। সাধারণ ব্যবহারের বা কর্ম্মস্থানে (আপিসে) ব্যবহারের সুট্ প্রস্তুত করিবার যে রেশম দেখিলাম, তাহা ash-colour-এর (ছায়ের রংয়ের)। চার পাঁচ টাকা হইতে দশ এগার টাকায় এক থান পাওয়া যায়। সার্টিন-জিনের মত খোল, সার্জ্জ বা রিবের বুনোন্, খুব টঁ্যাক্‌সই। এক থানে একটি সম্পূর্ণ সুট্, অথবা দুইটি কোট ও একটি ওয়েস্ট-কোট হয়।

সুটের জন্য চার পাঁচ টাকা করিয়া থান—আমরা অনেকেই লইলাম; কারণ, পরিচ্ছদের আবশ্যকটা যে আমাদের কতখানি, তাহা যতই অগ্রসর হইতেছিলাম, ততই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল ও পীড়া

দিতেছিল। দামী রেশমের বয়ান্, অনাবশ্যক বোধে বাদ দিলাম। ফল কথা—চীফু জায়গাটি রেশমী কাপড়ের জন্য ও রেশমের কারবারের জন্য প্রসিদ্ধ। ইতিপূর্ব্বে যে, কায়চু ও শ্যান্-টংএ (Kao-chiu-Shan-tung এ) জার্ম্মানরা বেশ বাঁশগাড়ী করিয়া বসিয়াছিল ও বিগত জার্ম্মান-যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, জাপান যাহা অবরোধ ও অধিকার করে এবং যেখান হইতে জার্ম্মানীর জাহাজ 'এম্‌ডেন্' সরিয়া আসিয়া দিন কয়েক আমাদের হিম্‌সিম্ খাওয়ায়,—এই চীফু সহরটি তাহারই ঠিক উত্তর পার্শ্বে—পিচিল উপসাগরের তীরেই অবস্থিত।

পরদিন প্রাতেই জাহাজ ছাড়িল। এইবার আমাদের যাত্রাপথটা (Gulf of Pichili-র) পিচিল উপসাগরের উপর দিয়া এবং তখন-কার রুশের অধিকারগত পোর্ট আর্থারের (Port Arthur-এর) ঠিক দক্ষিণ বা নীচে দিয়া। সিঙ্গাপুর পার হইয়া পর্য্যন্ত এক প্রকার চীনের জলেই চলিয়াছি। চীফুতে নামা ঘটে নাই, তবে পত্র পোস্টিংটা, সরকারী ডাকের সামিল করিয়া দিয়া সমাধা করা হইয়াছে। সুতরাং জলে জলেই আছি,—জল ছাড়া কথা নাই,—ঘুরিয়া ফিরিয়া সমুদ্রের উপরই তাল রাখিতে হয়। বাল্যকালে দেখিয়াছি—পোটো প্রতিমা চিত্র করিতেছে। কার্ত্তিকের গায়ে রং দিতেছে, কিন্তু গণেশের পেটে তুলি মুছিতেছে,—লক্ষ্মীকে টিপ্ পরাইতেছে,—গণেশের পেটে তুলি মুছিতেছে; মা দুর্গার পায়ে আল্‌তা পরাইল,—গণেশের পেটে তুলি মুছিল; সরস্বতীর চোখ চান্‌কাইল,—গণেশের পেটে তুলি মুছিল; সিঙ্গির জিহ্বায়, ময়ূরের ঠোঁটে, ইঁদুরের ল্যাজে রং দিল,—তুলি মুছিল গণেশের পেটে! অথচ গণেশের পূজাই সর্ব্বাগ্রে। দেখিতেছি—আমারও এ-ক্ষেত্রে সমুদ্রই গণেশের পেট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে—কূলের কাছাকাছি হইয়াছি;—আজ আর কাল,—এই দুইটা দিন

কাটাইতে পারিলে, এই মহান্ ও বিরাট বিভূতিকে প্রণাম করিয়া তীরস্থ হই।

চীন-সমুদ্রের হরিদ্রাংশ (Yellow-sea) উত্তীর্ণ হইয়া, পিচিলি উপসাগরের (Gulf of Pichili-র) প্রবেশ-পথের কিঞ্চিৎ উত্তরেই উই-হাই-উই (Wei-hai-wei)। এটি একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। এই উই-হাই-উই দ্বীপটির এমন চোটের-জায়গায় স্থিতি যে, হাত বাড়াইলেই—উত্তরে পোর্ট আর্থার, পূর্ব্বে কোরিয়া, আর পশ্চিমে চীন;—সকলগুলিই সন্নিকট। এটি ইংরাজের ইজারা-মহল, কি চীনের নিকট হইতে খেসারৎ (Indemnity) আদায়ের চাপ্-দখল্, তাহা নাকি খোলসা কেহ জানেন না। তাই শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিপিন-বিহারী গুপ্ত মহাশয় জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা "মাসিক বসুমতী"তে—প্রশান্ত মহাসাগর শীর্ষক প্রবন্ধে—চীন-জাপান যুদ্ধে পরাজিত চীনের ১৮৯৫ খৃস্টাব্দের সন্ধির সংস্রবে ও তাহার পরবর্ত্তী তিন বৎসর মধ্যে বিবিধ ঘটনার অন্যতম রূপে, উই-হাই-উই সম্বন্ধে এই মাত্র বলিয়াছেন—"ইংরাজও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তিনি বাক্যব্যয় না করিয়াই উই-হাই-উই দখল করিয়া তথায় বৃটিশ পতাকা উড়াইলেন।" তাহার পরেই জার্ম্মান সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার ভাবার্থ—জার্ম্মানীও দুইজন মিশনরী হত্যার অজুহাতে ক্ষতিপূরণ হিসাবে গায়ের জোরে কিয়াও-চাও বন্দরে ও সমগ্র শ্যান্-টং প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিলেন।

কোথাও কোন দুই পক্ষে যুদ্ধ বাধিলে সভ্য শক্তিশালী প্রবল জাতিরা অনুগ্রহ করিয়া—নয় সালিশীরূপে, না হয় সাক্ষীরূপে, অযাচিত ভাবেই, শান্তিরক্ষার্থ আসিয়া উপস্থিত হন। পরে কষ্ট স্বীকার, সময় নষ্ট, প্রভৃতি খাতে কিঞ্চিৎ লাভ বা খরচা আদায় না

করিয়া ফেরেন না। ইহার নাকি একটা মস্ত উপকারিতা আছে ;—কোন যুদ্ধমান পক্ষ বে-আইনী বা অন্যায় কিছু করিতে সাহস পান না। এই দয়ার কাজের জন্য পাঁচ হাজার মাইলের পাল্লা মারা অল্প উদারতা নহে, ত্যাগস্বীকারনাও ততোধিক।

চীন বোধ হয় মিনতি জানাইয়া জার্ম্মানী হইতে মিশনরী আমদানী করে নাই। যাহা হউক, এই সব ব্যাপারে কাশীর এক সম্প্রদায় দালালদের কথা মনে পড়ে। কেহ কাশীর চকে কোন দোকানে কিছু কিনিতেছেন, তাঁহার অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতে কোন দালাল, দোকানদারকে একবার দেখা দিয়া বা একটা সেলাম দিয়া চলিয়া গেল। তাহার অর্থ আমার প্রাপ্যটা যেন তোলা থাকে! দোকানদারও তাহা তামিল করিতে বাধ্য। তবে দোকানদার দালালিটা নিজের ঘর হইতে দেয় না—খরিদ্দারের মুণ্ডেই চাপাইয়া লয়।—আর এসব ক্ষেত্রে দুর্ব্বলকেই সব চাপটা সহিতে হয় ;—প্রভেদ এই।

শুনিয়াছি, কোন কোন নামী এটর্নী মহোদয় যখন মোটরে যান, পথে বে-আক্কেল মক্কেল যদি নমস্কার করিয়া সাধারণ-সৌজন্য হিসাবে কুশলটা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলে এবং তিনি চলন্ত-গাড়ী হইতে ঈষৎ হাস্য-সংযুক্ত মুখ ও মাথাটা নাড়া-না-নাড়ার মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া যান, পরদিন এটর্নীর সেই অর্থহীন অনুগ্রহ,—তজ্জনিত শ্রম,—সময় নষ্ট,—চোষ্য-চিন্তা-স্রোতে বাধা প্রভৃতি দৈনিক মানসিক ও শৌখিক ত্যাগস্বীকারের জন্য, একখানি অন্ততঃ পঁচিশটাকার পরোয়ানা (bill) মক্কেলের সেই সৌজন্যরূপ অপরাধে আক্কেল-সেলামী আদায় করিতে উপস্থিত হইয়া থাকে। এসকল বর্ত্তমান শিক্ষা ও সভ্যতা অনুমোদিত, সুতরাং অবশ্যস্বীকার্য্য।

—২৬—

আজ শয্যা ত্যাগ করিতে আমার একটু বেলা হওয়ায়, উপরের ডেকে গিয়া দেখি—বড়বাবু (বোসজা) জাহাজের এক প্রান্তে, রেলিং-এর উপর ঝুঁকিয়া উদাসভাবে শূন্যে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে এরূপ স্থানচ্যুত হইতে এক দিনও দেখি নাই,—নিজের ক্যাম্বিসের চেয়ার খানিতে অচল বিগ্রহের মতই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তাই নিকটে গিয়া বলিলাম,—"অকস্মাৎ আজ আপনার আসন টোল্‌ল যে?" তিনি উদাসভাবেই উত্তর দিলেন,—"যখন বুঝতেই পারচি—চেয়ারে বসা চুকৃতে আর বেশী দিন নয়, তখন দিন থাকৃতে ত্যাগের তালিম নেওয়াই ভাল।" তাঁর কথার মধ্যে অনুপ্রাসের অসদ্ভাব না থাকৃলেও আওয়াজে রহস্যের রসমাত্রও ছিলনা! ভাবলুম, জাহাজবাসের এই শেষ দুটো দিন mean করচেন।

এই সময় মজুমদার ভায়া হাসিতে হাসিতে উপস্থিত, সঙ্গে দত্তজা। ভায়ার হাসি দেখিয়া বোসজা একটু বিরক্তির স্বরেই বল্লেন—"আর হাসির সময় নেই, আমিও তোমাদের সঙ্গে আজ একমাস হেসেই কাটিয়েছি, কোন কথাই গায়ে মাখিনি। কিন্তু কাল বাদে পরশু যে-যার সব কাজে বসতে হবে,—সাহেবরা ত আর আমাদের ঠাকরুণ-বিষয় শোনবার তরে তলব করেনি।"

বোসজার সহিত আমার এই পাড়িতেই প্রথম পরিচয়। তাঁকে বেশ আমুদে আর মিশুক বলেই জেনেছি। এইভাব এই প্রথম পেলুম! অকস্মাৎ আপিসের আর সাহেবের নাম শুনে যেন চটকা ভাঙলো; বুকের ভিতরটা যেন 'গিলে' বুলিয়ে কে কুঁচ্‌কে দিলে!

ভাবিলাম—এইবার বোধ হয় স্বরূপের সাড়া দিতেছেন,—বড় বাবুদের ভূমিকা ভাঁজা আরম্ভ করলেন।

আমাকে নীরব দেখিয়া তিনি একটু কড়ি-মধ্যমে নামিয়া বলিলেন—"বাঁড়ুয্যে মশাই বুঝি জানেন না,—আমার গোরের মাটি পর্য্যন্ত এসে গেছে!" মজুমদার ভায়া বলিলেন,—"বাঁড়ুয্যের ত এই ঘুম ভাঙ্গলো! আমরা ওঁর অপেক্ষায় subject (বিষয়টা) ফাঁশ্ করিনি; চায়ের মজলিসের জন্যে reserved (জীইয়ে) রাখা হয়েছে।" আমি ত একদম্ বোকা ব'নে গেলুম।

চা এসে গেল,—কিন্তু চাটুয্যে আসে না। হরিপদ বলিল—"তিনি ট্রঙ্ক্ গোছাচ্চেন্, এখন আসতে পারবেন না, পাঁচু-দা তাঁকে সাহায্য করছেন। আমি তাঁর চা নিয়ে যাই, আর পাঁচু-দাকে পাঠিয়েদি।" বোসজা বলিলেন—"সেই ভাল।" পরক্ষণেই সহাস্য পঞ্চানন—তার দ্বিরদ-রদ-লাঞ্ছিত বিকশিত দশনগুলি সামলাইতে সামলাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বোসজা বলিলেন—"আজ সকালের ব্যাপারটা বাঁড়ুয্যে মশাইকে একবার শুনিয়ে দাও পঞ্চানন।" শুনিয়াই পঞ্চাননের দশনগুলি সহসা যেন শিমূলের কোষ ফাটিয়া শুভ্র সৌন্দর্য্যে বিকাশ পাইল। এখন তাহার পক্ষে একই সঙ্গে দাঁত সামলানো আর কথা কওয়া কঠিন হইয়া উঠিল;—দ্বৈতবাদের ঐ দোষ।

উত্তেজনার তোড়ে সে যাহা বলিয়া গেল, তাহাতে বুঝিলাম,—সে মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছে, শয্যা ত্যাগান্তে চাটুয্যে তাড়াতাড়ি একবার নিজের ট্রঙ্ক্‌টা খোলে। আজ বোধ হয় তার শৌচের বেজায় জোর তলব আসিয়া পড়িয়াছিল, তাই ট্রঙ্ক্‌টা বন্ধ করা ত হয়ই নাই, এমন কি তাহার ডালাটি পর্য্যন্ত ফেলিয়া যায় নাই। এ সুযোগ সামলাইবার মত সংযম না থাকায়, পঞ্চানন উঁকি মারিয়া তন্মধ্যে

অর্দ্ধাধিক স্থান জুড়িয়া এক পুঁটুলি মাটি ও তাহার উপর একটি দেয়ালির প্রদীপ আবিষ্কার করিয়া ফেলে! এই অসীম অতলস্পর্শ সমুদ্র-বক্ষে এক পুঁটুলি মাটির অস্তিত্ব বিস্ময়ের ব্যাপার হইলেও, পঞ্চানন স্থিরই করিতে পারে নাই—সেটা তুক কি যক্! আমাকে নিদ্রিত পাইয়া রহস্যভেদের জন্য পুঁটুলি-সমেত তাই বড়বাবুর নিকট উপস্থিত হয়।

এইখানে পঞ্চাননকে বিরাম দিয়া বোসজা স্বয়ংই সুরু করিলেন,—"আমি ঘুম্ ভেঙ্গে সেইমাত্র বিছানায় উঠে বসেছি, আর পঞ্চানন, তিরিশ সের আন্দাজ সেই স্বর্গাদপি গরীয়সীর গুঁড়ো এনে হাজির করলে। আমাদের আনরপুর পরগনায় বাড়ী, অনেক লোকের অনেক কূট সমস্যা solve (সমাধান) করতে হয়েছে, কিন্তু এ মাটির গাঁটি তত্ত্ব মাথায় ঘেঁশ্ছিল না। এমন সময় মুক্তকচ্ছ চাটুয্যে, ঝড়ের মত এসে পোড়ল। পঞ্চাননের প্রাণ নেয় আর কি! অনেক ক'রে সে আগুন নেবালুম। পঞ্চানন তখন বিনীতভাবে করজোড়ে চাটুয্যেকে বল্লে—'আমাকে কেটে ফেলুন,—দুখ্খু নেই—আপনাকেই প্রাচিত্তির করতে হবে; কিন্তু আগে দয়া করে বলুন প্রভু—এ বিরাট্ বোঝার ব্যাপার ওটা কি?' চাটুয্যে তার কথার উত্তর না দিয়ে আমার দিকে ফিরে বল্লে,—'আপনারাও ত এসেছেন; এ মুখ্খুকে বুঝিয়ে দিন্।' সর্ব্বনাশ! আমার অবস্থাটা তখন বুঝুন! ফশ্ ক'রে বলে ফেল্লুম,—'কেন—বাঁড়ুয্যের স্থাথনি পঞ্চানন! তাঁর যে দুটি ট্রঙ্ক্ ঠাশা! চাটুয্যে তুমিই ওকে ব'লে, কান মলে দাও।' চাটুয্যে খুব খুশী হয়ে বল্লে—'বাঁড়ুয্যে মশাই একটা গোটা মানুষ, আর কলাপোড়াখেগো-বুদ্ধি নিয়ে, এটা বলে কি না,—ওঁর কলকেতায় বাড়ী! চীনে চলেছেন, আর খোঁজ নেই চীনের মাটি বস্তুটা কি; মুখ্খু—হাতে মাটি দেবে কিসে!' এই বলে, পঞ্চাননের হাত থেকে পুঁটুলিটি কেড়ে নিয়ে বিজয়ীর মত চলে গেল।"

শুনিয়া মজুমদার ভায়া—"ওরে বাবারে মেরে ফেল্লে"—বলিয়া, উঠিয়াই লাফাইতে লাগিল ও বলিতে লাগিল—"বাঁড়ুয্যে, আমাকে ধর —জলে পড়ে না জান্‌টা যায়। ওরে ব্বাপ—জার্ম্মানীতে জন্মেছিলেন বিশ্‌মার্ক আর বঙ্গের ভাগ্য অন্ধকার ক'রে চীনে চলেছেন আমাদের এই ত্রিশমার্ক! হায় বঙ্গমাতা—কি দুঃখে এই ওরেবাদ-বুদ্ধি সাগরে ভাসিয়ে দিলে মা!" একটা হাসির ঝড় বয়ে গেল। পঞ্চাননের কবলে এক ঢোক্ চা থাকায়, তাহা সবলে ও সশব্দে এক ঝাপ্‌টা বৃষ্টির মত বর্ষিয়া গেল।

বোসজাকে বলিলাম—"সেদিন এক ঠাকরুণ-বিষয় শুনে, অক্ষয় দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ' পর্য্যন্ত টান্ ধরেছিল, আর আজ?"

বোসজা বলিলেন—"আর আজ আমার চাকরী পর্য্যন্ত টান ধরেছে; আর দ্বিতীয় দত্তটির কথাই স্মরণ হচ্ছে—

'দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে?'

বড় বড় বিলিতী কেউটেকে ধূলোপড়া দিয়ে কেঁচো বানিয়ে এলুম কি চাটুয্যের জন্যে চাকরী খোয়াতে? তোমরা হেস না। পরশু না হয় তরশু, আমাকেই ত লোক বুঝে আর লোক বেছে কাজের ভার দিতে হবে! চাটুয্যে আবার store-keeper (গমস্তা বা ভাঁড়ারী); কেরানী নয় যে পাঁচজনের ভেতর চালিয়ে নেব। তার বোধ করি হাজার টাকা security-ও (জমানতও) আছে। field-এর (অভিযানের) সব দামী জিনিষই গুদামে ঠাশা। শুনেছি শীতের আয়োজন খুব বেশী; প্রায় সব পোষাক-পরিচ্ছদই ক্যানাডা হতে আমদানী। কোন গুদামেই লাখ টাকার জিনিষের কম নেই। তার কোন একটির ভার ত ঐ

মাটির-মুরোদকে দিতেই হবে! তারপর? ঐ ব্রাহ্মণের জামানতের টাকা জল্ আর চাকরী খতম্,—হাতে দড়ির আশাও দুরাশা নয়; —ঐ সঙ্গে আমারও চেয়ার-চ্যুতি! এ অভিযানে বিলাতের সংস্রবে (imperial connection-এ) কাজ-কর্ম্ম, সাহেব-সুবোও অচেনা; —তার ওপর field-এর (যুদ্ধক্ষেত্রের) আইন-কানুন মানেই—মহাপুরুষদের মর্জ্জি।"

বোসজার এক একটি কথা যেন (এক মাস ম্যানিন্জাইটিসের পর) ধাক্কা দিয়া দিয়া চাকৃরির পাকা মূর্ত্তি প্রকট করিতে লাগিল ও পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দিতে লাগিল। ফাঁক পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি চাটুয্যের চাকরীর ভালমন্দ ভেবে চিন্তিত হচ্চেন।"

বোসজা বলিলেন—"ভাল ত আদৌ নয়, মন্দটা ভেবেই ভয় পাচ্চি; আর কেবল চাটুয্যের নয়—নিজেরও।"

বলিলাম—"এ-চিন্তার জন্মটা কি ঠাকুরুণ-বিষয়ের অর্থগৌরবের মধ্যে, না—চীনে-মাটি ফুঁড়ে এর অঙ্কুর দেখা দিলে?"

বোসজা সবিস্ময়ে বলিলেন—"আপনি কি তবে বল্‌তে চান,—আমার ভাবনাটার ও-গুলো অন্যতম কারণও হ'তে পারে না!"

আমি বলিলাম—"চাটুয্যে যদি ঐ ঠাকরুণ-বিষয় সত্ত্বেও সাত আট বছর চাকরী বজায় করে এসে থাকে ত আজ সেটাকে এত বড় ভয়ের কারণ ভাব্‌চেন কেন? 'সরকারী কাম্ আপসে চল্‌তা হায়,—' এ কথাটা অর্থহীন নয়। ঐ যে boiler room-এ (তাপ্ কামরায়) অগ্নিমূর্ত্তিটি বসে থাকেন তাঁর তাতে কাজ সুধু চলে না—ছুটে চলে। তাঁর হুঙ্কারে পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করতে পথ পায় না।"

আমার কথা শুনিয়া বোসজা বলিলেন—"আপনার কথায় চাটুয্যে-সম্বন্ধে বিশেষ আশ্বস্ত হ'তে না পারলেও, আপনার কৃষ্ণপক্ষ সমর্থনের

পরিচয় পেলেম বটে। কিন্তু ঐ লোকের হাতে লাখ টাকার মাল, আর সেই অসংখ্য জিনিষের আদান প্রদানের হিসাবের ভার দিয়ে যে কি করে নিশ্চিন্ত থাকা যায়, তা এখনো আমি বুঝতে পারচি না।"

বলিলাম—"আপনি এত সত্বর fresh fruit-এর (ফলের) কথা ভুলে গেলেন নাকি? জাহাজে ব্যবহারের জন্য আমরা সকলেই কিছু কিছু ফল (আঁব, ডাব, আনারস প্রভৃতি) এনেছিলুম। পাঁচ দিনেই তার পনের-আনা চাটুয্যের পেটেই পৌঁছে গেল! আমি বল্লুম,—'অন্ততঃ সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত চলা উচিত ছিল, এর মাঝে ত কোথাও কিছু পাব না।' তাতে চাটুয্যে চট্ উত্তর করে,—'ভাবচেন কেন, আমার fruits (ফল) সবই মজুদ রয়েছে।' পর দিন পঞ্চানন যখন সেই প্রপঞ্চের টুকরি মজলিসের মধ্যে এনে হাজির করলে, সকলেই দেখে নয়ন জুড়িয়েছিলেন, —একটা তাল, দুটো চাল্‌তা, আর শুকিয়ে তেউড়ে যাওয়া কতকগুলো শিক্‌ড়ে-মুলো, বর্‌বটি আর কাঁচা লঙ্কা! অধিকন্তু গোটা ছয়েক গোঁড়া নেবু, আধপাকা কাঁচকলা, আর আদ্‌খানা পচা কাঁটাল! মনে পড়ে কি?"

শুনিয়াই পঞ্চানন বলিয়া উঠিল—"ওরে বাবারে, আবার সেই শৈবলিনীর নরক দর্শনের স্মৃতি!" প্রথম দর্শনে পঞ্চাননই বলিয়াছিল— If these be thy fresh-fruits, O Israel!" etc.

বোসজা বলিলেন—"সেই দিনই ত 'ফলেন পরিচীয়তে' কথাটার গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করি, আর সেই ফলের মধ্যেই ত চাটুয্যের প্রথম পরিচয় পাই।"

বলিলাম—"সবটা আগে শুনুন; তারপর এই দীর্ঘ এক মাসকাল, চাটুয্যের একটি পয়সাও খরচের খাতে দেখেছেন কি? এক দিন তার মোজা দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল, এক-পাটিরও তলা নেই!

শুনলাম, সে-জোড়াটি এই সবে সাত বছরে পড়েছে। যে-লোক গুদামে থাকে, তার ত মোজার অভাব হবার কথা নয়, অনায়াসে পুরাতন জোড়াটির বদলে নূতন একজোড়া নিতে পারে। কিন্তু পয়সা বা জিনিষ সম্বন্ধে সে যক্ষ। তাকে ও-দুটিতে ফাঁকি দেবার লোক আজো জন্মায়নি জানবেন। আমি সে-সম্বন্ধে আপনাকে অভয় দিতে পারি, আপনি বে-ফিকির থাকুন।"

পঞ্চানন উত্তেজনার সহিত বলিয়া উঠিল—"আমি স্বচক্ষে দেখেছি মশাই—মাছের কাঁটা ফেলে না, একদম্ হুলো-cat (হুলো বেরাল)।"

এই কথায় ঐক্যতান হাস্যের মধ্যে চাটুয্যে আসিয়া মুখভঙ্গীসহ পঞ্চাননকে বলিল—"আর হাস্‌মার্‌তে হবে না, কলকেতার মুখ্‌খু। আজ বিদ্যেবুদ্ধি বেরিয়ে পড়েছে। বাঁড়ুয্যে মশাই শুনেছেন ত?"

বলিলাম—"আরে ছিঃ—ওটা অপদার্থ! ও যে এতটা নিরেট্—তা জানতুম না।"

এই সময় জাহাজের স্টুয়ার্ড্ 'গুড্‌মর্নিং' করিলেন ও নিজেই চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন। এতদিন একত্র বাসে পরস্পরের প্রতি যে একটা ভালবাসা জন্মিয়াছিল তাই লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিলেন, ও বলিলেন—"আমাদের জীবনটাই এইরূপ;—বিচ্ছেদের কষ্টটা প্রায়ই ভোগ করিতে হয়,—কত লোক আসেন, যান, কত চিহ্ন কত স্মৃতিই রাখিয়া যান! তবে,—চাকুরী এমন Jealous জিনিষ, যে চাবুকের মত সর্ব্বক্ষণ উদ্যত থাকিয়া, মনকে (তা ছাড়া) অন্য চিন্তা করিবার অবকাশই দেয় না,—সব ভুলাইয়া দেয়" ইত্যাদি। প্রায় ঘণ্টাখানেক এইরূপ আলাপ আপ্যায়নের পর, তিনি বলিলেন,—"আমি আর আপনাদের কি সেবা করিতে পারি, আজ রাত্রে আপনারা আমার guest (নিমন্ত্রিত অতিথি), কাল রাত্রে আপনাদের আর পাইব

কিনা সন্দেহ। আপনাদের ইচ্ছা ও আদেশ মত আজ রাত্রের আহার্য্য প্রস্তুত করাইবার বাসনা করিয়াছি। আপনারা অসঙ্কোচে আমাকে আপনাদের ফরমাজ্‌টা বেলা তিনটার মধ্যে জানাইলে সুখী হইব।" এই বলিয়া তিনি বিনয় ও সৌজন্য বিনিময়ের মধ্যে উঠিয়া গেলেন। আমাদের মনগুলাও যেন কেমন ভিজে-ভিজে হইয়া গেল। বিপদ-সঙ্কুল পথের সঙ্গীরা অল্পেই আপনার হইয়া পড়ে।

ব্রেক্‌-ফাস্টের ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বৈঠকও ভাঙ্গিল।

—২৭—

পিত্তনাশের পর সকলেই আবার উপরে আসিয়া উপস্থিত হওয়া গেল; কিন্তু সেই সঙ্গে পূর্ব্ব পূর্ব্বদিনের স্ফূর্ত্তিটা আজ আর ফিরিয়া পাইলাম না। দেখিলাম, সকলেরি সুর যেন নাবিয়া গিয়াছে। কথাবার্ত্তায় আগেকার সে উত্তেজনা নাই,—সবই ঢিলে-ঢিলে। মন জিনিষটার মত ভাঙতে গড়্‌তে মজবুত আর কিছুই দেখিনা; সে তুলতেও যেমন, ফেলতেও তেমনি; ভাবান্তর সৃষ্টিই তার কাজ। সকলে আশা গেল, বসা গেল, কিন্তু তেমন হাসা গেল না। আজ আর যেন একটা কোন বিশেষ বিষয় কেহ খুঁজিয়া পাইল না—যাহা লইয়া সমবেত উৎসাহে সকলে তাহাতে যোগ দেয়! তাই সকলেই আপন আপন চিন্তায় মগ্ন হইল,—কেহ কাহারো মুখের দিকে তাকায় না। হরিপদ দু'পা আসে, কিন্তু কাহারো মুখে কথা নাই দেখিয়া অপরাধীর মত ধীরে ধীরে সরিয়া যায়। পঞ্চানন খানিকক্ষণ উস্‌খুশ্‌ করিয়া চাটুয্যের সন্ধানে চলিয়া গেল। চাটুয্যে break-fast (ব্রেক্‌ফাস্ট্‌) বুঝিত না, সে পুরাপুরি break-belly-র মত (পেট্‌ ফাঁশার মত) load (বোঝাই) লইত, ও আসন ছাড়িয়া শয্যাও লইত।

পূর্ব্বোক্ত ভাবটা আমাকেও পাইয়া বসিয়াছিল। ভাবিলাম—এমন কি ঘটিয়াছে যে, অকস্মাৎ এই অবসাদের আমদানি করিয়া বসিলাম! 'ক্লাইভের' কবলে যখন আশ্রয় লইয়াছিলাম, তখনি ত জানা ছিল—প্রভু স্বধর্ম্ম ভুলিবেন না,—পরবাসীও করিতে পারেন, পরলোকেও পৌঁছাইয়া দিতে পারেন। ফল কথা—এতদিন যে বিক্রমাদিত্যের বৈঠক বসান হইয়াছিল, তাহার চৌহদ্দির মধ্যে চাকুরীর চিন্তা বা সাহেবের সংহার-মূর্ত্তি প্রবেশ-পথ পায় নাই। কিন্তু আজিকার প্রভাত সেটাকে নানা রূপে বর্ণে ও ছন্দে বারবার প্রকট করিয়া প্রাণে একটা অব্যক্ত আতঙ্ক আঁকিয়া দিয়াছে। তাই—সময়ে অসময়ে, কাজে অকাজে, কারণে অকারণে, মন তাহারই উপর রং চড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে;—কে কোথায় ও কোন্ কাজে posted হইবে, কার ভাগ্যে কিরূপ মুনিব্ জুটিবে; জাহাজ ছাড়িয়াই বোধ হয় ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতে হইবে। মামুলী (station duty) কাজ হইতে সমরক্ষেত্রের (active service-এর) কাজ স্বতন্ত্র। আবার এ অভিযানটির সহিত বিলাতের সংস্রব (Imperial connection) থাকায়, কাজকর্ম্মের ধারা ও নিয়ম-কানুন বিভিন্ন হওয়াই সম্ভব;—সেটা আমাদের পক্ষে বিলাতী বিস্ফোটক্ হইয়া না দাঁড়ায়,—ইত্যাদি ইত্যাদি—সত্য মিথ্যা, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ভাবনা, ভিতরে ভিতরে বিভীষিকার বীজ ছড়াইতেছিল। স্বজনহীন অপরিচিত দেশে, শত্রুপুরীমধ্যে পা বাড়াইতে বড় বড় সাহসী বীরেরও বুকটা কাঁপিয়া উঠে,—আর আমরা ত বাঙ্গালী কেরানী! পরাজয়ক্ষেত্রে পয়জার-প্রাপ্তি, না হয় মৃত্যু; আর বিজয়ে—বেতনটি ছাড়া লাভের বা আশার কিছুই নাই।

সম্ভবতঃ এই সব চিন্তাই, ভাগাভাগি করিয়া আজ সকলের মনকে অধিকার ও আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু যে দুইটি তরুণ যুবা,

চাকুরির আশায়—সখ করিয়া সঙ্গী হইয়াছিল, তাহারা ত এসব চিন্তার কারণও বোঝে না, স্বাদও জানে না, সুতরাং—সহসা সকলের এই ভাবান্তরটা তাহাদের আঘাত করিয়া মনমরা করিয়া দিতেছিল। তাহারা খোঁজে—হাসি খুসী, গান গল্প, আমোদ-প্রমোদ। তা' ছাড়া জীবনটাকে যে কত কাঁটাবন বাঁকা পথ অতিক্রম করিয়া শেষ-বোঝা নামাইতে হয়, সে-সংবাদ এখনো তারা পায়ও নাই, তাহার খোঁজেও রাখে না। তাহাদের পা ঘসিতে ঘসিতে মলিন মুখে নীচে নামিয়া যাইতে দেখিয়া মনে হইল,—তাহারা আজ যেন প্রতিমা দেখিতে আসিয়া, শূন্য দালান দেখিয়া ফিরিল। প্রাণটায় বড় ব্যথা বোধ করিলাম। মনে হইল—আজ ওরা ভাবিতেছে—এঁদের কি এখন এই ভাবই চলিবে? তবে কেন আসিলাম? এর চেয়ে কলিকাতার পথে পথে ঘোরাও ভাল ছিল!

হায়—বালকেরা জানে না চাকরী কি বস্তু। চাকুরেদের—কেতাদুরস্ত চুল ছাঁটা, বেশবিন্যাস, স্বহস্তে ব্ল্যাক্কো লাগানো ডেভেন্‌পোর্ট শু, কোটের home-cut (বিলাতী) ছাঁট আর সিল্কের রুমালে—পাঁচটি ন্যাংড়া বা ছয়টি কমলা বেঁধে, দু'খিলি ছাঁচি পান্ আর কাঁচি সিগারেট্ মুখে দে' বাড়ী ফেরা—তারা এইটাই দেখিয়াছে ও বাবুদের বাহিরের বড় বড় বাঘ-মারা বাকা আর হাস্য-পরিহাসই শুনিয়াছে। অতুল বাবুকে গোঁফ্ কামাইয়া গিরিজায়া সাজিতে দেখিয়া ও তাঁহার মুখে "মথুরাবাসিনী" শুনিয়া, ঠিক ঐরূপটি হইতে ও করিতে না পারিলে যে জীবনটাই একদম্ মাটি, সে-সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ হইয়া আছে। এগুলি যে দিন-মজুরদের দাঁড়া-গ্রাস্ বা তাড়িরই রূপান্তর মাত্র, তরুণেরা তাহা বোঝে না। তাহারা জানে না যে, উহার ঠিক পশ্চাতেই—সর্ব্বক্ষণ একটা ভয়মিশ্রিত ভাবনা, অশান্তি ও অনটন বাসা বাঁধিয়া আছে।

আমার চরিত্রের নানা দুর্ব্বলতার মধ্যে—তরুণদের আব্দার সওয়া, এমন কি তাহাদের আস্কারা দেওয়া অন্যতম। তাহারাও তাই আমার কাছে অধিকতর স্বাধীনতা উপভোগ করিত। সেই কারণে আমার সমবয়স্ক সঙ্গীদের কাছে সময়ে সময়ে আমাকে অনেক কথা শুনিতে হইয়াছে, আর উপার্জ্জনের মধ্যে চিরদিন "উপদেশ" উপার্জ্জনই ভাগ্যে ঘটিয়াছে। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় না হইলেও, আজ তাই পঞ্চানন ও হরিপদর অবস্থা দেখিয়া কষ্ট বোধ করিতেছিলাম। তাহারা চাকুরী লইয়া চীনে চলে নাই; তবে কি লইয়া থাকিবে,—কিসের উপর দাঁড়াইবে? সমুদ্র-যাত্রা, জাহাজ-চড়া, বিদেশ দেখা,—এই সব আনন্দ লইয়া কাটানো, এইরূপ একটা তরুণ-সুলভ বাসনার ধাক্কাই, তাহাদের ঘরের বার্ করিয়াছে; চাকরীটা গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র। তাই, মজার বাজার মন্দা দেখিলেই, তাহারা ত মন্‌মরা হইয়া পড়িবেই। কিন্তু এ'তো বর্দ্ধমান বেড়াইতে বাহির হওয়া হয় নাই যে, ভাল না লাগিলেই —তিন ঘণ্টায় পাড়ি জমাইয়া বাড়ী ঢোকা চলিবে।

—২৮—

মন্‌টা মিইয়ে থাকায়, আহারান্তে দেড়টার পর,—অভ্যাসমত উপরের ডেকে না গিয়া, আজ নিজের কেবিনে গিয়া শয্যা লইলাম। শুইয়া শুইয়া উদাসভাবে একটা সিগারেট টানিতেছি, পঞ্চানন আসিয়া বলিল—"আপনাকে চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্চি,—আজ যে উপরে যাননি?" বলিলাম—"কি জানি আজ যেন ভূতে পেয়েছে, কিছু ভাল লাগছে না।" পঞ্চানন বলিল—"আমরাই ত পেয়ে থাকি—পাবার জন্যে ছট্ ফট্ করে বেড়াচ্চি—আবার নতুন কোন্ ভূত এল!" বলিলাম —"চাকরী জিনিষটাকে ছোটখাটো ভূত ঠাউরো না পঞ্চানন। বড়বাবু

আজ সেই বিচিত্র চ্যাপ্‌টার (অধ্যায়) খুলে,—সকলকে চম্‌কে দিয়েছেন!" পঞ্চানন সভয়ে বলিল—"এখন কি তবে আপনাদের এই ভাব-ই চল্‌বে নাকি? তা হ'লে ত বাঁচব না মশাই। এ-তো তা'হলে আমাদের দ্বীপান্তরের রূপান্তর দাঁড়িয়ে যাবে! তার চেয়ে—ফির্‌তি জাহাজে ফি'রিয়ে দিন্‌।"

তার কথার সুরে অসত্য ত ছিলই না, বরং কাতরতাই বেশী। বুঝিলাম, আমার অনুমান মিথ্যা হয় নাই। বলিলাম—"লোকের কত কারণে অমন অবসাদ আসতে পারে; এক আধ্‌ দিনের ভাবান্তরে অমন চঞ্চল হ'লে চল্‌বে কেন? একটা কত বড় প্রাচীন দেশে চলেছ—দেখবার শোনবার শেখবার কত কি আছে; এমন সুযোগ ক'জনের ভাগ্যে ঘটে? জীবনটার মূল্য বাড়িয়ে নিয়ে ফেরা চাই।" পঞ্চানন বলিল—"তবে আপনি এখন ওপরে চলুন; সকলেই চুপ্‌-চাপ বসে আছেন, মনটা বড়ই খারাপ হয়ে যাচ্চে, কিছু বলবেন চলুন।" জিজ্ঞাসা করিলাম—"চাটুয্যে নেই?" পঞ্চানন বলিল—"আছেন ত, কিন্তু নাড়া দিতে সাহস হচ্চে না।" বুঝিলাম—পঞ্চাননের ধাত ফির্‌চে। উঠিয়া পড়িলাম ও উভয়ে উপরে গেলাম। গিয়া দেখি—সব দিকে দিকে চাহিয়া, চুপ্‌চাপ্‌ বসিয়া আছেন! আমরা একটু তফাতে আসন করায়, চাটুয্যে আর হরিপদ আসিয়া হাজির হইল। চাটুয্যে আসিয়াই বলিল—"বাঁড়ুয্যে মশাই কি রাগ করেছেন, কোন কথা কইচেন না!" বলিলাম—"পঞ্চাননের মুখ্‌খুমী আর পরাজয় নিয়ে সকালে এত কথা হয়ে গেছে যে, পাঁচ দিন এখন কথা না কইলেও চলে!" চাটুয্যে শুনিয়া খুবই খুসী হইল। বড়বাবু হাঁকিয়া বলিলেন—"বাঁড়ুয্যে মশাই কি মহেশ চক্রবর্ত্তীর ভাঙ্গা-দল বানালেন, আমরা বাদ পড়লুম নাকি?" বলিলাম—"লোকসেনে মাল নিয়ে ব্যবসা চলে

না; না করেন হাঁ, না আছেন দোয়ারকীতে, আছেন কেবল খোরাকীতে! না আছে সাজবার সুরৎ, না আছে চেহারার চটক্। ওয়েরি ছেলেরা তাই বিগ্‌ড়ুতে বসেছে, তাদের সামলাতে হবে ত?"

জনার্দ্দন নায়ড়ুকে (মান্দ্রাজী ক্লার্ক্) বটুয়া খুলিতে দেখিয়া, চিকি সুপারির প্রত্যাশায় 'আসচি' বলিয়া চাটুয্যে তাহার কাছে ছুটিল।

বড়বাবু বলিলেন—"চাটুয্যে কি আমাদের চেয়ে বেশী খোল্‌তাই-দার!" আমি বলিলাম—"অমন সাজন্ত চেহারা হাজারে একটা মেলে না। জাহাজে ত এত দেশের এত লোক রয়েছে, চাটুয্যের মত অমন আকর্ণবিস্তৃত 'হাঁ' একটা বার করুন দিকি।" বড়বাবু বলিলেন—"কিন্তু 'হাঁ' হিসেবে চাটুয্যেকে আপনি কি সার্টিফিকেট দিতে চান তা'ত বুঝলাম না, যাত্রার দলেই বা তার সার্থকতা কি?"

বলিলাম—"লক্ষ্য ক'রে থাকবেন, অধুনা বড় রাস্তার মোড়ে মোড়ে রক্তবর্ণ বৃকোদর Letter Box-এর শুভ-প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়েছে। মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায়, স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পত্রের প্রবল বন্যা দেখা দেবেই, তখন উক্ত বড় রাস্তার ব্যবস্থা বঙ্গের অলিতে গলিতে বাহাল করতে হবে; ক্রমে চলন্ত Letter Box-এর (চিঠি ফ্যালা বাক্সর) দরকার স্বতঃসিদ্ধ। সে অবস্থায় নট-লাট্ অমৃতবাবু যে নাটক লিখবেন, তাতে চলন্ত লেটার বক্স অবশ্যই থাকবে এবং তার সাজবার লোক দরকার হবেই। গলা থেকে পা পর্য্যন্ত একটা লাল সালুর গেলাপ্ আঁটা, মাথায় একটা টক্‌টকে কাবুলী কুল্লা পরা, আর কপালে সাদা অক্ষরে Letter Box ছাপা, একটি এমন লোক

চাই—যে হা ক'রে আগন্তুক পত্রগুলিকে কবলে নেবে। আমাদের মধ্যে কে এমন বাহাদুর আছেন, যিনি এই পাট নিতে পারেন ?"

বড়বাবু বলিলেন—"সর্ব্বনাশ! মাপ্ করুন মশাই।" একটা হাসি পড়িয়া গেল। চাটুয্যেও ছুটিয়া আসিল। পঞ্চানন হাত জোড় করিয়া বলিল—"এমন সৃষ্টিছাড়া সংয়ের কথা ত কখন ideaতেই (কল্পনাতেই) আসেনি মশাই ?"

মজুমদার ভায়া সলম্ফে বলিয়া উঠিলেন—"It beggars imagination",—কল্পনা এখানে ফতুর।

চাটুয্যে কিছু না বুঝিয়াই হাসিটায় যোগ দিয়াছিল; প্রাবল্যটা একটু কমিলে নিম্ন কণ্ঠে পঞ্চাননকেই জিজ্ঞাসা করিল,—"ব্যাপারটা কি ?"

পঞ্চানন কিন্তু উচ্চকণ্ঠেই বলিল—"এই আপনারই গুণের কথা হচ্ছিল, সেদিন যে-কথা বলেছিলেন,—বাল্যকালে আস্তো একটা চাল্‌তা খেতে গিয়ে, দু'কস্ কেটে হাঁ-টা কি ক'রে অমন ক্যালাও হয়ে পোড়ল!"

চাটুয্যে,—"চ্যাংড়া কিনা, প্যাঁচাকে কোন কথা বলবার যো নেই।"

পঞ্চানন,—কেন, এতে নিন্দের কথা কি আছে ? জগতে যাঁরা বড় হয়েছেন, বাল্যকালেই তাঁদের কাজে কর্ম্মে সেটা প্রকাশ পেয়েছে। কেউ সূর্য্যদেবকে গিল্‌তে গিয়েছেন; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কড়ে আঙুলে গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ করেছিলেন। কই—কেউ ত তাঁদের মন্দ বলে না। তবে কেষ্টর কাজটায় আমাদের একটা অনিষ্ট হয়েছে বটে। তাঁর বইবার আর সইবার শক্তিটা প্রমাণ হওয়ায়,—পৃথিবীর পাপের বোঝাটা বেপরোয়া বেড়ে চলেছে।

মজুমদার—Bravo (বাহবা) পঞ্চানন !

বোসজা এতক্ষণ ভাবী লেটার-বক্সের কথাই ভাবিতেছিলেন, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন-"বাঁড়ুয্যে মশায়ের লেখাপড়াটা করা হয়েছিল কোন ইস্কুলে ?"

আমি আশ্চর্য্য হইল্যম,—বলিলাম—"তা হ'লে বুঝতে হয়— আমি যে ইস্কুলে গিয়েছিলুম, আর লেখাপড়া করেছিলুম, সে-সম্বন্ধে আপনাদের সন্দেহ নেই। বদনামের কথা হলেও এটা আমি মেনে নিতে বাধ্য; কারণ বাবার ভুল চুকে সে কুকাজ একবার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অল্পদিনেই মাস্টারদের দয়া আর দূরদর্শিতা—সে ভুল শুধরে দেয়।"

ঘটনাটা সবিস্তারে শুনিবার জন্য মজুমদার ভায়া আড় হইয়া পড়িলেন, অন্য সকলেও সবেগে ঝুঁকিলেন।

কোন বিষয়ের বাড়াবাড়িতে আমি নারাজ; বিশেষতঃ ঐ ইস্কুলেরই সংস্রবে একটি ভুল, সিঁদুরে মেঘের মত আমাকে সাবধান করে দেয়। আজ আবার সেই প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল! কিন্তু সকাল থেকে যে মানসিক গুমোট্টা জমাট বেঁধে সকলের বাকরোধ করিয়া রাখিয়াছিল,—সেটা সবেমাত্র শনৈঃশনৈঃ সরিতে আরম্ভ করিয়াছে। কত ডিগ্রি উত্তাপে যে সেটা একদম বাষ্প হইয়া বিদায় লইবে, তাহা জানা নাই। ভিজে কাঠ ধরান হইয়াছে—ফুঁ থামিলেই আবার না শোল-পোড়া হয়! তাই প্রসঙ্গটা কিছুক্ষণ বজায় রাখাই বিহিত ভাবিলাম।

বলিলাম—"ইস্কুলে পদার্পণ ক'রে পাঠারম্ভেই মন খিঁচড়ে গেল —প্রারম্ভেই অশুভ দর্শন! One morn I met a lame man! কেনরে বাপু—সরকার মহাশয়ের কি অন্য কোন man জোটে নি?

noble man, honest man,—অন্ততঃ bad manও ত জুটতে পারত,—দেশে তার ত অভাব নেই! এ কিনা সক্কাল বেলা একেবারে মুখোমুখী বিকলাঙ্গ দর্শন,—যাত্রা-ভঙ্গের দেবতা! তখুনি বুঝলাম—সুবিধা নয়,—বড় এগুতে হবে না! ঘটনাটা আবার গোলাবাড়ীর পাশে;—অথচ বিদ্বেটা হচ্ছে—গোলাবাড়ী ঘুঁচিয়ে সাহেববাড়ী ঢোক্‌বার! আবার দেখাটা কিনা ঘোড়ায় চ'ড়ে,—যে জাতের দেব-সেনাপতি চড়েন পক্ষীতে! এই সব অদ্ভুত অসামঞ্জস্যের মধ্যে আমার পড়াশুনো দোর্‌কুচে উঠ্‌তে লাগল।

এমন সময় আমাদের গোবর্দ্ধন পণ্ডিত মশায়ের গৌহাটিতে বদলি হ'ল। তাঁকে Farewell (বিদায়) দেবার প্রস্তাব হওয়ায়, হুজুক্ পেয়ে আমরাই হয়ে পড়লুম। পাছে পান্‌সে হয় তাই কবিতা রচনার ভারটা নিজেই নিলুম। উৎরেও গেল। একদম করুণ রসের কুজ্ঝটিকা! তার মধ্যে এমন মড়াকান্না কেঁদেছিলুম যে, কোন শ্রোতাই অশ্রু-সম্বরণ করতে পারেননি। ছেলেরা হরিশ্চন্দ্র নাটক অভিনয়ের সময়—শ্মশানে শৈব্যের মুখে সেই কবিতাটি দেয়। কান্নার জন্যে এত এন্‌কোর্‌ বাংলা দেশে নাকি ইতিপূর্ব্বে কেউ আদায় করতে পারেনি। তাতে গোবর্দ্ধন-গৃহিণী আমাদের বাড়ী পর্য্যন্ত তেড়ে এসে বলেছিলেন, —"হতভাগা ছোঁড়া কোন কথাই বাদ দেয়নি,—একটা কথাও আমার তরে রাখেনি;—উনি ম'লে আমি যে কাঁদবার আর নতুন কথা খুঁজে পাব না!"

কবি নিরঙ্কুশ, তাই তোড়ের মুখে একটা সেরা (poetry) পোইট্রী প্রকট হয়ে পড়েছিল। সেটা গোবর্দ্ধন মাস্টারের বদলির স্থাননির্ব্বাচনে কর্ত্তাদের সূক্ষ্ম রস-বোধের প্রশংসা করতে গিয়ে। সেইদিনই বৈকালে বাবা হেডমাস্টার পশুপতি বাবুর এক পত্র পেয়ে

আমাকে বল্লেন—"তোর আর ইস্কুলে গিয়ে কাজ নেই, তুই বাড়ীতে ব'সে হাতের লেখা পাকা!"

"ভাবলুম,—সত্যিকার বিদ্বান্ আর বড় হ'তে হলে, ইস্কুল-কলেজে যাবার কোন দরকারই দেখি না;—'জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল্'—রস্কিন্, কার্লাইল্ ও-কারখানার গড়ন্ নন্। প্রৌঢ়ে বুঝলুম—মস্তিষ্কটা খুবই উর্ব্বর ছিল,—ভাবাটায় ভুল করিনি,—দেশে কি বিদেশে রবীন্দ্রনাথ ক'জন?"

বহু উৎসাহ বাক্য ও আমার সর্ব্বাঙ্গে পঞ্চাননের মুখ-নিঃসৃত হাস্য-রসামৃত সিঞ্চনের বাধার মধ্যে—মদীয় শিক্ষার ইতিহাস সংক্ষেপে সমাপ্ত করিলাম।

—২৯—

হায়—আজ ঠিক্ বিশ বৎসর পরে সন্দেহ হইতেছে, আমার সেই গোবর্দ্ধন-গৃহিণী-প্রদত্ত পাট্টা বুঝি খসিয়া পড়ে! তিনি কান্নার জন্য নূতন কথার অভাব অনুভব করিয়া ক্ষুব্ধ ও হতাশ হইয়াছিলেন। আর আজ দেখিতেছি বঙ্গ-সাহিত্য তাহা অপেক্ষা সঙ্গীন সমস্যার সম্মুখীন! যেমনি হউক না কেন—রঙ্গিন চিত্র-চাকচিক্যে—সিল্কের মলাট্ মোড়া বই বাহির হইলেই, তাহার বাহাদুরীর বিজ্ঞাপনে, বিশেষণের যেরূপ বৃষোৎসর্গ আরম্ভ হইয়াছে, যথার্থ একখানি ভাল বইয়ের ভাগ্যে যে কি জুটিবে, তাহা সত্যি ভাবনার কথা। বোধ হয় এরূপ অবস্থায় ভাল বইগুলি. বিশেষণের বিদ্রূপ হইতে রেহাই ও রক্ষা পাইলেই মঙ্গল। সেগুলি যেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত সাদা মলাটেই শোভা পায়; নচেৎ তাহাদের বাচাই বা কি করিয়া সম্ভব হইবে, ও কে তাহা করিয়া দিবে? যাঁহাদের নিকট বাংলা দেশ সে-আশা করিয়াছিল এবং যাঁহাদের তাহাতে ন্যায়-সঙ্গত অধিকার

তাঁহারা অশোক আর আদিশূরের ইঁট্ পাথর উদ্ধার করিতে এবং কোন্ মনসার ভাসানখানি খোদ্ বিভীষণের নিজের হাতের লেখা, তাহা নির্ণয় করিতে ব্যস্ত। একটি বন্ধু বলিতেছিলেন—"শুনিয়াছি তাঁহাদের মজলিসে—একেবারে খাঁটি তিব্বতদেশীয় স্বর্ণঘটিত ষড়জাড়িত বিশুদ্ধ মকরধ্বজ বনিতেছে।" আশার কথা।

চাটুয্যে হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল—"হ্যাঁ মশাই, শুনেছি চীনে নাকি আমাদের মা কালী, শ্রীরাধা প্রভৃতি দেবীদের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে ;—সত্যি কি ?"

বলিলাম—"আমিও শুনেছি—বশিষ্ঠদেবের প্রতিষ্ঠিতা কালী নাকি সেখানে আছেন।"

কথাটায় বড়বাবুও যোগ দিয়া বলিলেন—"লোক নিজের নিজের দেশের ঠাকরুণদের চেহারা আর সাজসজ্জার অনুরূপ, দেবীদের মূর্ত্তি গড়ে ও তাঁকে সাজায়। পুরুষরা এর চেয়ে বড় model (আদর্শ) মাথায় আনতেই পারেন না। যা হোক—আমি কিন্তু শুনেছি—চীনে মেয়েদের পা লোহার জুতো দিয়ে আঁটা! তা হলে সেখানকার দেবীদের পায়েও লোহার জুতো জুটে থাকবে।"

বলিলাম—"ডিঃ গুপ্ত ত প্রায় হাতের কাছেই এসে পড়েছেন,—ফলেন পরিচীয়তে।"

পঞ্চানন মুখ চোখাচ্ছিল, সে বলিল,—"কবিতা লেখবার পক্ষে—Subject-টা (বিষয়টা) খুব গ্র্যাণ্ড্! লিখতে পারলে—বঙ্গ-সাহিত্যকে একটা নূতন জিনিষ দেওয়া হয়।"

বড়বাবু বলিলেন—"তা বটে। আজকাল বঙ্গ-কবি-কুঞ্জে বিষয়ের বড়ই অভাব ;—ললিত-লবঙ্গলতা থেকে—পাহাড়ী ময়না,—স্থলপদ্ম থেকে—জলহস্তী,—সবই তাঁরা ফুরিয়ে ফেলেচেন! প্রেমের

পাম্ দেওয়া আল্না আলমারী আলতা পর্য্যন্ত তাঁদের খাতায় পাওয়া যাবে। দেশটা প্রেমের পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট। মুড়ি-মুড়কির কবিতাতেও ময়রাণীর মুখে মধুর আলাপ গুঁজে দিয়ে কবিরা প্রেমের পরোয়ানা জারি করেন। বিষয়টা দুর্লভ হ'লে কি হবে, যিনিই লিখুন—ঐ লোহার জুতোর মধ্যেই প্রেম তার পথ খুঁজে নেবে;—কি বলেন বাঁড়ুয্যে মশাই ?"

ভণিতা ভাঁজার ভাব দেখিয়া বুঝিলাম—এঁদের একটা মতলব আছে। থাকুক্,—আজ আমার কিছুতেই 'না' ছিল না। বলিলাম—"স্ত্রীলোকের পায়ে লোহার জুতো বাস্তবিকই মহাকাব্যের বিষয়! কারণ, গুণে সেটা চামড়ার জুতোর চেয়ে শতগুণ ট্যাক্সই,—আবার আবশ্যক হলে—উনুনে চড়িয়ে তেল্ ছেড়ে দে' মাছ ভাজাও চলতে পারে। তবে, বদ্‌রাগীর পক্ষে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়াই উচিত। চীনেরা প্রাচীন পণ্ডিতের জাত, তাই ওটা মেয়েদের জন্যেই ব্যবস্থা করেচেন;—তাতে আমার কিন্তু মনটা দমে গেল। এতে ক'রে প্রমাণ হ'য়ে পড়ে—হয় চীনেরা ভারতবাসী অপেক্ষা নির্ভীক, না হয় চীনা রমণীরা পাতিব্রত্যে প্রধানা।"

মজুমদার ভায়া বলিল—"না, তামাসা নয় বাঁড়ুয্যে, আর ব্যাখ্যা বাড়িও না; এখন এ-সম্বন্ধে তোমাকে একটা কবিতা লিখতেই হবে; এটি আমাদের সকলেরই অনুরোধ।"

এইটিই ছিল খোলসা কথা,—বলিলাম—"আপত্তি ছিল না, কিন্তু পূর্ব্বেই দেখেছ ও জিনিষটে আমার সয়না, ওর ওপর এমন এক দেবতার দৃষ্টি আছে, যিনি একটা কিছু না নিয়ে নড়েন না। তিনি বরাবরই গোচরে আছেন,—এবার তা'হলে চাকরিটারই উপর তাঁর শুভদৃষ্টি পড়া সম্ভব।"

বোসজা হাতজোড় করিয়া বলিলেন—"মাপ্ করুন,—তিনি কিন্তু আমি নই!" হাসিটা একটু উচ্চগ্রামে উঠিয়া পড়িল।

মজুমদার বলিল—"ইস্—আজ যে তোমার চাকরির মায়া মহীয়সী হ'য়ে দাঁড়াল! কই—এ অপবাদ ত তোমার কস্মিন্ কালে ছিল না।"

বলিলাম—"জলধি আর যুদ্ধক্ষেত্র, দুই-ই যমের বাগ্‌বাড়ী। সেখানে পা বাড়াতে হ'লে, মিথ্যা থেকে পা তুলতে হয়। ভদ্রলোকের সম্ভ্রম ব'লে জিনিষটে বজায় রেখে চলবার মিথ্যেটাই বোধ হয় সেরা আশ্রয়, চাকরিতে ঢুকে সেটার খরচ প্রচুর পরিমাণেই করা হয়েছে; অশিক্ষিতের ও-বালাই নেই বল্লেই হয়।"

"লোকের ধারণা—বাংলা দেশটা ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার 'ডিপো', সেটা চিরকালই অজীর্ণের আড়ৎ;—বদ্‌হজমের বদ্‌নাম তার বুকে-পিঠে। পাহাড়ী-কুঞ্জের কথা ছেড়ে দিলেও,—বাবুরা পশ্চিমে মধুপুর থেকে আরম্ভ করে ডিহিরি, মায় মসুরী, দক্ষিণে পুরী থেকে ওয়ালটেয়ার প্রভৃতির হাওয়া খেয়ে চোঁয়াঢেঁকুর চাপা দিতে যান। কিন্তু আমাদের এই কেরানী-ক্লাস্‌টি—হজমের হারকিউলিস্, এরা বড় বড় বিলিতী জিনিষ অবলীলাক্রমে হজম্ করে থাকে;—নীলকণ্ঠও সে গরল গিলতে পারতেন না। ভায়া!—সেটা আমাদের চাকরির মায়ায় সুপাচ্য হয়েছে, কি মোহে সুমিষ্ট লেগেছে, সেটা ভাববার কখন দরকারই বোধ করিনি। গিরিজায়ার ঝাঁটা না খেলে যেমন দিগ্বিজয়ের মনটা দোমে যেত, বোধ হয় এও ক্রমে সেই formulaরই (নিয়মেরই) অন্তর্গত হয়ে যায়। দেখচি, বড়লাট-দপ্তরের একজন ক্লার্ক ("Autobiography of a clerk" শীর্ষক প্রবন্ধে) লিখচেন—"It kills the soul in those who had it." মুস্কিল এই যে, এর মজ্জাগত ভাবটা প্রকাশের একটা যুত্ মাফিক কথা মিলচে না।"

(আজ দেখিতেছি আমাদের সে অভাব ঘুচিয়াছে। "Slave mentality" কথাটি, মায় উপসর্গ—রোগটি প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। "দাস্য-ভাব" কথাটি, হাজার বৎসর হাতের কাছে হাজির থাকিলেও তার দুর্ব্বলতার দোষে—পদাবলীতেই পড়িয়া রহিল! এখন অনেকের নাকি ধারণা, রোগটা যখন ধরা পড়িয়াছে, তখন আরোগ্যের আশা আছে। অভিজ্ঞেরা কিন্তু একমত নন;—তাঁরা বলেন—এ যে রাজ-যক্ষ্মা!)

শুনেছি রাজা রামমোহন রায়ও এই রোগের মুল্লুকে গিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু 'মানুষের জন্মগত অধিকার' ব'লে কি একটা জিনিষ নাকি আছে,—সেটা বাড়ীতে রেখে যেতে ভুলে গিছলেন,—কাজেই কর্ত্তার কাছে দাঁড়িয়ে কথা কইতে বা তাঁর কথা শুনতে, রাজি হননি—চেয়ার চেয়েছিলেন; তাই রোগের সূচনাতেই রেহাই পান।

ভায়া! ওটা একেবারে রাধার প্রেম,—নিধু বাবুর টপ্পা—"ভাল বাসিব ব'লে—ভাল বাসিনে!"

মজুমদার ভায়া বলিলেন—"এমনটা কবে থেকে হ'ল! বরাবরইত দেখে এসেছি—তোমার বৈঠকী-চাকৃরি।"

বলিলাম—"সেটা শুনতে হলে একটু সহিষ্ণু হ'তে হবে।"

বোসজা বলিলেন—"নিশ্চয়ই শুনতে হবে, auto-biography (স্বলিখিত আত্মজীবনী) বড় মিঠে জিনিষ।"

বলিলাম—"তথাস্তু। আমার চাকরির উপর মায়া সম্বন্ধে কি ক'রে যে অবহিত হলুম—সেই কথাটাই বলি। তবে সেটা সহজে হয়নি,—তাতেও তোপের দরকার হয়েছিল!"

পঞ্চানন বলিল,—"ওরে বাবা—তোপের? চাকরির পায়ে নমস্কার!"

বলিলাম—"সব শুনলে—'শত কোটি' বলতে হবে, থাক্। গত বুয়োর যুদ্ধের ব্যবস্থা আর পদ্ধতি দেখে, বড় বড় বাবাজীদের বুদ্ধি ঠিকানায় পৌছয়;—সকল মানুষ-মাঁরা (যুযুৎসু) সভ্যদেশেই একটা সাড়া প'ড়ে যায়। তারপর বুয়োরদের অনেক কায়দা কানুন, সমরদক্ষ জাতিরা নিজের নিজের দলে চালাবার জন্যে কড়াকড়ি আরম্ভ করেন। ভারতের পল্টনগুলি প্রাতঃকালে একবার খিদে বাড়াবার মত—সখের কুচ্ কাওয়াজ্ (parade) সেরে, সারাদিন খস্-টাটির খাস্-কামরায় পাখার হাওয়া খেয়ে কাটাতো। সুদান-সূদন কিচেনার সাহেব জঙ্গীলাট হয়ে এসে, সেই বিলাস-বাবুয়ানার বৈকুণ্ঠে বহ্নি প্রয়োগ করলেন। সকাল-সন্ধ্যা লম্বা লম্বা কদম্-মার্চ্, ছুট্-মার্চ্ (running march) প্রভৃতির চোটে, তাদের নাকৃকে-দম্ করে দিলেন। আজ ঝুটোলড়াই (mock fight), কাল অমুক নদী পার হয়ে অমুক জায়গা আক্রমণ,—পরশু অমুক পাহাড় দখল;—আবার এই সব ঝুটো ঝঞ্ঝাটের অভিনয়—অধিকাংশই রাত্রে! উদ্দেশ্য—পল্টন্‌কে সর্ব্বক্ষণই লড়ায়ের তরে সতর্ক, অভ্যস্ত ও প্রস্তুত রাখা আর বিলাসের বদ্‌হাওয়াটা বার ক'রে দেওয়া।

ক্রমে তার ধাক্কা আমাদের উপরেও এসে পৌঁছুলো! দেখলুম—জেনারেল্ সাহেব হুকুম দিয়েছেন—কামান্ তিনবার দ্রুত দাগ্‌লেই (in quick succession) সামরিক বিভাগের সকল শাখার লোককেই, (৫-১০ মিনিটের মধ্যেই), তাদের নিজের নিজের নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও কাজে হাজির হয়ে, হুকুমের প্রতীক্ষা করতে হবে, অন্যথা—সাজা খুব কঠিন। ব্যাপারটা যে কবে কোন্ সময়ে ঘট্‌বে তার স্থিরতা নেই!

কি সর্ব্বনাশ! একে ত ভাগ্যদোষে কেরানী হয়ে দেশের বুদ্ধিমান মাত্রেরই বিরাগভাজন হ'য়েছি;—বক্তৃতার বোলে, আর

কলমের খোঁচায় 'জর-জর',—তায়, রাতকাণার উপর এই 'রোঁদের' ভার! শুনেই রক্ত শুকিয়ে গেল। ভাবলুম—এতদিনের চাকরিটা দেখচি—তিন আওয়াজেই ফর্সা হবে! পথের দুধারে যাকে পেলুম তাকেই আর পাড়াপ্রতিবেশীদের অনুরোধ জানিয়ে বাসায় ফিরলুম—তিন তোপ্ দাগলেই যেন খবরটা দেয়, ঝি-চাকরকে হুঁসিয়ার থাকতে বল্লুম। শুনে ব্রাহ্মণী বল্লেন—"অত ভাবনা কেন,—না যেতে পারলে কেউ ত আর ফাঁসী দেবে না!" যেন ফাঁসী ছাড়া আর সব সাজাই সহজ ও আমার তা' সইতে পারা উচিত,—আর তাঁরও সেটা সইবে! যা'হক্ —দু'তিন রাত্রি মিথ্যা জাগরণের পর—চিন্তাটা ফিকে মেরে এল,—চর্চ্চাও থেমে গেল।

সেটা কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর রাত্রি। মেঘ-ঝড়ের আয়োজন দেখে, বন্ধুরা তাস ফেলে বৈঠকখানা ছেড়ে উঠলেন। তখন রাত্রি দশটা বেজে গেছে। আমিও শুতে গেলুম। বাসাটা বে-মজবুত; বাইরে ঝড়-বৃষ্টি, মেঘগর্জ্জন; ভিতরে দোর-জানালার ফাঁক ব'য়ে বংশীধ্বনি আর বিদ্যুতের খেলা! আবার সর্ব্বোপরি নাসিকা-নিনাদ! সাত বছরের মেয়েটা ভয়ে আড়ষ্ট,—আমি বিপদাশঙ্কায় বিনিদ্র। এমন সময় সেই তিন তোপ! রাত তখন দুটো বেজে দশ মিনিট। বাসার লাগাও এক ঘর গয়লা থাকতো,—তাদের ঘর তখন জলে ভেসে যাচ্ছে,—কাজেই কর্ত্তা জেগে ব'সে ছিল। সে দেখি চেঁচাচ্ছে—"বাবুজি,—বাবুজি,—সয়তান্ বোলা হ্যায়।" বারাণ্ডায় বেরিয়ে বল্লুম—"শুনতে পেয়েছি সর্দ্দার।"

ব্রাহ্মণীর সেই ভাত-ঘুম—সহজে ভাঙতে চায়না,—ঠেলে তুলতে হ'ল। চাকরটা বাইরের ঘরে থাকত,—তাকে ডেকে, বারাণ্ডায় থাকতে বল্লুম। জুতোটায় পা ঢোকাতে ঢোকাতে—কোটটা বগলে আর

ছাতাটা হাতে নিতেই, ব্রাহ্মণী বল্লেন—"চল্লে কোথায়?" বল্লুম—"রোদ্ পোয়াতে!" বুঝলেন—কোন কথাই এখন চলবে না, বল্লেন—"আমাদের কাছে থাকবে কে?"—"সেটা জেনে আসব;—রামলাল (ভৃত্য) বাইরের দরজা দিয়ে নে,"—বলতে বলতে একেবারে রাস্তায়;—মেয়েটা কেঁদে উঠলো।

বাইরে তখন তুমুল ব্যাপার;—ঝড়ের ঝুঁটি ধরে ধরে শত শত ঘোড়-সওয়ার (Cavalry) ছুটেছে; ত্রিশ বত্রিশখানা Ambulance Cart (চল্‌তি হাঁসপাতাল), তোপখানার সঙ্গে সওয়ার শুদ্ধ শতাধিক artillery horse (তোপটানা ঘোড়া), mule-cart, bullock-cart (খচ্চরের গাড়ী, বয়েল গাড়ী), পদাতিক পল্টন্, Followers প্রভৃতি, সেই ঝড় বৃষ্টি অন্ধকার ভেদ করে দ্রুত দৌড়েছে। যেন রামের বে'র Procession (সমারোহ-যাত্রা),—কেবল জল ঝড়ে আলোটা নিবিয়ে দেছে। তাদের ঝন্‌ঝনানি আর ঘড়্‌ঘড়ানিতে ঝড়ও যেন ঝান্ খেয়ে। তখন ঝড় বৃষ্টি অন্ধকারটা যেন কারুর মনেও নেই, গায়েও ঠেক্‌ছে না।

বাইরে পা বাড়াতেই—ছাতাটা উল্টে খাস্-গেলাস হয়ে গেল,—"সখি উপলক্ষ্য মাত্র"—কেই বা সে দিকে মন দেয়! সেই অবস্থাতেই চোঁ-চা ছুট্। ভাগ্যে আপিসটা দূরে ছিল না,—দেড়্-পো পথ হবে। পৌঁছে দেখি—প্রায় সকলেই হাজির,—সাহেব সর্ব্বাগ্রে। আলো জ্বালবার হুকুম নেই, সব—(শুধু ভূতের মত নয়) ভিজে ভূতের মত বসা গেল। শীতকাল হ'লে বাঙ্গালীর সাবু খাওয়া প্রাণটা বেরিয়ে যেত, জুলাই মাস বলেই কেবল কাঁপুনি আর হাঁপানীর ওপর দিয়েই গেল। কেউ কারুকে চিন্‌তে পারছিলুম না, আওয়াজে বুঝলুম, তিনকড়ি বল্‌চে,—"ছোট্‌বার সময় জুতোর তলাটা বাজপাই বাবুর বাড়ীর

সামনেই ছেড়ে গেল,—খোল্‌টাই পায়ে রয়ে গেছে ;—চাকরির চরম !" নীরদ বল্‌ছে—"অন্ধকারে টেবিলের পায়াটা লেগে, হাঁটুটা ছেঁচে গেছে, —কত পাপেই যে লোকে চাকরি করে ! লোকে জানে—কেরানীরা কেবল কলম চালায়,—মলমও যে লাগায়—তা' মালুম নেই !" এত কষ্টেও হাসতে হ'ল।

ঝড় বৃষ্টি কমে এল,—গায়ের কাপড়ও গায়ে শুকিয়ে এল ; কিন্তু জেনারেল্‌ সাহেব স্বয়ং এসে হুকুম না দেওয়া পর্য্যন্ত কারুর সরবার যো নেই। তাঁর ঘোড়ার খুরের শব্দ-প্রতীক্ষায় কাণ খাড়া ক'রে,—হাই তুলতে আর ঢুলতে লাগলুম। শ্যামের বাঁশরী-রব শোনবার জন্যে ব্রজ-সুন্দরীদের চৌদানী আর ঝুমকো-পরা কাণ কখনই অতটা খাড়া থাকতে পারতনা। প্রভু তোপখানা (artillery), রেশালা (cavalry), পদাতিক পল্টন (infantry), হাঁসপাতাল, Godown (গুদাম্‌), Transport line (বাহন-কুঞ্জ) প্রভৃতির পরিদর্শন শেষ করে,—ঊষার আলোয় এই উপেক্ষিতদের সেলাম নিয়ে, বল্লেন—" disperse" (সরে পড়)। বাঁচলুম।

তারপর বাইরে এসে—যে-যার মুখ দেখে— দ্বাপরে হনুমানের first and successfull Ceylon trip-এর, পাল্‌টা পাড়ির পর, কপি-কটক সহসা স্ব স্ব শ্রীমুখ দেখে যেমন চম্‌কে উঠেছিল—আমরাও মনে মনে তেমনি আঁৎকে উঠলুম ; আর ছাড়া পেয়ে তাদেরই মত মুখভঙ্গী সহকারে—তাদেরই ভদ্র ভাষায় আস্ফালন করতে করতে বাসায় ফিরলুম। সবার সম্মিলিত অভিভাষণের ভাবার্থ মোটামুটি এইরূপ ছিল :—"ঢের হয়েছে আর নয় ! বেটারা কোন্‌ দিন কাবুলে নে গে কমোড্‌ বইতে, না হয় Trench কাট্‌তে (খানা খুঁড়তে) বলবে নমস্কার চাকরির পায়,—কুতিয়া বোলালেরে বাপ্‌ ;—বেলা থাকতে

সঙ্গে পড়াই ভাল। পিসে মশাই কত সাধ্যসাধনা করিছেলেন,—সওদাগরী আপিস ব'লে গেলুম না। এতদিনে দেড়শ' টাকা কেউ ঘোচাত না, আর উপ্‌রি ত ছিলই! হায় হায়,—কলা-পোড়া-খেগো কপাল কি না, তাই তখন মনে ওঠেনি। আজই চিঠি লিখচি।" উমেশ বল্লে—"সব নিজের নিজের পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত গুরুজনের বাক্য অমান্য করেছি—আর কি ভালাই আছে! ইশা শ্বশুর মিলেছিল—তা এ শিলে-খেগো কপালে সইবে কেন? পই পই করে বলেছিলেন—"গিলেণ্ডার্‌-হাউসে" গচিয়ে দি, পাঁচ বচরে মানুষ হয়ে যাবে।" তখন শোনে কে? সেই ফাঁকে শনি এসে পাকড়ালে,—এই তিরিশ টাকার তালুক মিল্‌লো! ক্রমে সে রন্ধ্রগত হয়ে three hundred horse power এ ঘুরতে লাগ্‌লো;—ক্রম্‌ করে মুগুরের মত পরিবারটা মরে গেল,—সব ফর্সা! উমেশের 'উ' উড়ে গেল, কেবল 'মেশ' টুকু রেখে গেল! এখন পোছে কে?—চুলোয় যাক্‌—চাকরি আর নয়! শুনেছি সিধু খুড়ো চৌরঙ্গী-কোয়াটারে "সল্‌তের" কন্‌ট্রাক্ট নিয়েছেন, তাঁকে ধরে কেল্লায় একখানা হাঁড়ির দোকান খোলবার চেষ্টাই চালাই;—রাজপুত্তুর আসছেন,—বেশ দু'পয়সা 'ফেচ্‌' করতে পারে।" বিভূতি বল্লে—ভাগ্যে বাবা বেলাবেলি বে' দিয়েছিলেন—রাত্রে আজো একা উঠতে পারি না। উঃ, মিলিটারী লাইনে এসে কি ভুলই করেছি, পথে আজ রথের ভিড় না থাকলে—কি ক'রে যে যেতুম কেবল তাই-ই ভাবছি। মামা শিবকেষ্ট তাঁর shop এ ধাঁ ক'রে ঢুকিয়ে দিতে পারতেন,—মাইনেতে কি করে? নেটিবের চাকরি ব'লে মনে ধোরল না: আক্কেলে এল না যে নামটারই মূল্য কত? দিনের মধ্যে দশবারও নামটা করা হ'ত,—তা হবে কেন? তা হ'লে রক্তচক্ষু মেজার্‌ হর্নের ঘুঁতুনি সামলাবে কে? প্যারীচরণের পীরিতে প'ড়ে যে পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেছে;

শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা থাকিলে 'হর্নের' গুতো খাবে কে,—তাঁরা ত "শৃঙ্গিণাং দশহস্তেন" সাফ্ করে দিয়েছেন। যাক্—বড় ভগ্নীপতি ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের বড় বাবু,—horde (ডাঁই) করে ফেলেছেন। লিখলেই চাকরি;—আজ পিটিশন্ (দরখাস্ত) পাঠিয়ে তবে চা গ্রহণ।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাসায় ফিরে এসে দেখি—চাকরটা উঠেছে। মেয়েটা কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। দালানে একখানা খাটিয়ার ওপর ব্রাহ্মণী—গুম্ হয়ে বসে আছেন,—বদনে বেশ থর্ নেবেছে। ভাবলুম—রাত্রের ঝড়ে ত রক্ষা পেয়েছি; কিন্তু প্রাতে এ যে প্রলয়ের পরোয়ানা! সকালের শিরঃপীড়া সুবিধের জিনিষ নয়—বেলার সঙ্গে সঙ্গে তার শূলুনীও বাড়বে। কি করি, আপনা-আপনিই আরম্ভ করলুম—"উঃ—এখনো বুকটা ধড়াস্-ধড়াস্ করছে;—মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। পথে বাজপাইজী না ধরে ফেল্লে,—সে টাল্ সামলাতে পারতুম না,—কি ঘট্‌তো, তা' ভগবান জানেন। কে আর কবে এ সব দেখেছে! পাঁচ মিনিটের দেরীর জন্যে—তিন তিনটে লোককে, চোকের সামনে তোপে উড়িয়ে দিলে! পাঁটা কাটা দেখতে পারি না, আর এই নরহত্যা দেখতে হ'ল! যেন মগের মুল্লুক! হায়, হায়, হায়, জল্-জ্যান্তো গরিবরা ছুটতে ছুটতে এল—আর গোলার মুখে গেল! একটা কথা পর্য্যন্ত কেউ শুনলে না। আহা হা! মনে হচ্ছে আর মাথাটা ঘুরে যাচ্ছে।" এই বলে দেলটা ধ'রে ফেলতেই ব্রাহ্মণী ব্যস্ত হয়ে বল্লেন—"তুমি আগে বিছানায় বোসবে এস।" বিছানায় ব'সে বল্লুম—"উঃ জাতটাকে চেনা দায়"—

ব্রাহ্মণী,—"আবার চেনা দায় কি রকম! কাটোয়া জাত,—দত্তি। আর তোমার আপিসে যাওয়া হচ্ছে না,—চাকরিতে কাজ নেই।"

বল্লুম—"সবটা শোনো, আবার দয়াও আছে, 'গরু মেরে জুতো দান' যাকে বলে। জেনারেল্ সাহেব যাবার সময় হুকুম দিয়ে

গেলেন,—যারা সময়ে এসেছে, তাদের এমাস থেকে দশ টাকা করে মাইনে বাড়্‌লো!"

ব্রাহ্মণী একগাল হেসে বল্লেন—"পোড়ারমুখোরা সব পারে! তা না ত আর রাজ্জি আছে;—ওদের কাছে অবিচারটি নেই। সে হতচ্ছাড়ারা দেরী ক'রে মোলো কেন? তবে,—তোপের মুখে,—ওঃ মা—গা শিউরে উঠে! তা অদেষ্টের লেখা ত খণ্ডাবে না, সাহেবরা কি করবে। হাঁগা, বল্লে—'এ মাস থেকে?'—আচ্ছা জুলাই মাসের আর ক'টা দিনই বা আছে, তাতেও পুরোপুরি বাড়তি দশ টাকা দেবে?"

বল্লাম—"তা দেবে—"

ব্রাহ্মণী—"ওরা এক-কথার জাত কি না,—কথার নড়্ চড়্ হয় না। এখন তুমি একটু শুয়ে পড় ত দেখি।"

বল্লাম—"আর এখন ঘুম হবে না, কাজ ত কিছুই করতে হয়নি,—টেবিলে মাথা রেখে দু' ঘণ্টার ওপর ঘুমিয়েছি। তোমারও যে-কষ্ট গেছে, বলতে প্রাণ চায় না,—কোন রকমে একটু চা'র জোগাড় হলে শরীরটা ঝরঝরে হয়ে যায়;—কেবলি সেই তিনটে লোকের চেহারা মাথার মধ্যে ঘুরেছে—"

ব্রাহ্মণী—"তোমার ও-সব ভাবতে হবে না, তাঁদের অদেষ্টে ঐ লেখা ছিল; তা না ত হতচ্ছাড়ারা—দু' ঘণ্টা ঘুমুতে যাবে, তাও পারে না ত মরবে না ত কি? আমি এখুনি চা করে দিচ্ছি—"

বাঁচলুম,—চাকরটাকে ভাল ক'রে এক ছিলিম তামাক দিতে বলে বৈঠকখানায় গিয়ে বসলুম। চাকরি সম্বন্ধে অনেক চিন্তাই মাথায় জোগান দিতে লাগল। দশ মিনিটের মধ্যেই রামলাল (চাকর) চা এনে দিলে,—সঙ্গে সঙ্গেই তাওয়াদার গয়ার পিণ্ডি।

দর্শনেই প্রাণটা যেন ফিরে পেলুম। মাথাটা নিরেট মেরে গিয়েছিল,—চায়ে চুমুক দিতেই খাজার মত তার পরদা খুলতে লাগল,—সট্‌কায় টান্ দিতেই যেন ভূত ছেড়ে গেল,—ধাতোদ্ধার হ'ল। আবার মানুষের মত হতেই—চিন্তাগুলো পুরো সাত্ত্বিক-পথ ধ'রে ঠেল্ মারতে লাগলো। ভাবতে বসলুম—রাত্রে যা করে এলুম, সেটা চাকরি, না নকুরী, না কুকুরী? কলম পেসারই ত পেশা—কিন্তু আজ যার মওলা দেওয়া হ'ল, তার কওলা ত কেরানীরে সব করেনি। তবে যাই কেন? আপত্তি উত্থাপন করি না কেন? চাকরির মায়ায় করি না—না মোহে করি না? মায়া-মোহটা এখানে জ্ঞান-ভক্তির মতই জড়াজড়ি ক'রে থাকে;—দুই-ই অবিচ্ছেদ্য আর sympathetic,—একদম্ চিনির পানা।

জ্ঞানেতে ক'রে পাচ্ছি,—চা-বাগানের recruit (নব-নিযুক্ত) কুলির,—কাজের পূর্ব্বে পেশ্‌গি বা আগাম টাকা পাবার মত, আমাদের বাল্য-বিবাহের ফলটা, চাকরি বা রোজগারের আগাম, ফলতে আরম্ভ হয়। পণ্ডিতেরা স্থির করে গেছেন,—সংসার-বিষবৃক্ষের "মধুরে ফলে" —মাত্র দু'টি; কিন্তু বিবাহস্য ফলের সংখ্যাটা শাস্ত্রকারেরা ঠিক্ ক'রে দেননি এবং সেটা 'মধুরে ফলে' কি বিদ্‌কুটে 'ফলে'—তাও বলে দেননি। বিষবৃক্ষস্য ফল দুটি—না খায়, না পরে, না বায়না ধরে, অর্থাৎ—লোকশেনে নয়। কিন্তু বিবাহস্য ফলগুলির সংখ্যা ত নেই-ই, উপরন্তু—খাবে, পরবে, ডাক্তার ডাকাবে, ইত্যাদি। আবার মহাশ্বেতার মনোবাঞ্ছাটা, অব্যক্ত স্থলেও সুব্যক্ত ঠাওরানই সমীচীন। অতএব দেখা যাচ্চে,—মায়া-মোহটার জড় ভিটেতেই মজুদ,—বাড়ীতেই বাড়চে। চাকরির উপর তার চাপ্‌টা sympathetic, যেহেতু চাকরিটাই direct feeder (প্রত্যক্ষ-পোষক), বোধ হয় তাই সেইটার

উপরই মায়াটা জড়ায়,—যেমন আত্মাটাকে অন্তরালে ঠেলে,—দেহ-বুদ্ধিটাই বাড়তে থাকে। কিন্তু মাইনে ত অধিকাংশেরই ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না, তখন উপরির উপায় উদ্ভাবনে অনেকেরই মস্তিষ্ক ক্রমে উর্ব্বর হয়ে উঠে। সেই রোজগারটাই নাকি বড় মিঠে,—কারণ সেইটাই বাহ্যিক সম্ভ্রম আর বাবুয়ানা রক্ষার বাহন,—চাকরির চারপেয়ে মায়ামৃগ।

দরজি মরজিমত স্যুট জোগায়; ময়দা নিলেই মহোদয় মুদী দয়া ক'রে ঘি-টাও লিখে রাখেন,—কারণ কেরানীদের ঋণই লক্ষ্মী; তাঁরা তাই মাথা-কেনা মুদীর উপর সন্দেহ করা বা তাঁর হিসাব দেখা অকৃতজ্ঞতা বলেই ভাবেন। মেওয়াওলা মেওয়া, ময়রা মিষ্টান্ন গচিয়ে দেয়; গয়লা তাঁদের প্রীত্যর্থে নিত্য কলসী উচ্ছুগ্‌গু করে; স্বর্ণকার বউ-বাহার হার দিয়ে যায়, মণিহার ল্যাভেণ্ডার মাথায়,—কেউ দাম চায় না! এই মোহের মওড়া সাম্‌লানোই শক্ত। তারা কেবল মাসকাবারে সেলামটা জানায়,—আর সেই সেলামেই গোলামের গায়ের মাস কাবার করতে থাকে! যেমন তিথি-জ্বর, পালা-জ্বর আছে, তেমনিই কেরানী-জ্বরের পালা—প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাটা। সেটা কাটাতে পারলেই—কেরানী গা-ঝাড়া দে' আবার জবাকুসুম মাখে!

বক্তব্যটা বেজায় বেড়ে যাচ্চে—থাক্, শুনে—সেকেলে "Human Understanding"-এর লক্ সাহেব, কবরে কেঁপে উঠতে পারেন। ফল কথা—গুড়ুকের টানে টানে গবেষণা ঘোরালো হ'য়ে, শেষ এমন একটা সত্য আবিষ্কার ক'রে ফেল্লে,—যার বিরুদ্ধে কারুর কথাটি কওয়া চলে না। প্রারম্ভেই নিবেদন করেছি—সম্ভ্রম রক্ষার্থে বাগ্‌জাল বিস্তার চলতে পারে,—চলেও থাকে; কিন্তু চাকরের কাছে চাকরির আসন—মনিব ছাড়া সবার ওপর।

মহাত্মা Job (যোব) বলেছিলেন—"আমার কিছুই হয়নি,—আমি এখনো ঐ কুকুরটার মতও নিরভিমান সহিষ্ণু হতে পারিনি! ওকে শতবার দূর দূর করে তাড়ালে, এমন কি আঘাত করলেও, ও তখুনি এসে প্রভুর পায়ের কাছে ল্যাজ্ নাড়ে, আর কাতর চক্ষে ক্ষমা চায়। আমি তেমনটি হতে পেরেছি কই?" মহাত্মাকে কোন প্রভুত্ব পরায়ণ (imperious) মনিবের চাকরী করতে হয়নি; তা'হলে বোধ হয় উক্ত ক্ষোভের কারণ থাকত না। আমাদের অনেকেরই সে ক্ষোভটা ত নেই-ই, বরং সগৌরবে বল্‌তে পারি,—"তবু ল্যাজ্ নেই!"

মজুমদার ভায়া করজোড়ে বলিলেন—"আমার ঘাট হয়েছে বাঁডুয্যে, এ bitter pill (তিক্ত বটিকা) আর গিলিও না,—have mercy (দয়া কর)"।

বলিলাম—"আর ছুটো কথা মাত্র। সংক্ষেপেই বলি,—তখন সট্‌কা থেমে গেছে, চিন্তা থামেনি; ভাবচি,—গতরাত্রে যে-দুর্য্যোগের মধ্যে ছুটে বেরুনো হয়েছিল, বাপ্ মা বল্লে (যদিও তাঁরা কখন এমন কথা বল্‌তেন না)—এই মিছে কাজে, বা অনিশ্চিত ভাবী বিপদের বিরুদ্ধে তয়ের থাকবার তালিম্ নেবার জন্যে, ঐ সঙ্কট অবস্থায় কোন ছেলে বেরুতেন কি? আমার ত মনে হয় এমন বৃষকেতু আমাদের মধ্যে বিরল। আত্মসম্মান রক্ষার্থে স্বয়ং ভগবানও এমন আদেশ করতে ভয় পেতেন, কারণ সে আদেশ অমান্য হবার আশঙ্কাই ষোল আনা। সকলেই বেশ জানেন—এঁদের কাছে ক্ষমা আছে। যে কারণেই হোক্, ও-ক্ষেত্রে কারুর কথাই যে থাকত না, সে-সম্বন্ধে লুকোচুরি থাকতে পারে না, মনকে চোখ-ঠারাও চলে না। চাকরি যার জাত মেরেছে,—ধাত্ মেরেছে, তার কাছে ও-জিনিষটা যে, ভগবান কি বাপ-মায়ের

ওপর, সে-কথাটা ত্রয়ীর মুখে না শুনলেও তোপের মুখে শুনে নিয়েছি।

ভাবনাটা আরো কত এগুতো জানি না; কিন্তু ব্রাহ্মণী বলে পাঠালেন—"পউনে দশটা।" ও-সংবাদে বাপ-মার শ্রাদ্ধ থেমে যায়। ভাবনাটা যেন স্প্রিং ছিঁড়ে কোথায় ছট্‌কে পড়্‌ল। উঠে পড়লুম।

আপিসে গিয়ে দেখি সকলেই হাজির! কারুর আর পূর্ব্বভাব নেই! আলোচনা আরম্ভ হয়েছে—তোপের আওয়াজটা কার কর্ণ-কুহর সর্ব্বাগ্রে পবিত্র করেছিল, কে সর্ব্বাগ্রে এসে হাজির হয়েছিল;—আর সেই বাহাদুরিটে নিয়ে, উঁচু সুরে কাড়াকাড়ি চলেছে। এ-কাণ্ডের আধ্যাত্মিকভাবই এই। কিমধিকম্-ইতি—

আমাদের বড়বাবু ছিলেন গৌরবর্ণ পুরুষ। হাসির মধ্যেও তাঁহার বদনমণ্ডলে মাঝে মাঝে নীলের আভাযুক্ত ঈষৎ লোহিত ফুটিয়া উঠিতেছিল। তিনি বলিলেন—"খুব বলে নিলেন বাঁড়ুয্যে মশাই;—আমরা কিন্তু hide-bound (ছালপুরু) হয়ে গিছি। সন্ধ্যা না হয়ে গেলে মুক্তিস্নানের চেষ্টা পেতুম, এখন তার আর সময় নেই, too late।"

পঞ্চানন বিনীতভাবে জানাইল—এঁরা যে এটাকে ট্রাজিডির দিকেই টানচেন। কলকেতায় ফিরতে পারলে, এই ফলহরি ঠাকুরের (চাটুয্যের) পায়ের ধূলো নে' ফলের দোকান খুলব। আপনার পা ছুঁয়ে বলচি—চাকরী কোরব না। এখন দয়া ক'রে সেই কবিতাটা—

মজুমদার ভায়া সোৎসাহে বলিল—"Thank you পঞ্চানন; আমাদের আসল কথা ত সেইটেই ছিল। উঃ—বাঁড়ুয্যে এতক্ষণ কি হিপ্‌নোটাইজ্‌ই ক'রে রেখেছিল! না—তা হচ্ছে না ভায়া! কি জানি কোথায় ঠেলে দেবে, এমন দিন আর পাব না।"

দত্তজা বলিলেন—"সেটা ঠিক বটে। আর সকলেরি যখন ইচ্ছে সেটাকে snub করা (দমিয়ে দেওয়া) তোমার nature-এর (প্রকৃতির) অনুরূপ কাজ হবে না বাঁড়ুয্যে।"

দত্তজাকে একথায় যোগ দিতে দেখিয়া আমি ত অবাক্! বোসজা এত বড় pleaটা (ওছিলে) পেয়ে বল্লেন,—"নাঃ—আর আপনার 'না' বলা উচিত হবে না। দত্তজার এই অনুরোধটিকে তাঁর maiden speech (লজ্জাভাঙ্গা লেক্‌চার) বলা চলে। এটা আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন বলে নেওয়াই উচিত।"

কথাটা মিথ্যা নয়। দত্তজাকে হাসিতে বা কথা কহিতে কদাচ কোন ভাগ্যবান্ দেখিয়াছেন। আর দ্বিরুক্তি করা যুক্তিযুক্ত নয় ভাবিয়া বলিলাম —"বেশ, আজ স্টুয়ার্ড সাহেব আমাদের ভোজ দিচ্ছেন, সেই আসরেই এক টুক্‌রো পেশ করা যাবে ;—কিন্তু শেষ রক্ষার ভার বোসজা মশায়ের।"

মহোল্লাসে মজ্‌লিস্ ভাঙ্গিল। পঞ্চানন আর হরিপদকে কি একটা ইঙ্গিত করিয়া চাটুয্যে চট্ করিয়া নীচে চলিয়া গেল। তাহারাও অবিলম্বে অনুসরণ করিল। তখন বেলা প্রায় পাঁচটা। আমি আজ এই অসময়েই নিজের কেবিনে ঢুকিলাম।

—৩০—

আজ আমরা স্টুয়ার্ড সাহেবের guest (অতিথি)। রাত্রি নয়টার সময় সেই বিশেষ ভোজে হাজির হওয়া গেল। আজ সকল বন্দোবস্তই first class (প্রথম শ্রেণীর), সাজসজ্জা সবই সুন্দর,—table-cloth (টেবিল ঢাকা কাপড়) খানা যেন বড় বাড়ীর বরাসন ;—একেবারে রাজত্তি! বেজায় অনভ্যাসের ঠ্যাটা,—না আছে পিঁড়ে যে, উবু হয়ে বসি, না আছে উলঙ্গ-ছেলেমেয়ের পাল

যে, পাতের সন্নিকটেই কোনরূপ ত্যাগের দ্বারা ভোগের বাহার বাড়ায়; মাথার উপর বাঁশের আল্‌নায় না আছে নিশি-পদ্মা কন্থা যে, সুন্দর আহার সমাপ্তির পন্থা করিয়া দেয়। এই সময় ফ্রাইডের মত চাটুয্যের প্রবেশ ও তৎ-পশ্চাতে প্রকাশিতদন্ত পঞ্চানন—অনেকটা relief (স্বস্তি) দিল, একটু স্বচ্ছন্দ বোধ করিলাম।

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা বিশেষ আবশ্যক। আজিকার রাত্রিটি, আমাদের এ-যাত্রার জাহাজ-বাসের শেষ রাত্রি;—কাল কূল পাইবার দিন,—এ বিভীষিকাময় সুখের রাজ্য খসিয়া যাইবে। তাই আজিকার রাত্রিটা তরুণদের কাছে যেন বিজয়ার রাত্রের মতই উপস্থিত হইয়াছে। তদুপরি এই জামাই-ভোজ! কাজেই তাহাদের আনন্দ-বাহুল্যটা আজ একটু ক্ষমার চক্ষে (charitably) দেখিতে অনুরোধ করি।

পাকস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন আকারে প্রকারে ও বর্ণে মৎস্য-মটনের মহোৎসব আরম্ভ হইল। তাহাদের বর্ণনাটা বাদ দেওয়াই ভাল, নচেৎ আবার একখানি পাশ্চাত্য পাকপ্রণালী ফাঁদিতে হয়। শ্রুত ছিলাম—আমাদের দত্তজা বাল্যকালে "খোরায়" খাইতেন, অন্যথা তাঁহার খর্পর খালি থাকিত। জাহাজে পদার্পণের পর তাহার কিছু কিছু পরিচয়ও পাই। কিন্তু আজ এই ভোজ-সভায় দত্তজার খোরাকের বিপুল বহর দেখিয়া, সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে তাঁহাকে খেতাব দেওয়া হইল "খোরাশানী"। তন্ময় চাটুয্যে তখন আড়াই সের আন্দাজ উদরস্থ করিয়াছেন, চপ্‌ ছাড়িয়া ফ্রাই try করিতেছিলেন। এমন সময় "খোরাশানী" খেতাবটা কর্ণে প্রবেশ লাভ করায়, তাহার চটকা ভাঙ্গিল, সঙ্গে সঙ্গে হবদম ঐ কথার আবৃত্তি ও হাস্য আরম্ভ হইল। হরিপদও তাহাতে যোগ দিল। আমি অবাক হইয়া গেলাম, কারণ হরিপদ আদৌ বে-আদব্‌ ছিল না—বিশেষ আমাদের সমক্ষে।

দেখি, পঞ্চানন বেশ গম্ভীরভাবে জ্যামের (মোরব্বার) পাত্রটা ধীরে ধীরে তাহাদের সম্মুখে ঠেলিয়া দিতেছে। তখন চাটুয্যের বৈকালিক ইঙ্গিত এবং পঞ্চানন ও হরিপদর তাহাকে অনুসরণের কথাটা স্মরণ হইল;—বুঝিলাম, নিশ্চয়ই আবদুল্লার আড্ডায় গিয়া ভোজপুরী ভাং খাইয়া মরিয়াছে। পঞ্চানন তাহাদের আরো পাকাইয়া তুলিবার ইচ্ছায় জ্যামের পাত্রটি সহজলভ্য করিয়া দিতেছে। আমি পাত্রটি অন্যত্র চালান করিয়া দিলাম। কিন্তু "খোরাসানের" অবসান নাই। অনেক করিয়া তাহাদের আবার আহারের দিকে মোড় ফেরান হইল। ইতিপূর্ব্বেই চাটুয্যেকে "ভোজ-ভৈরব" খেতাব দেওয়া হইয়াছিল; —আজ বোধ হয় সেই উপাধির উপদেবতা তাহার উদরে আসন গাড়িয়াছিলেন। সে নিমেষমধ্যেই প্রচুর cake (পিষ্টক) ও pudding (পায়েস্) ধ্বংস করিয়া পুনরায় পাকিয়া দাঁড়াইল। কেবল হাসে আর ব'লে—"আচ্ছা,—বাঁড়ুয্যে মশায় 'পিনাং' কি?"

পঞ্চানন এতক্ষণ অতিকষ্টে আত্ম-সম্বরণ করিতেছিল; ভিতরে ভাংয়ের টান্-ধরায়, Jockey-Cap-এর কার্ণিসের মত তাহার উপর পাটির দন্তগুলি বদনের বহির্দ্দেশে হাজির হইয়াছিল। সে আর পারিল না; টেবিলের নীচে মাথা গুঁজিয়া, হাসির ধাক্কায় টেবিল কাঁপাইয়া তুলিল। ক্রমে লম্বা ময়দানব-ছন্দ আরম্ভ করিয়া দিল। কেবলি বলে—"ওঃ বাবা, লিহংচংএর প্রেতাত্মা গোর ফুঁড়ে বেরুল নাকি? বলে—'পিনাং কি?' চীনে পা না-দিয়েই চীনে বুলি চালিয়ে দিলে রে বাবা! সবাই 'র‍্যাংচ্যাং' বলুন—'র‍্যাংচ্যাং' বলুন;—চীনে ভূতে চেপেছে!" আর বেদম্ হাসি।

মজুমদার ভায়া না-দেয় তাহাদের করিতে, না-দেয় তাহাদের থামাইতে। তাহার ইচ্ছা—আনন্দ বা মজাটা পুরো মাত্রায় উপভোগ

করা। কিন্তু শ্রাদ্ধ বহুদূর গড়ায় দেখিয়া, ঘোসজার সাহায্যে সেটাকে দমন করিতেই হইল। তবুও এক একবার ভিজে ছুঁচোবাজির মত, অকস্মাৎ দমকা-বেগে তাহা ফর্‌ফর্‌ ভর্‌ভর্‌ শব্দে উচ্ছুসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এ-সম্বন্ধে এই পর্য্যন্তই ভাল।

যাহা হউক, ভোজের কোন অঙ্গহানি হয় নাই। সে-সম্বন্ধে সকলেই প্রায় সমান সচেতন ছিলেন। টেবিল্‌ সাফ্‌ হইল; এইবার দ্বিতীয় চ্যাপ্‌টার চলিবার কথা। আমোদের ঝোঁকে সকলেই সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। আমি বলিলাম—"আজ চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে, ইহার পর কোন subject-ই (বিষয়ই) জমিবে না।"

বড় বাবুর বক্তব্যে বুঝিলাম,—বিষয়টা (কবিতাটা) সে-ক্ষেত্রে বিমলিন হইয়া মাধুর্য্য হারাইবে, কারণ, কাল চরণার্পণে চীনকে চরিতার্থ করিবার বন্দোবস্তে সকলকে ব্যস্ত থাকিতে হইবে। চীনে উপস্থিত হইলে, কিরূপ অবস্থা ও ব্যবস্থা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, তাহাও অনুমান করা কঠিন;—সুতরাং এ সুরলোকের সুর, যে গোলাম-লোকে কতটা বজায় থাকিবে, সে-সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ। আজিকার এই অধীর আগ্রহটা মাটি হইয়া যাইলে,—কবিতাটাও তার যোগ্য সম্মান পাইবে না—ইত্যাদি। সম্মান সম্বন্ধে আমি এক প্রকার নির্ভয়ই ছিলাম।

দত্তজা খুব গম্ভীরভাবে, বড়বাবুর অভিমতটা অনুমোদন করিলেন। মজুমদার ভায়া ত মূলগায়েন ছিলেনই, পঞ্চানন ও চাটুয্যে চিতেন ধরিলেন। ফল কথা—আমি রেহাই পাইলাম না। বলিলাম—"একটু মুখবন্ধ আছে; শুনেছি, পরকীয়া প্রেমের ক্ষেত্রে ইঙ্গিতই নাকি সরসে মিঠে; তেমনি কবিতার সারাংশ সঙ্গীতের ভিতর দিয়েই ইঙ্গিতের কাজ করে। সময়াভাবে, আমার বক্তব্যটাও তাই সঙ্গীতেই

বন্ধ করিতে বাধ্য হয়েছি। দ্বিতীয় কথা, যখন দেবীদের পা নিয়ে আলোচনা, তখন বিষয়টা "মানভঞ্জনই" নিতে হয়েছে। তিনের নম্বর,—বিষয়টা যখন রাধার প্রেমই দাঁড়িয়ে গেল, তখন পদকর্ত্তা মহাজনদের সম্মানরক্ষার্থে, প্রথম লাইনটা তাঁদেরি পদাঙ্ক অনুসরণে ব্রজ বুলিতে আরম্ভ করেছি। ইতি—

এই বলিয়া, কাগজখানা মজুমদার ভায়ার হাতে দিলাম। পঞ্চানন তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। প্রথম লাইন পড়িতে গিয়া ভায়া নিজেই পড়িয়া গেলেন, কথাটা অনুচ্চারিতই রহিল।

বোসজা গম্ভীরভাবে বলিলেন—"কি সব ছেলেমানুষী কর, দাও, বাঁড়ুয্যে মশাই নিজেই পড়ুন।" মজুমদার করজোড়ে বলিল,—"মাপ করুন বড়বাবু, পড়াটা যেন উপরের ডেকে গিয়ে হয়, এখানে ডিগ্‌বাজি খাবার জায়গা পাব না।" বোসজা বলিলেন,—"না-না, তোমাদের এ-সব বাড়াবাড়ি; একটু স্থির হয়ে শুনতে দাও।" পঞ্চানন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল—"দিন্, আমিই পড়্‌চি।" দত্তজা বলিল—"নাঃ বাঁড়ুয্যেই পড়ুক, তানা ত motion ঠিক হবে না।" মজুমদার বলিল—"সে-বিষয়ে আজ কারুর দুঃখু থাকবে না!"

বোসজা বিরক্ত হইয়া কাগজখানা লইয়া আমার হাতে দিলেন। আমি বলিলাম—"এটা ঠিক্ ঠাকরুণ-বিষয় না হলেও, দেবী-বিষয় বটে;—এতে হাসি-তামাসা চল্‌তে পারে না। জানি না, মজুমদার ভায়া পূর্ব্ব হ'তেই কেন আপনাদের prejudiced ক'রে দিচ্ছেন।"

শুনিয়া সকলেই গম্ভীর হইয়া বসিলেন। সুরু করিলাম—

"একটু হঠ্‌কে বইঠো হরি!"

সর্ব্বনাশ! বড়বাবু হইতে ছোটবাবু পর্য্যন্ত হাসির একটা হুল্লোড় পড়িয়া গেল। বলিলাম—"তবে মাপ্ করুন, এ রইল।" চেষ্টা করিয়া সকলে একটু স্থির হইলেন।

"একটু হঠ্‌কে বইঠো হরি!"

অত ঘেঁসে যেওনাকো,—মরিয়া এখন রাধা প্যারী॥

চীনের রাধা পা' চালালে,
চোট্‌কে তোমার যাবে পীলে,
বেটক্করে লেগে গেলে
একেবারে যাবে মরি॥

একটু হঠ্‌কে বইঠো হরি!
ও-নহে পদ-পল্লব,—
বিশুদ্ধ লৌহ ভৈরব;
হাত বুলুতে সাধ্ যদি হয়—
(হরি) কর সে কাজ উকো (file) ধরি।
একটু হঠকে বইঠো হরি॥

সমঝে কেষ্ট কর কাজ,
রাধার এখন্ পুরো ঝাঁজ,
ঐ steel frame-এর *—প্রেমের গুতো—
(তোমার) সইবে না হে বংশীধারী!
একটু হঠ্‌কে বইঠো হরি॥

পড়াটা কোন প্রকারে শেষ করিলাম। সে-সময়টার ও তাহার পরবর্ত্তী কিছুক্ষণের কথা বর্ণনা না করাই সভ্যতা-সম্মত। আমাদের

* লোহার জুতোর—

দারুভূত দন্তও যে এতটা মত্ত হইতে পারে, তাহারও প্রমাণ পাইলাম। যাহা হউক, আজ সকাল হইতে যে উদাস ভাবটা সকলের বুকে ভারের মত চাপিয়াছিল, সেটা হট্টগোলের মধ্যে হার্ মানিয়া একদম হটিয়া গেল।

জগতে সকল জিনিষের সারটাই টিকিয়া থাকে, যেমন সংসারের সার "যন্ত্রণা";—তেমনি চাটুয্যের "পিনাং" ও মাদৃশ সাঁচ্চা কবির—"একটু হঠ্কে বইঠো হরি,"—আমাদের সুদীর্ঘ চীন-প্রবাসের অবসন্ন ও অবসাদিত মুহূর্ত্তগুলির মকরধ্বজ হইয়াছিল।

রাত্রি বারটার পর যে-যার শয্যা লওয়া গেল; চাটুয্যে তৎপূর্ব্বেই লাশ হইয়া পড়িয়াছিল।

—৩১—

রাত্রি আন্দাজ দুইটা হইবে; রজনীর নিস্তব্ধতায় সহসা সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দন কানে আসিয়া, ভাসা-ভাসা ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল। সবিস্ময়ে বালিস হইতে মাথা তুলিতে হইল। জাহাজখানা স্বয়ং স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক হইলেও, তাহার গর্ভমধ্যে কোনদিন কন্যারাশির গন্ধ পর্য্যন্ত পাই নাই;—এ কেমন হইল! তবে কি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মেমসাহেব সঙ্গেই আছেন! সম্ভবতঃ, গর্ভবতী লজ্জায় নেটিভ্-নয়নের অন্তরালে বাস করিতেছিলেন; কারণ ঐ কদর্য্য উপসর্গটা বিলক্ষণ সৌন্দর্য্যহানিকরও বটে। ভগবানের এই অবিচারের বিরুদ্ধে আমেরিকায় নাকি মেয়েরা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন। বোধ হয় সেকালে এইরূপ একটা বিভ্রাটের সূত্রপাত দেখিয়া, আমাদের দেবাদি-দেব স্বয়ং এ-বিপদটি পেটে ধরিয়া, মামলাটা আপোসে মিটাইয়া লইয়াছিলেন। একালের প্রেসিডেণ্ট তা পারিবেন কিনা জানি না।

অবাক্ হইয়া ভাবিতেছি ;—বড়বাবু আসিয়া ডাকিলেন। দ্বার খুলিয়া দেখি—সঙ্গে আমাদের খাঁ-সাহেব (Purchasing Agent)। তবে ত মামলা সহজ নয়! জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাপার কি—এত রাত্রে!" বড়বাবু বলিলেন—"কিছু শোনেননি কি!" "কচি ছেলের কান্নার কথা বলচেন! ও বোধ হয় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব পুত্ নামক নরক হতে উদ্ধার হলেন,—আমাদের আর একটি মালিক বাড়্লো।—মুখ দেখতে হবে নাকি ?"

বড়বাবু—তামাসার কথা নয় বাঁড়ুয্যে মশাই—

আমি—না হয় আনন্দের কথা হল ; এখন করতে হবে কি ?

বড়বাবু—ওপরে হুলুস্থুল পড়ে গেছে,—চারদিকে পাহারা মোতায়েন্! একজন করে সাহেব সঙ্গে, খানাতল্লাসী খালাসির দল (search party) বেরিয়েছে! খাঁ-সাহেব খুবই ভয় পেয়েছেন,—আমার কাছে ছুটে এসেছেন।

আমি হাসিয়া বলিলাম—"অত বড় দাড়ি—ওঁর আবার ভয়ের কারণটা কি ?—সমুদ্রের হাওয়ায় এমন হয় নাকি ?"

খাঁ-সাহেব অতি কাতর ভাবে বলিলেন—"হাসি-মস্করার বাত নয় বাবু,—আমি বড়ই বিপদ বোধ করচি।"

তাঁর বলিবার ভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর আমাকে থামাইয়া দিল।

বড়বাবু—আপনি জানেন না! ফলোয়ারদের ভার (charge) যে ওঁর, উনি যে তাদের কাজ-কর্ম্মের জন্য responsible (দায়ী)।

আমি—তা ত জানি, তাঁর সঙ্গে ছেলে-কাঁদার সম্পর্কটা কি!

খাঁ-সাহেব—বাবু সাহেব, আপনি ও বেইমানদের চেনেন না, এমন কাজ দুনিয়ায় নেই যা ওদের অসাধ্য। কম্বক্তেরা স্ত্রীলোককে পুরুষের পোষাকে "চিত্রাল্" অভিযানে পর্য্যন্ত (Chitral

Expedition-এ) নিয়ে গিছলো! সে কি বিপদ! শেষ, দুজন জমাদারের Court-martial (সামরিক আদালতে বিচার) হয়। তাতে বদমাইসরা বল্লে কিনা—"এজেণ্ট্ অনন্তরামবাবুর জন্যে তাদের এ কাজ করতে হয়েছে, তানা ত চাকরী পায় না।" মাগীটাও তাতে সায় দিলে! অনন্তরামবাবু বৃদ্ধ প্রাচীন লোক, অতি সজ্জন; তিনি ছিলেন গমস্তা (agent), হুলুস্থুল পড়ে গেল। কর্ণেল সাহেব তাঁকে ভাল রকম জানতেন, তাই অনেক করে বাঁচিয়ে দিলেন। কিন্তু বদনামের বাকি রইল না। তিনি retire করলেন (পেন্‌সন্ নিলেন) আর সেই আঘাতে এক বৎসরের মধ্যে মরেও গেলেন। বেইমানরা কিন্তু বেত খেয়ে, নাম বদলে, বরাবর বেশ বাহাল হচ্ছে। এ দলেও যে সে জালিমরা নেই, তা কে জানে। আল্লামিঞার কি মরজি জানি না—" বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জল ভরিয়া আসিল। তিনি স্বধর্ম্মপরায়ণ নেমাজী মুসলমান, নির্ব্বিরোধী এবং শান্তপ্রকৃতির লোক।

তাঁহার কথা শুনিয়া ও অবস্থা দেখিয়া, ছেলে-কাঁদার গুরুত্বটা উপলব্ধি করিয়া ভীত হইলাম। দেখি বড়বাবুর মুখও পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। বুঝিলাম—তিনিও ভয় পাইয়াছেন,—পাইবারই কথা; কারণ বড়দের ধরিয়াই লোক বাঁচিবার চেষ্টা করে। বদমাইসরা কাহার উপর কৃপা করিবে কে জানে; এক্ষেত্রে তিনিই সবার বড়।

বলিলাম—"আবদুল্লাকে একবার ডাকান্।" বুঝিলাম,—কেহই সে সাহস পাইতেছেন না। জাহাজের লোক্ নেটিভদের উপর নজর রাখিয়াছে; আবদুল্লাকে ডাকিয়া শেষে সন্দেহে না পড়িতে হয়, ফ্যাঁসাদ না ডাকিয়া আনা হয়। একটু দৃঢ় ভাবেই বলিলাম—"আপনার নিজেরি ত তদন্ত করা উচিত; আপনি হচ্ছেন

এ-জাহাজের non-combatant যাত্রীদের মধ্যে সবার উপর, পাঁচশ' টাকার অফিসার, আপনার authority (অধিকার)-ও আছে, responsibility (দায়িত্বও) আছে—যান্ সরাসরি চীফ্ সাহেবের কাছে চলে যান্; তাঁকে সাহায্য করা ত আপনারই কাজ।"

শুনিয়া বোসজা একটু যেন সামলাইলেন, বলিলেন—"তা আমি রাজি আছি, কিন্তু কি বল্ব!" বলিলাম—"বলবেন 'আমরা সকলেই অপ্রত্যাশিত শব্দে চম্‌কে গিছি, কিছু ঠাওরাতে পাচ্ছিনা, তাই আপনার কাছে এলাম। কারণ এ-সম্বন্ধে আমার দায়িত্ব সবার চেয়ে বেশী। আমি ফলোয়ারদের মধ্যে একজনকে ডেকে private enquiry (গোপন অনুসন্ধান) করতে চাই; আপনি কি বলেন?' এই রকম যা-হয় একটা বলবেন; ছোট হবেন না। গোড়াগুড়ি ঐ সাত-সিকে জোড়ার ধুতি পরেই ত সব মাটি করে রেখেছেন।"

তাঁর মুখে একটু হাসি ফুটিল, বলিলেন—"তার পর? আবদুল্লা যে কিছু বলবে, তার ঠিকানা কি? তাকেই আপনি ডাকতে বলচেন কেন? বরং একজন নির্ব্বোধ গো-বেচারাকে ডাকা ভাল নয় কি?"

বলিলাম—"আমার ধারণা—ধারালো অস্ত্র ছাড়া এ-সব মামলায় সুবিধে হয় না। ভোঁতা অস্ত্রে মামলা থেত্‌লে বিগড়ে যাবে! এর মধ্যে যদি কিছু থাকে ত তা আবদুল্লার অগোচর থাকতেই পারে না। মাটির মুরোদ্‌গুলিকে সে তার পাত্তাও দেবে না;—সে লোক চেনে।"

বোসজা - তবে আমি যাই?

আমি—নিশ্চয়ই, দেখচেন না চারদিকে কাণাঘুসো চলছে—

বড়বাবু দুর্গা বলিয়া পা বাড়াইলেন। খাঁ-সাহেব "আল্লা মালিক" বলিয়া নিশ্বাস ফেলিলেন।

—৩২—

তখন আহ্লাদময় একটা বিস্ময় ও রহস্য-ভেদের আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে। ভয়ভাবনার ভাবটা কেবল খাঁ-সাহেব আর বড়বাবু ভাগাভাগি করিয়াছেন। কোথাও কোথাও জমায়ৎ-মধ্যে হাসি-তামাসাও চলিয়াছে।

বড়বাবু যখন অপার-ডেকের সিঁড়িতে উঠিতেছেন, দেখি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত 'মউজী' মিস্টার সিঙ্গালী, অসম-পদে উপর হইতে নামিতেছে।

কিছু পূর্ব্বে প্রায় সকলেই কেবিনের বাহিরে আসিয়া ব্যাপারটা লইয়া নানা জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ করিয়াছিল। আমার জাহাজে-জোটা ইউরেসিয়ান মিস্টারটি আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তোমাদের heroineটি (নায়িকাটি) কোথায় ? I have come to congratulate (আমি আনন্দ জানাতে এসেছি)। Now let me bless the child (নবজাত শিশুটিকে আশীর্ব্বাদ করতে দাও)।" বলিলাম—Just come to the mirror and you will find her (আর্সির সামনে দাঁড়াইলেই তাঁকে দেখতে পাবে)।

মিস্টারটির বয়স বিশ বাইশের বেশী নয়, গোঁফ্ গজায়নি, হাতটা কিন্তু সেইখানেই থাকে, সর্ব্বক্ষণ টানাটানিও চলে।

মিস্টার সিঙ্গালী সোজাসুজি আসিয়া, মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল,—"Be not afraid Mr.—Keep yourself ready and steady to meet the Chief. He will be here presently to examine you"—(চীফ্ সাহেব এখনি এখানে আসচেন তোমায় পরীক্ষা করতে, ভয় খেওনা)।

মিস্টার—(সবিস্ময়ে) To examine me,—what for? (আমাকে পরীক্ষা করতে!—কারণ!)

মিস্টার সিঙ্গালী—They have taken you for a—dis graceful indeed! Cheer up, we are all with you. (ছিঃ তাঁরা তোমাকে কি দেখে এমনটা ঠাওরালেন! আমরা সব তোমার পক্ষে রইলুম, কিছু ভেব না)।

ঠিক্ এই সময় চীফ্ সাহেবকে সিঁড়ির উপর বড়বাবুর সহিত কথা কহিতে দেখা গেল। কথায় কথায় চীফ্ সাহেব একবার নীচের দিকে অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিলেন; ইঙ্গিতটা ঠিক্ যেন আমার মিস্টারটির প্রতিই হইল! মিস্টার সিঙ্গালী বলিল—"Have you noticed? I can swear"—(লক্ষ্য করেছ!—আমি শপথ করতে পারি—)

যেই এই পর্য্যন্ত শোনা, আমার মিস্টারটি কতকগুলি bloody বুলি উচ্চারণ করিতে করিতে চীফ্ সাহেবের কাছে ছুটিল। মিস্টার সিঙ্গালীও "a funny fool" (মজাদার নির্ব্বোধ) বলিয়া, নিজের দলে গিয়া হাসি-তামাসা জুড়িয়া দিল। সে অধিকাংশ সময়টাই এই ভাবে কাটাইত!

বড়বাবু আসিয়া বলিলেন—"আপনার ইউরেসিয়ান মিস্টারটি কি পাগল! চীফ্ সাহেবকে বলে কিনা—'আপনি কি নজিরে আমাকে মেয়েমানুষ ঠাউরেছেন?' শুনে তিনি ত অবাক্! তাঁদের মধ্যে একটা হাসি পড়ে যাওয়ায়, পূর্ব্বের দৃঢ় ভাবটা একটু শিথিল হয়ে আসতেই, সেই ফাঁকে আমি অনুমতিটা আদায় করে নিছি। এখন যা হয় করুন।"

—৩৩—

ফলোয়ারদের আস্তানায় বা আড্ডায় গিয়া দেখি, স্ফূর্ত্তির উনিশ-বিশ ঘটিয়াছে। দু' এক জন গাঁজা টিপিতেছে বটে কিন্তু উৎসাহ কম। আবদুল্লা আসিয়া সেলাম করিল, আমি হাসিয়া বলিলাম—"কি সর্দ্দার, খবর কি, সব খ্যায়ের (কুশল) ত?" আবদুল্লা আমার সহাস্য স্বাভাবিক ভাব দেখিয়া, একটু যেন বল পাইল; বলিল—"মাম্‌লা কেঁয়া হায় হুজুর?"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"মাম্‌লা আবার কি? তোদের সে ভাবনা কেন?"

আবদুল্লা আশ্বস্ত হইয়া বলিল—"তোভি বাত্‌ ক্যা হায় হুজুর?"

বলিলাম—"ওরা ত আমাদের চেনে না, একটুতেই ভয় পায়। বাইরে বন্দুক নিয়ে হুটপাট্‌ করতে পারে, আর বাড়ীতে মেম সাহেবের গোলামী করতেই জানে! বলে—'জাহাজে বাচ্চার কান্না এল কোথা থেকে,—ভূত্য নয় ত!" এই বলিয়া আমি হাসিতেই, আবদুল্লা হাসিয়া বলিল—"এই বাত্‌! বাচ্চাকে টেঁ টেঁ শুনতেহি এহি,—আভি বুড্‌চাকে নেহি শুনা! শুনাদে হুজুর?"

হঠাৎ আমার ভিতরে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। ভাবনা উৎকণ্ঠার টান্‌গুলা সহসা শিথিল হইয়া পড়িল। তাই নাকি? আবদুল্লা ত সকল বিদ্যাতেই ওস্তাদ;—ব্যাপারটা কি তারই অনুকরণবিদ্যার ফল! এতবড় গুরুতর বিষয়টা কি তার "হরবোলামী" ছাড়া আর কিছু নয়?

বলিলাম—"এখন নয় আবদুল্লা; কিন্তু কাপ্তেন সাহেবকে ঐ কান্নাটা না শোনালে তাঁর ভয় ভাঙ্গবে না, লোকটা ভারি ভীতু আর

কিছু বড়িয়া মাল থাকে ত, তারও দু-একটা শুনিয়ে সকলকে খুস্ করে দিতে হবে। পারবি ত?"

আবদুল্লা বুক ঠুকিয়া বলিল—"ওস্তাদ্‌কে কৃপাসে হাজ্জারো হায় হুজুর,—আপ হুকুম্ দিজিয়ে না।"

হাসিয়া বলিলাম—"তোমার আবার ওস্তাদ্ আছে নাকি?" আবদুল্লাও হাসিল। সকলকে উৎসাহ দিয়া ও "মউজ্" করিতে বলিয়া ফিরিলাম।

আসিয়া দেখি খাঁ-সাহেবের মুখ বিবর্ণ, বড়বাবুও বিশেষ চিন্তাকুল; সকলকে অভয় দিয়া রিপোর্ট দাখিল করিলাম। উভয়ে যেন বদ্ধ-শ্বাস ত্যাগ করিয়া বাঁচিলেন। খাঁ-সাহেব আমার মস্তকে বাছাবাছা ফারসী "লফ্‌জের" আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিলেন ও খোদাকে বারবার স্মরণ করিয়া বাষ্পাকুলনেত্র হইলেন। ক্ষণিক স্তব্ধ-বিস্ময়ের পর বড়বাবুর মুখে হাসি দেখা দিল,—বলিলেন—"বেটা ওস্তাদ বটে।"

বলিলাম—"এখন আপনি যা হয় করুন; চীফ্‌সাহেবকে রিপোর্টটা দিয়ে আসুন। কিন্তু দেখবেন—আবদুল্লার উপর কোনরূপ কটাক্ষ না আসে। তাঁকে বুঝিয়ে দেবেন—তারা গাঁজার নেশায়, নিজেদের মধ্যে আমোদ-প্রমোদ করছিল মাত্র, তাতে যে এতটা দাঁড়াতে পারে, তা তাদের মাথায় আসেনি। তা' ছাড়া—জাহাজে আজকের রাত্রিটাই শেষ রাত্রি, এ হাঙ্গাম আর তাঁদের পোহাতে হবে না।"

বড়বাবু এবার উৎসাহের সহিত যাত্রা করিলেন।

জাহাজে যাত্রীদের মধ্যে নেটিভ ক্রিশ্চান ছাড়া সাহেববেশধারী ইহুদী, পার্শী প্রভৃতিও ছিলেন। সকলেই একটা বড় রকম development (বাড়াবাড়ি) ও finding-এর (ধরপাকড়ের) আশায় হাঁ করিয়া ছিলেন, এবং নেটিভ্‌দের নাকাল হইবার ও লাঞ্ছনার মজাটা

উপভোগের জন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়াও উঠিয়াছিলেন। জানি না এমনটা কেন হয়। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন—"আমরা এক আত্ম-বিস্মৃত জাতি।" বোধ হয় পোষাকের মধ্য দিয়াই এই ভাবান্তরটা ঘটিয়া আসিতেছে, বেশান্তরই ভাবান্তর আনিয়াছে।

বোসজা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"কাপ্তেন সাহেব আর চীফ সাহেব কান্নাটার পুনরাভিনয় না শুনে, বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নন; তাঁরা সব দল বেঁধে আসছেন। আপনার আবদুল্লাকে ডাকুন।"

ভাবিয়াছিলাম, এরূপভাবে পরীক্ষা দিতে আবদুল্লা ভয় পাইবে। দেখি—সে যেন তাহাই চাহিতেছিল; স্ফূর্ত্তির সহিত আসিয়া হাজির হইল; সাহেবেরাও উপস্থিত হইলেন। সে তথন এক মিলিটারি সেলাম ঠুকিয়া চীফ্ সাহেবকে বলিল—"হুজুর, আমাকে একটু পর্দ্দার পেছনে থাকতে হুকুম দিন্, সামনে ইয়ে কামকা মজা উড়্ যাতা।" সাহেবেরা একটু ইতস্ততঃ করিয়া, বিশেষ পরীক্ষান্তে, একটা খালি কেবিন্ তাহাকে দিলেন।

আবদুল্লা পুরাতন পাপী। কাহারও নিকট তাহার শঙ্কা-সঙ্কোচ কমই ছিল। সে সেলাম করিয়া কেবিনে প্রবেশ করিবার সময় সাহেবদের বলিল—"হুকুম হোয়ে তো আউর ভি কুছ্ শুনায়েঙ্গে হুজুর্।"

* * * *

আবদুল্লা আসিবার সময় বোধ করি কেহ কেহ তাহার উপর আসামীর উপহাস বর্ষণের আনন্দ ও লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

এইবার নেটিভদের nasty (নোংরা) রহস্য রাষ্ট্র হইবার ও তাহা উপভোগ করিবার সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া, দু-একজন এক এক পদ অগ্রসর হইতেছিলেন,—এতক্ষণ সাহস পান নাই। পরে আবদুল্লাকে

কেবিনমধ্যে অবরুদ্ধ করায়, অনেকেই "ডবল্‌-মার্চ" করিয়া, আবদুল্লা-সম্বন্ধে নানা অভিমত প্রকাশ করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন।

আবদুল্লার সদ্যোজাত শিশুর কান্না এতই স্বাভাবিক হইল যে, সকলেই এদিক ওদিক, উপর নীচে, পরে পরস্পরের মুখের প্রতি, নির্ব্বাক্‌ বিস্ময়ে তাকাইতে লাগিলেন। এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে, কোন কোন মিস্টারের মুখ ফ্যাঁকাশে, আর উৎসাহটা ফিকে মারিয়া গেল।

তাহার পর দুষ্ট, এক অভিনব অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিল। বিষয়টা—"মিস্টার ডি-মার্টিন্‌ ও বিবি—সুখীয়া ধোবিন্‌!" তাহা এতই উপভোগ্য হইয়াছিল যে, কড়া-মেজাজের কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত ছেলে-মানুষের মত হাসি ও হাততালি আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। বর্ণনাটা সকল বর্ণের সমান প্রীতিকর নহে বলিয়া বাদ দিলাম।

আবদুল্লা কিছু পুরস্কারও পাইল। এক জন বলিলেন—In Europe he could have earned forty pounds a month (য়ুরোপে হলে লোকটা মাসে হাজার টাকা উপায় করতে পারত।)

যাহারা প্রহরায় নিযুক্ত ছিল, তাহাদের—"হোগিয়া—যাও" বলিতে বলিতে চীফ্‌ সাহেব উপরে চলিয়া গেলেন।

জগতে সকলেই একটা শাঁসালো কিছু চায়। এত বড় আয়োজন আর উৎসাহের পর, ব্যাপারটা যে এমন ফাঁকা দাঁড়াইবে, কেহ তাহা আশা করে নাই; তাই উপসংহারটা উপভোগ্য হইলেও, দেখা গেল—অধিকাংশের কাছেই সেটা যেন বাঞ্ছনীয় ছিল না। তাহারা ক্ষুব্ধও হইল।

খাঁ-সাহেব নিশ্চিন্ত মনে নেমাজে গেলেন; আমরা শয্যা লইলাম। তখন ভোর হয়-হয়।

—৩৪—

আমাদের চীন-যাত্রার শেষ রাত্রি কখন শেষ হইল জানি না। যখন অপার ডেকে আসিলাম তখন বেলা আটটা বাজিয়া গিয়াছে। ভাঙ্গের ভৈরবদের ঘুম ভাঙ্গিল সাড়ে আটটায়। আজ চায়ের মজলিস্ বসিল নয়টার পর।

রাত্রের ঘটনা লইয়া আলোচনা চলিল। এমন মজাটা উপভোগ করা হইল না বলিয়া মজুমদার ভায়া ক্ষতি বোধ করিলেন ও বলিলেন—"হায় হায়—কান্নাটা আমার কানে গিয়েছিল হে!" পঞ্চানন পস্তাইতে লাগিল।

বলিলাম—"খোদ্ কর্ম্মকর্ত্তা—আমাদের সঙ্গেই রহিল, কত শুন্‌বে শুনো।"

আবদুল্লার উল্লেখ পর্য্যন্ত দত্তজার অরুচিকর ছিল। তাঁর এই অসার খলু সংসার পার হইবার একমাত্র কর্ণধার যে, "হক্‌ল্লী-স্পেন্সার" এইটাই তিনি সকল আলোচনার মধ্যে গুঁজিয়া দিবার প্রয়াস পাইতেন। তাই সাঙ্গপরা সাহেবদের প্রতি আবদুল্লার ইঙ্গিত সম্বন্ধে, তিনি বেজায় চটিয়া সেই সার্‌মন্ (sermon) সুরু করিতেই, যথা—"What is life but reputation and character" (চরিত্র আর খ্যাতিই জীবন) মজুমদার ভায়া শূন্যে তাকাইয়া একটু নীচু গলায় উচ্চারণ করিলেন—"শুধু একটা 'ইঃ' আর একটা 'উঃ' আর একটা "আঃ,' এ ছাড়া জীবনটা কিছুই নাঃ!" "Nonsense" বলিয়া দত্ত বড়-কথায় ঝুঁকিতেই বোসজা বলিলেন—"দত্ত, এখানে তোমার ও-সব বড়-কথা কেউ বুঝতে পারবে না ভাই, বৃথা অপব্যয় কোরোনা; বরং ভারত-চন্দ্রের ভাঁড়ার থেকে কিছু শোনাও। আবদুল্লা অশিক্ষিত লোক,—

শিক্ষাভিমানীরা তাকে না ঘাঁটালে—মেড়ার শিংয়ে হীরের ধার ভাঙে না। ও হীরের কদর বুঝবে কি ?”

মজুমদার ভায়া মজা-লোলুপ লোক, সে বলিল,—“তবে, শিক্ষিতমণ্ডলীর ভিতরে আমার একটা আবেদন আছে। গত রাত্রের দু'টো কথা এখনো লজ্জা দিচ্চে, অর্থ ঠাওরাতে পারচি না। লেখাপড়া শিখে, অর্থ বুঝলাম না অথচ হাসলুম, এটা আত্ম-প্রবঞ্চনা করা, আর অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়া হ'ল না কি ? কথা দুটো যখন কাজে লেগেছিল, তখন বাজে হতেই পারে না।”

বলিলাম—“কি এমন কথা হয়েছিল ? কই কিছু ত মনে পড়ে না ভায়া।”

মজুমদার ভায়া বলিল—“সে কি হে ? চাটুয্যে ত তোমাকেই বার বার প্রশ্ন করেছিল—'বাঁড়ুয্যে মশায় 'পিনাং ' কি ?' কই, সে উত্তর পায়নি ত। আবার পঞ্চানন চীনে-ভূতের ভয় থেকে বাঁচবার রক্ষা-কবচ বাতলেছিল—'র‍্যাংচ্যাং' ! সবাই তখন হেসেছিলুম। লোকে অর্থ বোধান্তেই হাসে। আমায় মুখ্খু বল দুখ্খু নেই, আমি কিন্তু না বুঝেই হেসেছিলুম। এখন অর্থটা কেউ দয়া করে বলে দিন্।”

শ্রবণান্তে 'সাধু সাধু' রব পড়িয়া গেল। “বলিলাম—বর্ত্তমানে এরূপ বিনয় বড়ই বিরল! ভায়ার মতলবটা—পুনরায় পিনাং আর র‍্যাংচ্যাং চর্চ্চা!”

অনেক আলোচনা আর আঁচাআঁচির পর—“হল্লী” হটিয়া গেলেন—দত্ত অশক্ত হইলেন। শেষে বলিলেন—rubbish (রাবিস্)।

“পিনাং” ও “র‍্যাংচ্যাং” শব্দগুলি অনুস্বর লইয়া উপস্থিত হইলেও, 'শব্দকল্পদ্রুম' ইহাদের অল্পই সংবাদ রাখেন।

গত রাত্রের শব্দগুলির প্রয়োগকর্ত্তারা উপস্থিত থাকিলেও, নিদ্রান্তে এখন তাঁহারা সে প্রতিভা হারাইয়াছেন। মজুমদার ভায়াও মজলিস্ ভাঙ্গিতে নারাজ,—মহা মুস্কিল!

অবস্থা, সময় ও স্মৃতি এই ত্র্যহস্পর্শ সংঘর্ষে মস্তিষ্ক মথন করিয়া, শেষ রোগীরাই অর্থোদ্ধারে সাহায্য করিলেন।

বুঝিলাম—"পিনাং" শব্দটি ইংরাজি "opinion" শব্দের অপভ্রংশ-রূপে তৎপরিবর্ত্তেই উপস্থিত হইয়াছিল।

আর "র‍্যাংচ্যাং" চীনের-"রামচন্দ্র"-জ্ঞাপক! (অবশ্য,—অনুমানসিদ্ধ)

তখন উচ্চ হাস্যে সভা ভঙ্গ হইল। বলিলাম—"আমাদের ইতিহাসে নবাবী-আমলের আজ এই খতম্। এইবার আহারান্তে—'যে-যার ঘটিবাটি সামলা'!"

—৩৫—

মাধ্যাহ্নিক আহারাদি সমাপনান্তে উপরের ডেকে আসিয়া দেখি,—চতুর্দ্দিকেই একটা ব্যস্ততার হাওয়া বহিয়াছে, নাবিকেরা পাল গুটাইতেছে—মাল সামলাইতেছে; একটা কেমন পরিবর্ত্তনের ভাব! ইউরেসিয়ান সাহেবেরা সশব্দে সিঁড়ি ভাঙ্গিতেছেন;—দেখি বুটে ব্রস্কো লাগাইয়া, কেশ আঁচড়াইয়া বেশ বদলাইয়া আসিলেন। ঘন ঘন কোটের-মুড়ো টানিয়া কোঁচ্ মারিতেছেন, আর পা'গুলো নানা angleএ ফাঁক করিয়া অস্বস্তির টান্‌গুলো শিথিল করিতেছেন।

আমাদের সব কাজই "কাল" বলিয়া কথাটার আশ্রয়ে আরাম লাভ করে। "কাল" আছে তাই "আজ" কাটে। "কালের" দোহাইটাই রেহাই পাবার রাজপথ! সুতরাং বিনা amendment-এই

স্থির হইল—"কাল কাপড় ছাড়া যাবে।" অর্থাৎ কে আর নড়ে-চড়ে।

দেখি ফলোয়ারেরা যে-যার তল্পি-তল্পা বাঁধিয়া প্রস্তুত! সেগুলি শিবলিঙ্গের মত সম্মুখে রাখিয়া, হরদম্ গাঁজা চড়াইতেছে।

যে দিকে চাই—দশমীর দশা, বিজয়ার ভাঙ্গা উৎসব। একটা ঘোলাটে ভাব। আনন্দ অপেক্ষা নিরুৎসাহের মাত্রাই অধিক। মধ্যে মধ্যে পক্ষীর সাক্ষাৎও পাইতেছি। ভূরাজ্য নিশ্চয়ই সন্নিকট।

আমরা সাতটি বাঙ্গালীতে, জাহাজে আজ মাসাবধি কাল ঘরকর্‌না করিতেছিলাম। আজ নড়িতে হইবে, এ আবার কি উৎপাৎ;—এইটাই যেন বোধ হইতেছিল। মানসিক অবস্থাটা এমন দাঁড়াইল, যেন আমাদের জাহাজ হইতে টানিয়া বাহির করিতে হইবে! ডাকিয়া খাওয়ায়,—বাকি সময়টা - বিচরণ, উপবেশন, গল্পগুজব আর শয়নে, ইচ্ছামত কাটে। এর মমতা কাটাইতে একটু ক্ষমতার খরচ হয় বই কি। সংসার, সমাজ, বিষয়-কর্ম্মাদি কিছুই ছিল না; "চাল নাই"—এ কথা কেহ বলে না; মেয়েটার জ্বরও হয় না! একেবারে পরমহংস অবস্থা।

ঘন ঘন বংশীধ্বনির পর, জাহাজের ক্রমে মন্থর গতি আরম্ভ হইল। জেলেরা দূরে-দূরে ডিঙ্গিতে পাল তুলিয়া, জাল ফেলিয়া বেড়াইতেছে। কয়েকখানি আধা-ইস্টিমার, ফ্ল্যাট্, বোট—আমাদের দিকে আসিতেছে দেখিলাম। জাহাজের গতি মন্দ হইয়া জাহাজ থামিল, সেগুলিও আসিয়া পৌঁছিল।

কিনারার চেহারা ত চক্ষে ঠেকিল না, কিন্তু হড়্ হড়্ শব্দে নোঙ্গর নামিয়া পড়িল। আগন্তুক স্টিমার হইতে একটি উচ্চ ইংরাজ কর্ম্মচারী ও একটি কোট-প্যান্টের উপর Cap-ধারী, আমাদের জাহাজের উপর আসিয়া উঠিলেন। শেষেরটিকে বাংলাদেশের বস্তু বলিয়াই বোধ

হইল। চারি চক্ষু এক হইতেই অপাঙ্গে যেন একটু সাদর-আভাস পাইলাম। ভাবটা—"আসুন্, সুখ-দুঃখটা ভাগাভাগি করা যাক্।" আমাদের অনুমান ভুল হয় নাই; পরিচয়ে জানিলাম, ইনি লাহিড়ী মশাই। ওজনে মোনটাক্ হইবেন। এই শরীরে—দাদখানির চাল আর রাজধানীর মাল ছাড়িয়া, কি সাহসে যে চীনে মাল-সামাল করিতে Tally-Clerk হইয়া আসিয়াছেন, বুঝিলাম না। পাকা-চাকরীও নয়, বয়সও কম। পেটের জ্বালায় কালাপানী পার হইয়াছেন কি adventurous spirit-এ (দেশ-বিদেশ মারা রোগে) আসিয়াছেন, জানি না।, যদি শেষেরটি হয় ত আশার কথা এবং "বাঢ়ম্"।"

জাহাজের কাপ্তেন আর চীফ্-সাহেবের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আগন্তুক অফিসারটি একবার উপর-নীচে দ্রুত ঘুরিয়া যাত্রীদের বলিয়া গেলেন—"জাহাজসে জল্‌দি উতর্ পড়ো!"

কোথায় "উতর্ পোড়বো,"—জলে নাকি? জাহাজ ত সমুদ্রে, সীমারও সন্ধান নেই। এই অন্তর্মুখী সময়ে, উৎসাহশূন্য অবস্থায় একটা কথা মনে পড়িল, কিন্তু অনুচ্চারিতই রহিয়া গেল। ফতেপুরে এক ফিরিঙ্গি সাহেব কোন এক আপিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ ছিলেন। মেম সাহেবের সঙ্গে টিফিন্ করিতে রোজ বাংলায় যাইতেন। একদিন একটা জরুরি কাজ পড়ায় ক্লার্ক্ নীলকমল বাবু কাগজপত্র লইয়া টিফিনের সময় বাঙ্গলায় উপস্থিত হন। নীলকমল বাবু সরাসরি দ্বারে উপস্থিত হইতেই সাহেব হাঁকিয়া বলিলেন—"নীলকমল, নীচু যাও।" বাঙ্গলার দরজা রাস্তার সঙ্গে একই level-এ (সমক্ষেত্রে) ছিল;—নীলকমল "নীচু" খুঁজিয়া পায় না; মহা মুস্কিলে পড়িয়া বলিল,—"এর চেয়ে নীচু যে খুঁজে পাচ্ছিনা সার্।" সাহেব আগুন। "হাম দেখাতা হায়" বলিয়া যেই ওঠা, নীলকমল—টেনে ছুট্। এখানে সে সুযোগও নাই।

যাহা হউক, লাহিড়ী মশাই বলিলেন—"ফলোয়ারেরা ফ্ল্যাটে নেবে পড়ুক। তারপর আপনারা junk-এ (চীনে-স্টিমারে) গিয়ে বসুন। আমি আপনাদের মালপত্র নাবিয়ে দিচ্চি।" বলিলাম,—"আমাদের মালই বলুন, আর মালের মালিকই বলুন, ঐ চাটুয্যে মশাইটি; ওঁর ট্রঙ্কটি একটু সাবধানে নাবিয়ে দেবেন, সেটিকে নমস্কারও করতে পারেন, সেটি আমাদের মাতৃ-মন্দির, ওঁটি মাতৃ-ভূমিতে ভরা।" লাহিড়ী মশাই একটু অবাক্ থাকিয়া বলিলেন—"আপনারা ভাববেন না, আমি খুব সাবধানে নাবিয়ে দেব,—কি ঠাকুর বল্লেন্?" বলিলাম "সে ক্রমশঃ শুনবেন্; আগে বলুন ত এখন যেতে হবে কোথায়?" লাহিড়ী মশাই বলিলেন—"আপাততঃ Hsinho-এ (সিন্‌হোয়), সেটা আমাদের out-post (বাইরের আড্ডা), তারপর কাল ট্রেনে Tienstin (টিয়েন্‌সিন্) যাবেন,—সেটাই Head Quarters (মূল আড্ডা)। বলা বাহুল্য, সিন্‌হোও যত বুঝিলাম, টিয়েন্‌সিন্‌ও ততই। তবে এটা বুঝিলাম বটে যে আপাততঃ টিয়েন্‌সিনে আমাদের ড্রপ-সিন্ (যবনিকা) পড়িবে।

দেখি ইতিমধ্যেই সরকারী-কুর্ত্তি পরিয়া, ফুর্ত্তি করিয়া Haver-sack (রসদের ঝুলি) সহ নবশাখ্ নামিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য;—কাহারো হাতে, কাহারো কাঁধে, ঝোলা-ঝুলি, প্যাঁট্‌রা-পুঁটুলি, সারেঙ্গি, বাঁয়া, তবলা, হুড়ুক, মাদল্, গোপীযন্ত্র; আর সকলেরি হাতে হুঁকো-কল্‌কে,—এক একটি কল্কি-অবতার। যেন বক্কেশ্বর পাইনের যাত্রার দল গাওনা বায়না পাইয়া পদ্মা-পারে রওনা হইতেছে। জবর সমর-যাত্রা বটে! এই ভাবে ফলোয়ারেরা গিয়া ফ্ল্যাট ভরাট করিয়া ফেলিল।

এইবার আমাদের পালা। তার বিস্তৃত বর্ণনা অনাবশ্যক। জাহাজের স্টুয়ার্ড বট্‌লার হইতে অপরাপর কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত আপনার

হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এক মাসের ঘরকন্না ও আলাপ-পরিচয়ের পর বিদায় লইতে উভয় পক্ষকেই কষ্ট অনুভব করিতে হইল। ব্যথা-বোধটাই সাধারণ বিদায়ের প্রধান অঙ্গ,—তাহা ক্ষুণ্ণ হইতে পাইল না। "ক্লাইভ"কে সাত সেলামান্তর আমরা জাহাজ ছাড়িয়া একে একে "জঙ্কে" নামিলাম। এত দিনে বত্রিশ সিংহাসন ভাঙ্গিল। কেবল,—খালি একখানা শূন্যগর্ভ লোহার-খোল ভাসিতে লাগিল।

—৩৬—

একমাস বাঁধা-খোরাকে থাকিয়া ও বিক্রমাদিত্যের বৈঠকখানা বজায় রাখিয়া, যখন জঙ্কে ও ফ্ল্যাটে নামিয়া নূতন ব্যবস্থায় যাত্রা করা গেল, তখন গুড়ের নাগরীর অবস্থাই স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তখনো ঘণ্টা খানেক বেলা আছে; কিন্তু কূলের কোন পাত্তা নাই,—তিনি কাছে কি গাছে তাহাও বলা কঠিন। শুনিলাম, এখানে জল অগভীর বলিয়া বড় জাহাজ চলিতে নারাজ বা অচল; তাই সাত মাইল থাকিতেই আমাদের বিদায়ের এই ব্যবস্থা। এই সজল সাত মাইল জলমগ্ন কিনারাটিকে Taku Bar (টাকু বার) বলা হয়। ইনিই এখানে হারবারের (বন্দরের) কারবার করেন;—জাহাজকে অগ্রসর হইতে বাধা দেন বলিয়াই "Bar" উপাধি পাইয়াছেন।

ফ্ল্যাট লইয়া জঙ্ক্ কখন বক্র কখন চক্র গতিতে চলিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা, পরে অন্ধকার,—সঙ্গে সঙ্গেই ফিকে মেঘ আর হাওয়া। এই নূতন যাত্রা একমাসের সুখপুষ্ট শরীরে দুঃখের মাত্রা ক্রমেই বাড়াইতে লাগিল; কখনও উঠা, কখনও বসা, অস্বস্তির একশেষ!

সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনের তেজটাও যেন নিবিয়া গেল।

সকলে অবসন্ন আর মনমরা হইয়া পড়িলাম। টুক্‌রো টুক্‌রো এলো-মেলো চিন্তা, আর দুর্ব্বল দুর্ভাবনাগুলো আসিয়া অবস্থাটাকে অসহনীয় করিয়া তুলিল। সকলেরি মনে হইতে লাগিল—জাহাজে বেশ ছিলাম। অতবড় ভীষণ অতলস্পর্শ জলধির পারে পৌঁছিবার আনন্দ একটুও অনুভব করিতে পারিলাম না। পুরো পাঁচ ঘণ্টা একটানা হাওয়া, একঘেয়ে জল-কল্লোল, আর ঘন-কৃষ্ণ অন্ধকার, যম-পুরীর পথের আভাসই দিতে লাগিল।

এই অবস্থায়—সেই অকূল পারাবার, বিপুল ব্যবধান, 'পার হইয়া সকলেরই চিত্ত এক-একবার ক্ষিপ্তের মত, নিজ নিজ পল্লীভবনে স্ত্রী-পুত্রের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া শান্তি খুঁজিয়াছে; আবার মুহূর্ত্তেই অসহায় মুমূর্ষুর মত হাত পা ছাড়িয়া শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। এইখানেই দিনে আর রাতে তফাৎ। দিনের আলোটা যে মানুষের কত বড় বল, মানুষের মনে সে-যে কতটা শক্তি সঞ্চার করে, সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

কবি সকলের ভাবনাই ভাবেন,—সহৃদয় সত্যেন্দ্রনাথ তাই আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন—

"আশা রেখো মনে, দুর্দ্দিনে কভু
নিরাশ হ'য়োনা ভাই,
কোন দিনে যাহা পোহাবেনা হায়
তেমন রাত্রি নাই।"

কথাটা কাহারো অজানা কথা নয়; কিন্তু কবির নিকট হইতে সেটা দৈববাণীর মত আসিয়া, সহস্র সহস্র হতাশ প্রাণে বীর-বাতাসের মত কাজ করিয়াছে।

ফল কথা—এটা লক্ষ্মীমন্তের স্বইচ্ছায় সখের দেশভ্রমণ ছিল না। সমন্ তামিল করিতে চীনে চলা,—হুকুমের হায়রাণী।

—৩৭—

কখন যে সমুদ্র-সফর শেষ হইয়া গিয়াছে, কখন যে আমরা "পি-হো" (Pi-ho) নদীতে আসিয়া পড়িয়াছি, কেহই তাহা বুঝিতে পারি নাই। কেবল বহুদূরে একটা ক্ষীণ আলো আমাদের যেন আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছে। সেটা ক্রমেই পাছু হাটিয়া চলিল। রাত্রি দশটার পর তাহার সন্নিকট হইলাম। দেখি—দু'ধারে ক্ষেত, অদূরে পাঁচ-সাতখানা বড় বড় আটচালা ধরণের বাড়ী, আর আলোটা জ্বলিতেছে একটা জেটির উপর। জঙ্ক সেইখানে পৌঁছিয়া যাত্রা-শেষের শঙ্খ-ধ্বনি করিল,—কয়েকটা নিশ্বাস ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইল। আমরা "দুর্গা" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম,—কোমরটা যেন "আঃ—" বলিয়া উঠিল।

তল্পি-তল্পা লইয়া, উচ্চকণ্ঠে "জয় কালীমাইকি জয়" বলিয়া, ফলোয়ারেরা সবেগে জেটির উপর উঠিয়া পড়িল। ফ্ল্যাটেও তাদের গান-গল্প-গঞ্জিকা বজায় ছিল, স্ফূর্ত্তি ফিকে মারে নাই,—জিত তাহাদেরি।

আমরা যেন আধমরা-অবস্থায় উঠিলাম; সম্পূর্ণ উদ্যম-উৎসাহ-শূন্য! ক্ষুধা-তৃষ্ণা-অবসন্নতা মিশ্রিত একটা অবসাদ আমাদের এমনই করিয়া ফেলিয়াছিল। মনে হইল,—এতদিন পরে আমরা সর্ব্বপ্রকারেই যেন "তীরস্থ" হইলাম!

সহসা একটা দমকা হাওয়ায় জেটির আলোটাও নিবিয়া গেল। সকলে যেন একখানা বৃহৎ কাল কম্বল চাপা পড়িলাম! গুঁড়ুনি বৃষ্টিও গায়ে পড়িল। সবাই নিঃশব্দ—কেবল মজুমদার ভায়া Corunna-র সেই করুণ কথাগুলি ধীরে ধীরে আবৃত্তি করিলেন:—

"Not a drum was heard, not a funeral note,
Not a soldier discharged his farewell shot"—

কথাগুলি সে-সময়ে বে-সুরো লাগে নাই। আমরাও, অভিযানের আসামী এবং শত্রুপুরীর সীমানার মধ্যেও উপস্থিত। বোসজা বলিয়া উঠিলেন,—"appropriate (উপযোগী) বটে,- বৃষ্টিও এসে গেছে। তবে এটাকে আমাদের চীনে পদার্পণে পুষ্প-বৃষ্টি বলেও নেওয়া চলে।" বলিলাম—"এখন আমাদের ইন্দুমতীর শরীর দাঁড়িয়েছে, এ পুষ্পের আঘাত সইলে বাঁচি!"

হঠাৎ কান্নার সুর কানে এলো, দেখি চাটুয্যে কাঁদিতেছে,—(এতক্ষণ বোধ হয় ভাঁজিতেছিল)—"অনু-মা আর তোকে দেখতে পাব না,—তুই জেনেছিলি বলেই অত কেঁদেছিলি।" চাটুয্যের ছোট মেয়েটির নাম অন্নপূর্ণা, তার জন্মদিনে চাটুয্যের দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হয়েছিল। মুখে বলিলাম—"ওকি চাটুয্যে, ভগবান কৃপা করে এই অকুল সমুদ্র উত্তীর্ণ করে কূল দিলেন, এখন আবার ওকি?" চাটুয্যে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল —"আমি যে কেবলি তার সেই কান্না শুনতে পাচ্ছি। এ সুমুদ্দর কি কেউ দু'বার পার হতে পারে!" তার কথাটা আব ব্যথাটা দুই-ই সত্য।

কবিরা সর্ব্বজ্ঞ ও দূরদর্শী। তাঁরা দুনিয়ার ভাবনা বেদনা পূর্ব্বাহ্নেই ভাষায় বুনিয়া রাখিয়াছেন। মনে পড়িল—

"—চারিদিক হতে আজি
অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি'
সেই বিশ্ব-মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন
মোর কন্যা-কণ্ঠস্বরে।"

চাটুয্যের মুখে ইহারই প্রতিধ্বনি পাইলাম। তাহাকে সামলানো বরাবরই আমার একটা বড় কাজ ছিল;—বলিলাম—"তুমি কি কোন খবরই রাখনা,—আবার সমুদ্র পার হতে হবে কেন? তা হলে এ শর্ম্মাও আসতেন না। তিন মাসের মধ্যে 'হোয়াংহো বর্ম্মা রেলওয়ে' খুলে

যাবে, তখন রেঙ্গুন পৌঁছিতে বড় জোর চারদিন নেবে। যখন [illegible] পড়া গেছে, মাস ছয়েক দেখে শুনে নেওয়া যাক্ না। তারপর অন্নপূর্ণার তবে যত ইচ্ছে চীনের পুতুল, চীনে-পটকা নিয়ে ফিরো।" চাটুয্যের অনেকগুলি আগ্রহপূর্ণ প্রশ্নোত্তরের পর, এ তাল সামলানো গেল; Ignorance is bliss, আর—অন্ধকারে কেহ কাহারো মুখের ভাব লক্ষ্য করিতেছিল না,—তাই রক্ষা।

ফল কথা, জেটিতে উঠিবার পর-মুহূর্ত্তেই involuntary shock-এর মত অনেকেরি প্রাণটা অনুভব করিয়াছিল—"এতদিনে সত্যই স্বদেশ হইতে বিচ্যুত হইলাম, স্বদেশ এখন স্বপ্ন-কথা।" সঙ্গে সঙ্গে বুকটাও কেমন করিয়া উঠিয়াছিল। যতক্ষণ সমুদ্রের উপর ছিলাম,—একটা যেন যোগ-সূত্র ছিল;—ডাঙ্গায় পা দিতেই সেটা ছিন্ন হইয়া গেল। এই নাড়ী-ছেঁড়া আঘাতটা চাটুয্যে চাপিতে পারে নাই।

মৃত্যুর পূর্ব্বে নাকি কাহারো কাহারো অস্বাভাবিক লক্ষণ সকল দেখা দেয়। স্মরণ-শক্তির সহিত কস্মিন্‌কালেই আমার সদ্ভাব ছিল না, দেখি হঠাৎ আজ সে হাজির। রবিবাবুর লেখা, আর বহুদিন দেখা—

"একদা নামিবে সন্ধ্যা, বাজিবে আরতি-শঙ্খ
অদূর মন্দিরে,
বিহঙ্গ নীরব হবে, উঠিবে ঝিল্লির রব
অরণ্য গভীরে,
দিনান্তের শেষ আলো, দিগন্তে মিশায়ে যাবে,
ধরণী আঁধার,
অনন্তের যাত্রা পথে, সুদূরে জ্বলিবে শুধু
প্রদীপ তারার।"—ইত্যাদি

STATE CENTRAL LIBRARY